শ্রীগোপাল বসু মল্লিক-

ফেলোশিপ-প্রবন্ধ।

তৃতীয় খণ্ড

(হিন্দুদর্শন)

দ্বিতীয়াংশ।

মহামহোপাধ্যায়—

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-

বেদান্তবারিধি-

প্রণীত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

৭।১, পদ্মপুকুর রোড্, ভবানীপুর,

কলিকাতা।

সন ১৩৩২—অগ্রহায়ণ।

মূল্য—১৷০ আনা মাত্র।

প্রস্তাবনা।

ভগবৎ কৃপায় আজ শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোশিপ্ প্রবন্ধের তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত [illegible]য়াছিল, তাহার মধ্যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ দ্বিতীয় [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, অবশিষ্ট প্রবন্ধসমূহের মধ্যে কেবল সাংখ্য, পাতঞ্জল ও মীমাংসাদর্শন-সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হইল, আর বেদান্তবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ পরবর্ত্তী চতুর্থখণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

উপরি উক্ত দর্শনত্রয়ের মধ্যে সাংখ্যদর্শন অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক দর্শন। সমস্ত পুরাণশাস্ত্রে ও মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্তের প্রভূত পরিমাণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, পুরাকালে এদেশে সাংখ্যশাস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে সেই বিশাল সাংখ্যশাস্ত্র শাখা-পল্লবাদিহীন কাণ্ডমাত্রসার বৃক্ষের ন্যায় অতি ক্ষীণ দশায় উপনীত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য দুইখানি মাত্র গ্রন্থ এখনও সাংখ্যশাস্ত্রের স্মৃতিরেখা জাগরিত রাখিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি আচার্য্য ঈশ্বর-কৃষ্ণের কারিকা বা সাংখ্যসপ্ততি, যাহার উপর আচার্য্য গৌড়পাদের ভাষ্য ও মহামতি বাচস্পতিমিশ্রের 'তত্ত্বকৌমুদী' টীকা এখনও বিদ্বৎ-সমাজে সাংখ্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অপর গ্রন্থখানি মহর্ষি কপিলের সূত্ররূপে পরিচিত প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শন, যাহার উপর বিজ্ঞানাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত অতি উপাদেয় ভাষ্যব্যাখ্যা এখনও বিদ্বৎসমাজে অধীত ও অধ্যাপিত হইতেছে।

সাংখ্যসিদ্ধান্ত জানিবার পক্ষে এখন উক্ত গ্রন্থদ্বয়ই প্রধান অবলম্বন। উভয় গ্রন্থেই সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্তনিচয় অতি উত্তমরূপে বিবৃত ও বিন্যস্ত আছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, উক্ত সাংখ্যদর্শনে পর-পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ প্রচুর পরিমাণে বিন্যস্ত আছে, এবং বিবেকজ্ঞানের সহায়করূপে কতকগুলি উপাখ্যানও (গল্পও) স্থান পাইয়াছে, কিন্তু সাংখ্যসপ্ততিতে সে সকল বিষয়ের আদৌ উল্লেখ নাই, কেবল সাংখ্য-সম্মত সিদ্ধান্তসমূহ মাত্রের যথাযথভাবে সন্নিবেশ আছে

আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ উক্ত সাংখ্যদর্শন হইতেই আবশ্যক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, এবং প্রমাণরূপে মূলের সূত্রসকলও উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং আবশ্যক মতে সাংখ্যসপ্ততি প্রভৃতির কথা ও সম্মতি গ্রহণ করিয়াছি।

সাংখ্যদর্শনের বিষয়গুলি বড়ই উপাদেয়, এবং সরস ও চিত্তাকর্ষক। এই জন্য যতদূর সম্ভব, উহার বিষয়সমূহ সংকলন করিতে যত্ন করা হইয়াছে। সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, বন্ধ, মোক্ষ, বিবেক, অবিবেক ও তাহার নিদান এবং আরও যে সমস্ত বিষয় অবশ্য-জ্ঞাতব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সে সমস্ত বিষয়ও প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেবল জটিল বিচারাংশ ও নীরস উপাখ্যানাংশ মাত্র অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সাংখ্যের পরেই পাতঞ্জল দর্শনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সাংখ্যের সঙ্গে পাতঞ্জল যোগদর্শনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসমূহই অপরিবর্ত্তিতভাবে পাতঞ্জলে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে; এই জন্য পাতঞ্জল দর্শন সাধারণতঃ সেশ্বর সাংখ্যদর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; সুতরাং সাংখ্যের পর পাতঞ্জলের বিষয়-সন্নিবেশ করা অশোভন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

সাংখ্যের ন্যায় পাতঞ্জল দর্শনেরও প্রধান-প্রতিপাদ্য প্রায় সমস্ত বিষয়ই প্রবন্ধমধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। যোগ, যোগবিভাগ, যোগ-সাধন, যোগাঙ্গ, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বর ও যোগফল—কৈবল্য প্রভৃতি বিষয় সমূহ প্রবন্ধের উপাদানরূপে সংকলিত হইয়াছে, কেবল সুবিস্তৃত যোগ-বিভূতির কথা অতি সংক্ষেপে সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। সংগৃহীত বিষয় গুলির প্রামাণ্য প্রকাশনার্থ মূলগ্রন্থ হইতে সূত্রসমূহ উদ্ধৃত করিয়া, সে সমস্তের মর্ম্মার্থও বিবৃত করা হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, পাতঞ্জল-সম্পর্কিত আলোচনায় প্রধানতঃ ব্যাসভাষ্য ও বাচস্পতিমিশ্রের সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি পরিগৃহীতই হইয়াছে।

পাতঞ্জলের পরেই মীমাংসা দর্শনের বিষয় প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যদিও আপাতজ্ঞানে পাতঞ্জলের সহিত মীমাংসা দর্শনের কোন প্রকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না, সত্য তথাপি উভয়কে একবারে সম্বন্ধশূন্য বলিতে পারা যায় না। পাতঞ্জলোক্ত ক্রিয়াযোগের সহিত মীমাংসা দর্শনের ঘনিষ্টতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মরাশিই যদি নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই সমুদয় কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনপূর্ব্বক বিবেক-জ্ঞানোপজননে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। এই সকল কারণে পাতঞ্জলের পর মীমাংসা দর্শনের বিষয়-সন্নিবেশ করা নিতান্ত অসম্বদ্ধ বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

আলোচ্য মীমাংসাদর্শনের প্রধান উপজীব্য হইতেছে—ধর্ম্মকর্ম্ম। কর্ম্মোপজীবী বলিয়াই মীমাংসাদর্শন কর্ম্মমীমাংসা নামে পরিচিত হইয়াছে। কর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইলেও, যে সমুদয় বিষয় বিজ্ঞাত না থাকিলে, অথবা যে সকল নিয়ম-পদ্ধতি পরিকল্পিত না হইলে কর্ম্ম সম্বন্ধে বিচারই চলিতে পারে না, সে সকল বিষয়ও উহার আলোচনার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেই কারণেই কর্ম্মমীমাংসায়

অঙ্গরূপে বহুবিধ নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। সেই সকল নিয়ম-পদ্ধতি 'ন্যায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রায় সকল আচার্য্যই আবশ্যক মতে তৎপ্রবর্ত্তিত ন্যায়গুলির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মবিচারের সহিত ঐ সমুদয় নিয়ম-পদ্ধতি সংযোজিত হওয়ায় কেবল যে, গ্রন্থের কলেবরই বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু জটিলতার মাত্রাও সমধিক বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। বেদবিদ্যা-বিশারদ মহামতি শবরস্বামী ও কুমারিল ভট্ট অতি উৎকৃষ্ট 'ভাষ্য'ও 'বার্ত্তিক' ব্যাখ্যা দ্বারা উহার জটিলতা কিয়ৎপরিমাণে লঘু করিয়াছেন, এবং কর্ম্মমীমাংসার মর্ম্ম গ্রহণের পথও অনেকটা নিষ্কণ্টক করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, বিশাল মীমাংসা দর্শনের জটিল বিষয়রাশি সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিবার উপযুক্ত স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই; অধিকন্তু, কর্ম্মবিচার অত্যন্ত নীরস ও জটিল, সহজেই পাঠকবর্গের অরুচিকর হইতে পারে; এইজন্য কর্ম্মবিচারের স্থূল অংশ পরিত্যাগ দার্শনিক করিয়া প্রধানতঃ ভাগ মাত্র সংকলিত ও আলোচিত হইয়াছে, এবং সেই সকল বিষয়ের সমর্থনকল্পে যুক্তির সঙ্গেসঙ্গে মীমাংসাদর্শনের মূল সূত্রসমূহও উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বিধিবিচার, তাহার বিভাগ ও তদনুকূল উদাহরণ যথাসম্ভব সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা সহৃদয় পাঠকবর্গ অল্পমাত্রও তৃপ্তিলাভ করিলে আমাদের পরিশ্রম সফল হইবে।

ভবানীপুর,
ভাগবত চতুষ্পাঠী,
কলিকাতা।
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

বিষয়-সূচী।

(সাংখ্যদর্শন)

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

(পাতঞ্জল দর্শন।)

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

(মীমাংসা দর্শন)

বিষয়		পৃষ্ঠা

সূচী সমাপ্ত।

ফেলোশিপ প্রবন্ধ।

অবতরণিকা।

(হিন্দুদর্শন)

ফেলোশিপ প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের বিষয় সংকলিত ও আলোচিত হইয়াছে ; এখন তৃতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে আলোচনার অবসর উপস্থিত হইয়াছে ; কারণ, আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, দর্শনপর্য্যায়ে সাংখ্যদর্শন তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। দর্শনসমূহের বিষয়-সঙ্কলনের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এবং দর্শনশাস্ত্রগুলির সম্ভাবিত বিরোধ-পরিহার ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলেও ঐরূপ পরিকল্পনাই সমিচীন বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ ন্যায় ও বৈশেষিকের ন্যায় সাংখ্যও জড় জগতের সত্যতা ও পুরুষের বহুত্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়েই প্রায় একমতাবলম্বী। ন্যায় ও বৈশেষিক পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করেন, এবং পুরুষের (আত্মার) তাত্ত্বিক ভোগ সমর্থন করেন ; সাংখ্য সেস্থলে ত্রিগুণা প্রকৃতির আসন স্থাপন করিয়াছেন, এবং বুদ্ধিকে তাত্ত্বিক ভোগের অধিকার দিয়া পুরুষের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন। এই জাতীয় বহুবিষয়ে সৌসাদৃশ্য থাকায় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আলোচনার পরে সাংখ্যদর্শনের আলোচনাই সঙ্গত ও শোভন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই কারণে, এখন অগ্রে আমরা সাংখ্যদর্শনের কথা বলিব, পরে পাতঞ্জলদর্শনের কথা শেষ করিয়া অপরাপর দর্শনের বিষয় যথাক্রমে আলোচনা করিব।

[সাংখ্যদর্শন ও তাহার বিভাগ।]

আলোচ্য সাংখ্যদর্শন দুইভাগে বিভক্ত—সেশ্বর সাংখ্য ও নিরীশ্বর সাংখ্য। মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর সাংখ্য নামে, আর মহামুনি কপিলকৃত সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর সাংখ্য নামে পরিচিত; কারণ, কপিলদেব স্বকৃত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন নাই; বরং সাগ্রহে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; এবং আপনার সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন (*) ; আর মহর্ষি পতঞ্জলি সেই স্থলেই ঈশ্বরের

---

* সূত্রকার প্রথম অধ্যায়ের "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ৯২ সূত্রে স্পষ্টাক্ষরে ঈশ্বর প্রতিষেধ করিলেও, ব্যাখ্যাতৃগণ ইহার উপর অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে বিরত হন নাই। কেহ বলিয়াছেন—কপিল যে, 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' বলিয়াছেন, এটা প্রৌঢ়িবাদমাত্র; অর্থাৎ পরপক্ষের সহিত তর্কপ্রসঙ্গে আপনার তর্কনৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য ঐরূপ বলিয়াছেন মাত্র, কিন্তু উহা তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত নহে। অপর পক্ষ বলেন—ঈশ্বর কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে,—অনুভবগম্য; এই জন্যই কপিল 'ঈশ্বরাভাবাৎ' না বলিয়া 'অসিদ্ধেঃ' বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরের নিত্য ঐশ্বর্য্য আছে—জানিতে পারিলে, সংসারী লোক জাগতিক ঐশ্বর্য্যেও নিত্যতা ভ্রমে অধিকতর আসক্ত হইতে পারে; তাহার ফলে, ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা জ্ঞানে যে, বৈরাগ্যলাভ, তাহা ব্যাহত হইতে পারে; এই ভয়ে সূত্রকার নিত্যেশ্বরের নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বরপ্রতিষেধ তাঁহার অভিপ্রেত নহে; ইত্যাদি বহু রকম তাৎপর্য্য কল্পনা দ্বারা অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন! কিন্তু সূত্রকার কপিলের যে, মনোগত ভাব কি প্রকার, তাহা তিনি না বলিয়া দিলে এবিষয়ে সংশয়শূন্য হওয়া বড়ই কঠিন মনে হয়।

আসন প্রদান করিয়া যোগমহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কপিলকৃত ন্যূনতার পরিহারপূর্ব্বক সাংখ্যশাস্ত্রের সমধিক গৌরবও বর্দ্ধিত করিয়াছেন (*)।

আস্তিক দর্শনের মধ্যে সাংখ্যদর্শনই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে। যে সাংখ্যশাস্ত্র এককালে শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরাক্রমে বহু বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, এবং যাহার যুক্তিযুক্ত বচনপরম্পরায় বিমুগ্ধ বিশ্বমানবগণ শতমুখে গৌরব কীর্ত্তন করিত; সেই সাংখ্যশাস্ত্রই আজ দুর্নিবার কালচক্রের অমোঘ নিস্পেষণে ছিন্নভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া অতি দীনভাবে, যেন শুভ সময়ের প্রতীক্ষায় কোনমতে আত্মরক্ষা করিতেছে মাত্র।

শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ও লোকপ্রসিদ্ধি হইতে জানা যায় যে, কপিলদেবই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রণেতা ও আদি প্রতিষ্ঠাতা। পুরাণ শাস্ত্রে ও ইতিহাসাদি গ্রন্থে কপিলের উজ্জ্বল জ্ঞানমহিমা কীর্ত্তিত আছে; বেদেও কপিলের অসীম জ্ঞানগৌরব উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

* এখানে বলা আবশ্যক যে, যে কারণেই হউক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও কপিলকে 'নাস্তিক' মনে করা সঙ্গত নহে; কারণ, তিনি জন্মান্তরবাদী, পরলোকেও আত্মার অস্তিত্ব ও সুখদুঃখভোগ স্বীকার করিয়াছেন। যাহারা জন্মান্তর বা পরলোক-সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাহারাই 'আস্তিক', আর যাহারা তাহা স্বীকার করেন না,—এখানেই দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফুরাইয়া যায় বলেন, তাহারাই 'নাস্তিক' পদবাচ্য, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাস্তিত্বের সঙ্গে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' কথার কোন সম্পর্কই নাই।

কিন্তু সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা কপিল যে, কে, সে সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই অনেকে অনেক রকম সংশয় পোষণ করিয়া আসিতেছেন; আচার্য্য শঙ্করস্বামী সেই সংশয়কে আরও উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন (১)।

তাঁহার মতে সাংখ্যদর্শন মূলতঃ নারায়ণাবতার কপিলদেবের প্রণীতই নহে। উহা কপিলনামক অপর কোনও লোকদ্বারা প্রণীত হইয়াছে। কেহ কেহ আবার এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া কল্পনা করেন যে, 'তত্ত্বসমাস' নামে যে, দ্বাবিংশতি-সূত্রাত্মক ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে; তাহাই নারায়ণাবতার কপিলের প্রণীত, আর

---

(১) শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা, ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যম্। 'কপিলম্' ইতি—শব্দ-সামান্যমাত্রত্বাৎ। অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুঃ বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১ শাঙ্করভাষ্য)।

অভিপ্রায় এই যে, তোমরা কেবল কপিলের জ্ঞানাতিশয্য প্রতিপাদক শ্রুতি দেখিয়াছ মাত্র, কিন্তু তাহাতেই কাপিল মতের উপর শ্রদ্ধা করা উচিত হয় না; কারণ, উহা বেদবিরুদ্ধ; বিশেষতঃ শ্রুতিতে কেবল 'কপিল' নামের মাত্র উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই কপিলই যে, সাংখ্য-প্রণেতা, তাহা ত নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না; কেন না, আরও একজন কপিলের নাম শোনা যায়, যাঁহার অপর নাম বাসুদেব। তিনি সগর-রাজের পুত্রগণকে ভস্ম করিয়াছিলেন। এই উভয় কপিলই যে, এক, তাহাও বলিবার উপায় নাই; অতএব কপিলের নাম দেখিয়াই সাংখ্য-দর্শনের উপর শ্রদ্ধা করা সঙ্গত হয় না।

বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যসমন্বিত যে সাংখ্যদর্শন এখন প্রচলিত আছে, তাহা অগ্নি-অবতার কপিলের কৃত, এবং ইহা সেই সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব-সমাসেরই ছায়াবলম্বনে রচিত ও তাহারই বিস্তৃতি মাত্র; এই কারণেই পাতঞ্জল দর্শনের ন্যায় ইহাও 'সাংখ্যপ্রবচন' নামে পরিচিত হইয়াছে। "অগ্নিঃ স কপিলো ভূত্বা সাংখ্যশাস্ত্রং বিনির্ম্মমে" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ স্মৃতিবচনও ঐকথারই অনুমোদন করিতেছে। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ একথায়ও পরিতুষ্ট না হইয়া কল্পনা করেন যে, 'তত্ত্বসমাস'ই কপিলকৃত সাংখ্যদর্শন; আর প্রচলিত সাংখ্যদর্শনখানা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানভিক্ষুরই কৃতিত্বের ফল। বিজ্ঞানভিক্ষুই স্বকৃত ভাষ্যের গৌরববর্দ্ধনের জন্য স্বকীয় সূত্রগুলিকে কপিলকৃত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; বস্তুতঃ ঐ সমুদয় সূত্র কপিলকৃত নহে। এ কথার অনুকূলে তাহারা তিনটী কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন—

১। ষড়্দর্শনের টীকাকার মহামতি বাচস্পতিমিশ্র উহার টীকা করেন নাই। তাঁহার সময়ে যদি প্রচলৎ সাংখ্যদর্শন বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই মূল সাংখ্যদর্শন পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকার ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিতেন না। ২। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে সাংখ্যমতের সমালোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা উদ্ধৃত করিয়াই বিরত হইয়াছেন, কিন্তু এসকল সূত্রের নাম পর্য্যন্তও করেন নাই। তাঁহার সময়ে ইহার অস্তিত্ব থাকিলে, কারিকামাত্র উদ্ধার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকা কখনই তাঁহার পক্ষে শোভন হইত না।

তৃতীয় কারণ—অন্যান্য আর্ষ সূত্রের সহিত এ সকল সূত্রের সাদৃশ্যের অত্যন্তাভাব। ঋষিপ্রণীত অন্যান্য দর্শনের সূত্রসকল যেরূপ স্বল্পাক্ষর ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক, আলোচ্য সাংখ্যদর্শনের সূত্রসমূহ ঠিক তদনুরূপ নহে; ইহার সূত্রগুলি এতই সরল ও স্পষ্টার্থক যে, অনেকস্থলে ব্যাখ্যারই আবশ্যক হয় না। ইহা নিশ্চয়ই আর্ষ-সূত্র-রচনার রীতিবিরুদ্ধ। ইহার পর আরও একটী কারণ আছে, তাহা বিজ্ঞানভিক্ষুর নিজের উক্তি। তিনি ভাষ্যপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন—'সাংখ্যশাস্ত্ররূপ জ্ঞান-সুধাকর কালার্কদ্বারাভক্ষিত হইয়া কলামাত্র অবশিষ্ট আছে; আমি স্বীয় বচনামৃত দ্বারা পুনরায় তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিব' (১)।

তাঁহার এ কথা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞানভিক্ষু যেন সাংখ্যদর্শনের সমস্ত অংশ বা সমস্ত সূত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; নিজে বাক্য যোজনা করিয়া সেই সমুদয় অসম্পূর্ণ অংশের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে, আলোচ্য সাংখ্যদর্শনের রচনা সম্বন্ধে উক্ত প্রকার কল্পনা অযৌক্তিক বা অসঙ্গত হইতে পারে না।

সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কিন্তু উচ্চকণ্ঠে এসকল কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—দেবহূতির গর্ভজাত নারায়ণাবতার কপিলদেবই এই উভয় গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি প্রথমতঃ 'তত্ত্বসমাসে' যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, পরে

(১) "কালার্ক-ভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞান-সুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ।" (ভাষ্য-ভূমিকা)

লোকহিতার্থে তাহাই আবার বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে যাইয়া ষড়ধ্যায়ী বিপুল সাংখ্যদর্শন রচনা করিয়াছেন। এরূপভাবে সংক্ষিপ্তার্থের বিস্তৃতি বিধান সুধীসমাজে সমাদৃত ও সমীচীন বলিয়া পরিগৃহীতও হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বিষ্ণুর অবতার কপিলই যে, সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা কপিল, তাহাও কপিলের উক্তি হইতেই বুঝা যায়—

"এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ।
প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্ম-দর্শিনাম্" (ভাগ্য ৩।১০)

অর্থাৎ আত্মদর্শী পণ্ডিতগণের অভিমত তত্ত্বসমূহ পরিগণনা করিবার উদ্দেশ্যে এবং মুমুক্ষুগণের আগ্রহাতিশয়ের ফলে জগতে আমার এই জন্ম। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, জগতে মুমুক্ষুগণের কল্যাণার্থ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বপ্রচারের উদ্দেশ্যেই দেবহূতির গর্ভে ভগবান্ নারায়ণের কপিলরূপে আবির্ভাব হইয়াছিল। অতএব বিষ্ণুর অবতার কপিলদেবের উপরেই সাংখ্যদর্শন প্রণয়ণের সমস্ত দায়িত্ব সমর্পণকরা সঙ্গততর মনে হয়।

তাহার পর, 'অগ্নিঃ স কপিলো নাম' বাক্যেতে, কপিলরূপী অগ্নিকেই যে, সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা বলা হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু যে ভগবান্ মহাকাল বিশ্বরূপে বিরাজমান, অগ্নি তাঁহারই শক্তিবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভগবান্ নারায়ণ সেই অগ্নি-শক্তিরূপে কপিল নামে প্রাদুর্ভূত হইয়া সাংখ্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন; ইহাই ঐ বাক্যের প্রকৃত ও সুসঙ্গত অর্থ, অন্যরূপ অর্থ সঙ্গতই নহে। অতএব বলিতে হইবে যে, দেবহূতির গর্ভজাত

নারায়ণাবতার, যে কপিল 'তত্ত্বসমাস' রচনা করিয়াছিলেন, তিনিই লোকহিতার্থে পুনরায় বিস্তীর্ণ ষড়ধ্যায়পূর্ণ সাংখ্যদর্শন রচনা করিয়াছেন—ইত্যাদি।

সাংখ্যদর্শনের রচনা ও রচয়িতার সম্বন্ধে যে সমুদয় সংশয় ও সমাধানপ্রণালী প্রচলিত আছে, আমরা সংক্ষেপে সে সমুদয় একস্থানে সন্নিবদ্ধ করিয়া দিলাম। সুধী পাঠকবর্গই এ সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত মন্তব্য নির্ণয় করিয়া লইবেন।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, আলোচ্য সাংখ্যশাস্ত্র এক সময় যেমনই উন্নতি ও বিস্তৃতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল, এখন আবার তেমনই অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সেই বিশাল সাংখ্যশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত গ্রন্থই অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, কেবল দুই একখানি গ্রন্থমাত্র এখন পর্য্যন্ত কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়া অবশিষ্ট গ্রন্থরাশির অতীত স্মৃতি জাগরুক করিয়া রাখিয়াছে। সেই সমস্ত বিলুপ্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার আর হইবে কি না, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মহামুনি কপিল সাংখ্যমত প্রচার করেন, এবং সর্ব্বাদৌ প্রিয় শিষ্য আসুরি মুনিকে তাহা প্রদান করেন। আসুরি মুনি আবার গুরুলব্ধ সেই বিদ্যা স্বশিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্যকে সম্প্রদান করেন। পঞ্চশিখাচার্য্যই সুচিন্তিত বহু গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া সাংখ্যশাস্ত্রের সমধিক বিস্তৃতি বিধান করিয়াছিলেন (১)।

---

(১) ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বকৃত সাংখ্যকারিকার পরিশেষে লিখিয়াছেন—
"এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥" ৭০॥

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না, এবং ভবিষ্যতে পাইবার আশাও অতি অল্প। ব্যাসভাষ্য প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণিক ব্যাখ্যাগ্রন্থাদিতে পঞ্চশিখের অনেক সূত্র উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সকল সূত্র-বাক্যের আকর (মূল গ্রন্থ) নির্ণয় করিবার বা বুঝিবার কোনই উপায় নাই।

পঞ্চশিখের শিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ। তিনি ছন্দোবদ্ধ সত্তরটীমাত্র শ্লোকে সমস্ত সাংখ্যশাস্ত্রের (সাংখ্যদর্শনের) প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অতি নিপুণতার সহিত সংকলিত করিয়াছেন, এবং নিজেই বলিয়াছেন যে, এই সপ্ততিতে (সত্তরটী শ্লোকে) যে সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইল; বুঝিতে হইবে, ইহাই সমস্ত সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। সাংখ্যশাস্ত্রে তদতিরিক্ত কোন বিষয় প্রতিপাদিত হয় নাই। পার্থক্য এই যে, মূল সাংখ্যদর্শনে কতকগুলি আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট আছে, ইহাতে সেই আখ্যায়িকাগুলি নাই, এবং পরপক্ষ-খণ্ডনোপযোগী বিচার বিতর্কও স্থান পায় নাই; ইহাই সাখ্যদর্শন হইতে সাংখ্য-সপ্ততির বৈশিষ্ট্য (১)। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত এই সপ্ততি বা সাংখ্যকারিকা গ্রন্থ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গৌরবে অতি মহান্। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যসিদ্ধান্ত খণ্ডনকালে ইহার বাক্য ধরিয়াই বিচার করিয়াছেন, এবং মহামতি বাচস্পতি মিশ্রও ইহার উপরেই অতি উপাদেয় 'তত্ত্বকৌমুদী' নামক টীকা রচনা করিয়াছেন।

---

(১) "সপ্তত্যাঃ কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টী-তন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চ॥" ৭২॥

প্রচলিত সাংখ্যদর্শন ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং চারিশত ছাপ্পান্নটী (৪৫৬) সূত্রে সমাপ্ত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে প্রধানতঃ চারিটী বিষয় আলোচিত ও নির্ণীত হইয়াছে;—হেয় ও হেয়-হেতু, এবং হান ও হানোপায় (১)। তন্মধ্যে, হেয় অর্থ—ত্রিবিধ দুঃখ। হেয়হেতু অর্থ—প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক বা আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য-প্রতীতির অভাব। হান অর্থ—উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। হানোপায়—বিবেক জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে আত্মার (পুরুষের) পার্থক্যবোধ। এই চারিটী বিষয় লইয়াই প্রথম অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তাহার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন—প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম কার্য্যপ্রপঞ্চ বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে, যথাক্রমে প্রাকৃতিক স্থূল কার্য্য ও সূক্ষ্ম শরীর নিরূপিত হইয়াছে এবং স্থূল শরীর নিরূপণের পর, পর ও অপর বৈরাগ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্রোপদিষ্ট কয়েকটী উত্তম

(১) ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু চিকিৎসাশাস্ত্রের ন্যায় সাংখ্যশাস্ত্রের বিষয়গুলিকেও চারিটী স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে যেরূপ রোগ, রোগের নিদান, আরোগ্য ও তাহার উপায় বর্ণিত আছে, সাংখ্য-শাস্ত্রেও তদ্রূপ হেয়—দুঃখ, তন্নিদান—অবিবেক; হান—দুঃখের ক্ষয়, ও তদুপায়—বিবেকজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। চিকিৎসার ফল যেমন আরোগ্য, ঠিক সেইরূপ বিবেকজ্ঞানেরও ফল দুঃখহানিরূপ মুক্তি। প্রথমাধ্যায়ের ভাষ্যশেষে বিজ্ঞানভিক্ষু এই কথাই একটী শ্লোকে গ্রথিত করিয়াছেন—

"হেয়-হানে তয়োর্হেতূ ইতি ব্যূহা যথাক্রমম্।
চত্বারঃ শাস্ত্রমুখ্যার্থা অধ্যায়েঽস্মিন্ প্রপঞ্চিতাঃ ॥"

আখ্যায়িকা এবং তদনুসারে বিবেকজ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায় কথিত হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষ খণ্ডন, অর্থাৎ অপরাপর দার্শনিক কর্ত্তৃক সাংখ্যসিদ্ধান্তের উপর উপস্থাপিত আপত্তির সমাধান, এবং তাহাদের সিদ্ধান্তের উপর দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শাস্ত্রপ্রতিপাদিত প্রধান প্রধান বিষয়সমূহের উপসংহারচ্ছলে বিশদ ব্যাখ্যাপ্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ লইয়া সমগ্র ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যদর্শন সমাপ্ত হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আর যাহা কিছু আছে, তাহাও এসমস্ত বিষয়েরই আনুষঙ্গিক—প্রসঙ্গাগতমাত্র।

মহামতি বিজ্ঞানভিক্ষু উক্ত ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যদর্শনের উপর একটী ভাষ্যব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যমধ্যে অনেক নূতন তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মমীমাংসার সঙ্গে সাংখ্যশাস্ত্রের একটা আপোষ-মীমাংসা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন।

অধিকন্তু, ভাষ্যভূমিকায় তিনি যে, আস্তিক ষড়্দর্শনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সংস্থাপনের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছে। তাহার সিদ্ধান্তানুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক দর্শনই এক একটী স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য লইয়া বিরচিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক দর্শনই সেই উদ্দেশ্য বিষয়ে তৎপর থাকিয়া নিজেদের প্রামাণ্য রক্ষা করিয়াছে। পরমত খণ্ডন বা বিষয়ান্তর বর্ণন, উহাদের প্রকৃত লক্ষ্যের বহির্ভূত—প্রাসঙ্গিকমাত্র। দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র

বিজ্ঞানভিক্ষু ভিন্ন আর কেহই এরূপ উদার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসার নামে গদ্য-পদ্য-ময় আর একখানা ক্ষুদ্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি আপনার অভিমত সাংখ্যসিদ্ধান্তসমূহ সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সাংখ্যসারের প্রারম্ভে তিনি 'সাংখ্যকারিকা' রচনা করিয়াছেন, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সে গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে (১)। কাপিলসূত্র বলিয়া পরিচিত তত্ত্বসমাসনামক গ্রন্থের উপর বিজ্ঞানভিক্ষুর কোন ব্যাখ্যা নাই; পরন্তু মাধব-পরিব্রাজকনামক একজন সন্ন্যাসী উহার টীকা রচনা করিয়াছেন।

ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকার উপর মহামতি বাচস্পতিমিশ্র যে, টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম—সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। ইহা অতি উপাদেয় ও সারগর্ভ প্রামাণিক টীকা। ইহা ছাড়া গৌড়পাদাচার্য্যকৃত একখানা ভাষ্য ও সাংখ্যচন্দ্রিকানামে আর একখানা টীকাব্যাখ্যা আছে। সে সকল টীকা-ভাষ্য এখনও অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে। আমরা এস্থানে প্রধানতঃ প্রচলিত সাংখ্যদর্শন হইতেই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিব।

[সাংখ্যদর্শন]

অপরাপর আস্তিক দর্শনের ন্যায় সাংখ্যদর্শনও দুঃখবাদে আরব্ধ এবং তদুচ্ছেদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সূত্রকার প্রথম সূত্রেই সে কথা বলিয়া দিয়াছেন—

"ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" ১।১।

(১) "সাংখ্যকারিকয়া লেশাদাত্মতত্ত্বং বিবেচিতম্।"

জগতে তিনপ্রকার দুঃখ লোকের অনুভূত হইয়া থাকে, এক আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় আধিভৌতিক ও তৃতীয় আধিদৈবিক। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি অবাহ্য পদার্থ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহা আধ্যাত্মিক। শারীরিক ধাতুবৈষম্যে রোগ হয়, এবং মানসিক বিকার হইতেও কাম ক্রোধাদির আবির্ভাব হয়, ঐ উভয়-বিধ কারণ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহা আধ্যাত্মিক দুঃখ। শারীরিক ও মানসিকভেদে আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার। উক্ত উভয় দুঃখই আভ্যন্তরীণ উপায়সাধ্য; আর আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই উভয় প্রকার দুঃখই বাহ্যোপায়জাত। তন্মধ্যে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদি ভূতবর্গ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম আধিভৌতিক, আর যক্ষ, রাক্ষস ও বিনায়ক প্রভৃতি দেবতাবিশেষ হইতে যে সমস্ত দুঃখ আবির্ভূত হয়, সে সমুদয় আধিদৈবিক দুঃখ নামে অভিহিত হয়।

উল্লিখিত ত্রিবিধ দুঃখের সহিত সংস্পর্শ নাই, এরূপ লোক জগতে অতীব বিরল—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই উহার সঙ্গে নিত্য পরিচিত। নিত্য পরিচিত হইলেও, দুঃখ কাহারই প্রিয় নহে; অপ্রিয় বলিয়াই দুঃখ-পরিহারের জন্য সকলে সমভাবে যত্ন করিয়া থাকে। ফলকথা, দুঃখমাত্রই যে, অপ্রিয় ও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, এ বিষয়ে চেতনাবান্ কোন লোকেরই মতভেদ নাই; সুতরাং দুঃখনিবৃত্তি যে, সকল পুরুষেরই প্রার্থনীয়—পুরুষার্থ, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখশান্তি করে বলিয়াই ধর্ম্ম, অর্থ,

কামও পুরুষার্থ—পুরুষের প্রার্থনীয় হয় সত্য, কিন্তু উহারা পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ নহে; কারণ, ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম দ্বারা যে, সুখসম্পদ্ লাভ করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে দুঃখসম্বন্ধবর্জ্জিত নহে, এবং ঐ সকল উপায়ে যে, দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাও আত্যন্তিক (যেরূপ নিবৃত্তির পর আর দুঃখোদয় না হয়, সেরূপও) নহে; এইজন্য ঐ সকল উপায়কে পরমপুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না, মন্দপুরুষার্থ বলা যায় মাত্র (১)। বিজ্ঞজনেরা সেরূপ দুঃখনিবৃত্তিতে পরিতুষ্ট হন না। তাঁহারা চাহেন—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি; যেরূপ নিবৃত্তির পর আর কস্মিন্ কালেও দুঃখ-সংবন্ধ হইবে না, সেইরূপ দুঃখনিবৃত্তি। এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার বলিতেছেন—

"ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ অত্যন্তপুরুষার্থঃ।"

অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিমাত্রই অত্যন্ত পুরুষার্থ নহে, পরন্তু অত্যন্ত নিবৃত্তি; এবং সেই অত্যন্ত নিবৃত্তিরই অপর নাম মোক্ষ বা কৈবল্য। মোক্ষদশায় উপভোগযোগ্য কোনপ্রকার

---

(১) "প্রাত্যহিক ক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্।"
(সাংখ্যদর্শন ১।৩।

"দৃষ্টসাধনজন্যায়াং দুঃখনিবৃত্তৌ অত্যন্ত-পুরুষার্থত্বমেব নাস্তি; যথাকথঞ্চিৎ পুরুষার্থত্বং তু অস্ত্যেব" ইতি ভাষ্যম্।

অভিপ্রায় এই যে, লৌকিক উপায়ে যে, দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহাতে কেবল অত্যন্ত পুরুষার্থত্বই নাই, কিন্তু যথাকথঞ্চিৎ নিকৃষ্ট পুরুষার্থ, তাহাতেও আছে; যেমন, প্রাত্যহিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভোজন করা পুরুষার্থ, এখানেও তদ্রূপ সামান্য পুরুষার্থত্বমাত্র আছে, বুঝিতে হইবে।

আনন্দের সম্ভাবনা থাকে না। তবে, 'দুঃখাভাবঃ সুখম্'—দুঃখের অভাবই সুখ, এই মতানুসারে তাদৃশ দুঃখনিবৃত্তিকেই সুখ সংজ্ঞা প্রদান করিলে, কাহারও কোনও আপত্তির কারণ দেখা যায় না (১); সে যাহা হউক, তাদৃশ দুঃখনিবৃত্তির বা মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হইতেছে—বিবেকজ্ঞান (আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য বোধ); সুতরাং বিবেকজ্ঞানই মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রধান ও প্রথম লক্ষ্যস্থল। স্বয়ং শ্রুতিও বলিতেছেন—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৫।৬)

আত্মাকে দর্শন করিবে—প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া জানিবে; এবং তদ্বিষয়ে প্রথমে শ্রবণ করিবে; পরে মনন করিবে, শেষে নিদিধ্যাসন করিবে, অর্থাৎ যোগশাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে ধ্যান

---

(১) সাংখ্যশাস্ত্রে আত্মাব সৎ-চিৎস্বরূপমাত্র স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু আনন্দ রূপ স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যমতে মোক্ষের অপর নাম কৈবল্য। কৈবল্য অর্থ আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি। সৎ ও চিৎই আত্মার স্বরূপ, আনন্দ নহে; সুতরাং কৈবল্যদশায় আত্মাতে কোন প্রকার আনন্দ সম্বন্ধ থাকে না এবং থাকিতেও পারে না; অথচ কোন কোন প্রামাণিক গ্রন্থে মুক্ত আত্মাতেও আনন্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; এই অসামঞ্জস্য নিবারণার্থ সাংখ্যসম্প্রদায় দুঃখাভাবকেই তৎকালীন সুখ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং তাহা দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত বিরোধেরও মীমাংসা করিয়া থাকেন। মোক্ষাবস্থায় জীবের যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অভাব ঘটে, সেই দুঃখাভাবকেই অপরাপর দার্শনিকগণ সুখ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, ইহাই সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিপ্রায়।

করিবে। এখানে আত্মদর্শনের জন্য তিনটী উপায় বিহিত হইয়াছে—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন; সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার (বিবেকজ্ঞান) হইতেছে—লক্ষ্য বা ফল; আর শ্রবণাদিত্রয় হইতেছে তাহারই উপায়। শাস্ত্রান্তরে শ্রবণাদির পরিচয়প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

প্রথমে শ্রুতি বাক্য হইতে আত্মার স্বরূপাদি বিষয় শ্রবণ করিবে; শ্রবণের পর, শ্রুতার্থবিষয়ে যে সমুদয় শঙ্কা মনোমধ্যে সমুদিত হয়, তন্নিরাসার্থ শাস্ত্রসম্মত নিয়মানুসারে বিচার করিবে; বিচার দ্বারা শ্রুতার্থের শঙ্কা তিরোহিত হইলে পর, যোগশাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে সেই অসন্দিগ্ধ বিষয়ে নিরন্তর ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যানের পরিণামে আত্ম-বিষয়ে বিবেকজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। অতএব সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে উক্ত তিনপ্রকার কার্য্যের (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের) যথাযথভাবে অনুষ্ঠানই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রকৃত উপায়। আলোচ্য সাংখ্যশাস্ত্র সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবেক-জ্ঞান ও তদুপযোগী বিচারপ্রণালী (মননের ক্রম) উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য এই আয়োজন করিয়াছেন।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে বিবেকজ্ঞান যেমন একটী উপায়, তেমনই আরও বহুবিধ সহজ উপায় জগতে সুপ্রসিদ্ধ আছে ও থাকিতে পারে। দুঃখনিবৃত্তিরূপ ফল যখন

উভয়েরই তুল্য, তখন স্বল্পকালব্যাপী সহজ-সাধ্য সেই সমুদয় লোকপ্রসিদ্ধ উপায় উপেক্ষা করিয়া, কোন বুদ্ধিমান্ লোক জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী আয়াসবহুল কঠোর-সাধনাসাধ্য সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত বিবেকজ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবে? (১)। লোকে বলে—

"অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" ॥

অর্থাৎ ঘরের কোণে যদি মধু মিলে, তবে আর মধুর জন্য পর্ব্বতে কে যায়? বস্তুতও এমন সহজসাধ্য লৌকিক উপায় বিদ্যমান থাকিতে ক্লেশবহুল উক্ত অলৌকিক উপায়ান্বেষণে উন্মত্ত ভিন্ন কাহারও প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। অতএব দুঃখনিবৃত্তির জন্য বিবেক-জ্ঞানোপদেশ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অনুপযোগী। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

"ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিঃ, নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ" ॥ ১।২ ॥

উপরে যে সমুদয় উপায়ের উল্লেখ করা হইল, এবং তদ্ভিন্ন আরও

---

(১) লোকপ্রসিদ্ধ উপায়ের মধ্যে—চিকিৎসাশাস্ত্রোপদিষ্ট ঔষধাদি দ্বারা ব্যাধিজ শারীরিক দুঃখের প্রতিকার হইতে পারে; মনোজ্ঞ বস্তুর উপভোগে ও প্রিয় বস্তুর লাভে মানসিক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে; নীতি শাস্ত্রপ্রদর্শিত পথ অবলম্বনে আধিভৌতিক দুঃখের উপশম করিতে পারা যায়, এবং মণি-মন্ত্র-মহৌষধি প্রভৃতির ব্যবহারে আধিদৈবিক দুঃখেরও উচ্ছেদ সাধন করিতে পারা যায়। অথচ এ সমস্ত উপায়ই বিবেক-জ্ঞান অপেক্ষা অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে আয়ত্ত হইয়া থাকে। অতএব লোকে এই সমুদয় সহজলভ্য উপায় পরিত্যাগ করিয়া কখনই বহুক্লেশসাধ্য বিবেকজ্ঞানের অনুসন্ধানে সাংখ্যশাস্ত্রের আশ্রয় লইবে না; কাজেই শাস্ত্রারম্ভ নিষ্প্রয়োজন ও অনাবশ্যক মনে হইতেছে।

যে সমুদয় উপায় লোকপ্রসিদ্ধ আছে, সে সমুদয় উপায়ে সাময়িক-ভাবে আংশিক দুঃখপ্রতিকার সম্ভবপর হইলেও, বিবেকী জনেরা যে প্রকার দুঃখ-প্রতিকারের জন্য ব্যাকুল হন, ঐ সমুদয় উপায় হইতে সেরূপ প্রতিকার লাভ কখনও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, তাঁহারা চাহেন দুঃখের আমূলত উচ্ছেদ, এবং অনুসন্ধান করেন তাহার অমোঘ উপায়। অভিপ্রায় এই যে, যেরূপ উপায়ের প্রয়োগ কখনও বিফল হয় না, এবং যেরূপ নিবৃত্তির পর আর কখনও কোনপ্রকার দুঃখসম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকে না, সেই প্রকার দুঃখনিবৃত্তির জন্য সেইপ্রকার উপায়ের অন্বেষণ কার্য্যেই বিবেকী লোকের স্বাভাবিক আগ্রহ হইয়া থাকে। লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত উপায়ই তাঁহাদের অভিপ্রায়ের প্রতিকূল ; কারণ, লোকপ্রসিদ্ধ কোন উপায়ই অব্যর্থ নহে ; এবং তাহার ফলও চিরস্থায়ী নহে। কুইনাইন্ জ্বরনিবৃত্তির উপায় বা ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ ; কিন্তু বহুক্ষেত্রে কুইনাইন্ সেবনেও জ্বরের নিবৃত্তি হয় না, এবং নিবৃত্তি হইলেও চিরদিনের জন্য হয় না ; একই রোগের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব বহুস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় ; কাজেই বুদ্ধিমান্ লোক কখনই এই প্রকার সাময়িক শান্তির জন্য ঐ জাতীয় অনিশ্চিত উপায় অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট বা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ঐ জাতীয় দুঃখ-প্রতিকার অজ্ঞ জনের প্রীতিকর ও প্রার্থনীয় হইলেও, বিজ্ঞজনেরা উহাকে 'মন্দ পুরুষার্থ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কেবল যে, লৌকিক উপায়েই তাদৃশ দুঃখপ্রতিকার সম্ভব হয়

না, তাহা নহে, বেদবিহিত অলৌকিক যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মও তাদৃশ দুঃখ প্রতিকারের প্রকৃষ্ট উপায় নহে। সূত্রকার বলিতেছেন—

"অবিশেষশ্চোভয়োঃ" ॥ ১৬॥

অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে যেমন সুনিশ্চিতরূপে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না, বেদবিহিত কর্ম্মরূপ অলৌকিক উপায়েও তেমনই আত্যন্তিক দুঃখপ্রতিকার হয় না, বা হইতে পারে না। ঐ সকল উপায়ও লৌকিক উপায়েরই মত অনিশ্চিত ও আত্যন্তিক দুঃখনিবারণের অনুপায়। বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা সাময়িকভাবে দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দ লাভ হয় সত্য, কিন্তু সে আনন্দের ও দুঃখনিবৃত্তির নিশ্চয়ই অবসান আছে।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

(ভগবদ্গীতা—৯।২১)

'কর্ম্মফলে যাহারা স্বর্গগত হন, তাঁহারা বিশাল স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ের পর পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন'। প্রভূত স্বর্গসুখ সম্ভোগের পর স্বর্গভ্রষ্ট সেই সকল কর্ম্মী-লোকের মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশে যে, অপরিসীম দুঃখ-যাতনা উপস্থিত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ আরও স্পষ্ট কথায় সকাম কর্ম্মমার্গের হেয়তা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধি-ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।"

'দৃষ্ট' অর্থ—পূর্ব্বকথিত লৌকিক উপায়সমূহ। আনুশ্রবিক

অর্থ—বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম (১)। এই আনুশ্রবিক কর্ম্ম-রাশিও ঠিক দৃষ্ট উপায়েরই অনুরূপ,—দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারাও সর্ব্বত্র দুঃখনিবৃত্তি হয় না, এবং হইলেও তাহা আত্যন্তিক বা চিরদিনের জন্য হয় না,—কেবল সাময়িক-ভাবে নিবৃত্তি হয় মাত্র। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হইবার কারণ তিনটী—অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়।—বেদোক্ত কর্ম্ম-মাত্রই হিংসাসাপেক্ষ;—এমন কোন কর্ম্মানুষ্ঠানই নাই, যাহাতে পশু বা বীজাদির হিংসা-সম্পর্ক না আছে; এবং এমন কোন হিংসাই নাই, যাহা দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে পাপের উদ্ভব না হয় (২)। আবার এমন কোন পাপই নাই, যাহা হইতে কোন প্রকার দুঃখ-যাতনা জন্মে না। এই জন্য বেদবিহিত কর্ম্মকে অবিশুদ্ধ বলা হইয়াছে।

---

(১) "গুরুপাঠাৎ অনুশ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবঃ—বেদঃ, শ্রূয়তে এব পরং, ন কেনচিৎ ক্রিয়তে। তত্র ভবঃ—প্রাপ্তঃ – জ্ঞাত ইতি যাবৎ।"

(সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ২)

গুরুমুখে উচ্চারণের পর শ্রুত হয় বলিয়া বেদের নাম অনুশ্রব। সেই বেদে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাই আনুশ্রবিক; এইরূপ যোগার্থানু-সারে বেদোক্ত কর্ম্মরাশিকে আনুশ্রবিক বলা হইয়া থাকে।

(২) সাংখ্যাচার্য্যগণ বৈধ হিংসায়ও পাপোৎপত্তি স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, হিংসামাত্রই পাপজনক। সে হিংসা বৈধই হউক, আর অবৈধই হউক; কোন হিংসাই অপাপকর হয় না। তবে, বৈধহিংসায় পাপের ভাগ অল্প, আর অবৈধ হিংসায় পাপের ভাগ অধিক, এই মাত্র বিশেষ।

তাহার পর, ঐ সকল কর্ম্মের ফল ক্ষয় ও অতিশয় এই দ্বিবিধ দোষে দুষ্ট। কর্ম্মের ফল যে, ক্ষয়শীল, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; ইহা ছাড়া কর্ম্মফলের যথেষ্ট তারতম্যও আছে;—ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম হইতে বিভিন্নপ্রকার যে সমুদয় ফল উৎপন্ন হয়, সেগুলি স্বভাবতই তারতম্যযুক্ত। সকল কর্ম্মের ফল একই রকম হয় না; আবার একই কর্ম্ম অনুষ্ঠানের দোষগুণে সময়ে বিচিত্র ফল প্রসব করিয়া থাকে। অতএব অনুষ্ঠিত কর্ম্মে পাপ-সম্বন্ধ থাকায় যেমন দুঃখের সম্ভাবনা, তেমনই কর্ম্মফলের তারতম্য নিবন্ধনও অনুষ্ঠাতৃগণের দুঃখ-সম্ভাবনা সমধিক আছে। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—

"পরসম্পদুৎকর্ষো হীনসম্পদং পুরুষং দুঃখাকরোতি।"
(সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।)

অর্থাৎ পরের অধিক সম্পদ্ দর্শনে তদপেক্ষা অল্পসম্পদ্‌যুক্ত লোকের হৃদয়ে স্বতই দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে। কাজেই বলিতে হয়—কর্ম্ম দ্বারা অপর দুঃখের নিবৃত্তি করা দূরে থাকুক, কর্ম্ম নিজেও নূতন নূতন দুঃখের সমুৎপাদন করিয়া অনুষ্ঠাতৃবর্গের ভীষণ অশান্তিকর হইয়া থাকে। অতএব কোন বুদ্ধিমান্ লোকই আপাত-মধুর লৌকিক বা বৈদিক উপায়ের উপর নির্ভর করিয়া দুঃখ-শান্তি বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এই জন্য বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে আত্যন্তিক দুঃখ-প্রশমনের জন্য অমোঘ অলৌকিক উপায়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

রোগের নিদান-নির্ণয় ব্যতিরেকে যেমন উপযুক্ত চিকিৎসা বা
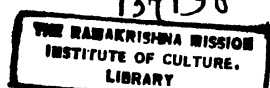
প্রতীকারোপায় স্থির করা যায় না, ঠিক তেমনই দুঃখের মূল কারণ নির্দ্ধারণ না হইলে, তৎপ্রতীকারের প্রকৃত উপায়ও অবধারণ করা সম্ভবপর হয় না; এই জন্য দুঃখ-প্রহাণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাদৌ দুঃখ, দুঃখ-কারণ, এবং দুঃখের সহিত আত্মার যোগ ও বিয়োগ (বন্ধ ও মোক্ষ), ইত্যাদি বিষয়গুলির বিশেষভাবে বিচার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যথারীতি বিচারই এই বিষম কণ্টকময় মুক্তি পথে উজ্জ্বল আলোক প্রদান করিয়া থাকে (১)।

দুঃখের নিদান-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই আত্মার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জানিতে ইচ্ছা হয়, আত্মার যে, বিবিধ দুঃখ-ভোগ, যাহার অপর নাম বন্ধ; সেই বন্ধ কি তাহার বাস্তবিক, না অবাস্তবিক (কাল্পনিক)। যদি বাস্তবিক হয়, তাহা হইলে যুগ-যুগান্তরব্যাপী সহস্র চেষ্টায়ও তাহার ধ্বংস-সাধন করা সম্ভবপর হইবে না; কারণ, বস্তু কখনই স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকে না। পক্ষান্তরে, স্বভাব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয় বস্তুর ধ্বংসও

(১) চিকিৎসাশাস্ত্রে দুই প্রকার চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট আছে —এক রোগ-প্রত্যনীক, অপর হেতুপ্রত্যনীক। যে চিকিৎসায় রোগের উপস্থিত যাতনা মাত্র নিবারিত হয়, কিন্তু যাতনার ভবিষ্যৎসম্ভাবনা বিদূরিত হয় না, তাহাকে বলে—রোগপ্রত্যনীক চিকিৎসা; আর যে চিকিৎসায় রোগের মূল কারণ পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহার নাম—হেতুপ্রত্যনীক চিকিৎসা। বুদ্ধিমান্ লোকেরা যেমন রোগ-প্রশমনের জন্য হেতুপ্রত্যনীক চিকিৎসাই চাহেন, বিবেকী লোকেরাও তেমনই দুঃখ প্রতীকারের জন্য উহার মূলোচ্ছেদকর উপায়েরই অন্বেষণ করেন; কিন্তু দুঃখের মূল-নির্ণয় ব্যতিরেকে তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না।

অবশ্যম্ভাবী। অগ্নি কখনও নিজের স্বাভাবিক উষ্ণতা ও প্রকাশ গুণ পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকে না। অতএব, দুঃখসম্বন্ধরূপ বন্ধও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ হইলে, তন্নিবারণার্থ মোক্ষ ও তদুপায় নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ অনর্থক বাতুলোক্তিতে পরিণত হইত। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষ-সাধনোপদেশ-বিধিঃ॥" ১।৭॥

"নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ॥" ১।৮॥

অভিপ্রায় এইযে, আত্মার দুঃখভোগরূপ বন্ধন স্বভাবসিদ্ধ হইলে তদুচ্ছেদের (মোক্ষের) জন্য শাস্ত্রে যে সমস্ত সাধনের উপদেশ আছে, সে সমুদয়ের অনুষ্ঠান করা কখনও সম্ভবপর হইতে পারিত না। বিশেষতঃ অসাধ্য বিষয়ের উপদেশই হইতে পারে না; যদি কোথাও সেরূপ উপদেশের ছায়া দৃষ্ট হয়, বুঝিতে হইবে যে, উহা প্রকৃত কর্ত্তব্যোপদেশ নহে; উহা উপদেশের মত কথা মাত্র। এইরূপ দেশ, কাল, ক্রিয়া বা অবস্থা-বিশেষ-নিবন্ধনও নিত্য, সর্ব্বব্যাপী ও অসঙ্গ আত্মার পক্ষে বন্ধন সম্ভবপর হয় না; কারণ, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী সকল আত্মার সহিত যখন তুল্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন একের বন্ধন ও অপরের মুক্তি, এইরূপ বৈষম্য না হইয়া সকল আত্মারই একভাবে থাকা উচিত হইত, এবং ক্রিয়া ও অবস্থাভেদ যখন দেহাশ্রিত ধর্ম্ম, তখন তদুভয়ের দ্বারাও অসঙ্গ—দেহাদির সহিত অসংস্পৃষ্ট আত্মার দুঃখযোগরূপ বন্ধনদশা কখনই সম্ভবপর হইতে পারিত না (১)।

---

(১) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক আত্মাই যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন যেরূপ স্থানের

নিম্নলিখিত চারিটী সূত্রে উপরি উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে—

"ন কালযোগতঃ, ব্যাপিনো নিত্যস্থ সর্ব্বসম্বন্ধাৎ ॥" ১।১২।

"ন দেশযোগতোঽপ্যস্মাৎ ॥" ১।১৩ ॥

"নাবস্থাতো দেহ-ধর্ম্মত্বাৎ তস্যাঃ ॥" ১ ১৪ ॥

"ন কর্ম্মণা, অন্যধর্ম্মত্বাৎ অতিপ্রসক্তেশ্চ ॥" ১।১৬ ॥

বন্ধন অসম্ভব হইলে তন্নিবৃত্তির (মুক্তির) জন্য উপযুক্ত উপায়ান্বেষণে কাহারই প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, জগতে প্রত্যেক জীবই দুঃসহ দুঃখ-জ্বালায় কাতর হইয়া নিরন্তর তদুচ্ছেদের উপায়ান্বেষণে বিব্রত রহিয়াছে, অতএব জীবের দুঃখসম্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কেবল অচেতন প্রকৃতির উপরেও আত্মাকে বাঁধিবার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; কারণ, প্রকৃতি নিজে পরতন্ত্র,—সংযোগের সাহায্য ব্যতীত সে আত্মার বন্ধন সম্পাদন করিতে পারে না। অগ্রে আত্মার (পুরুষের) সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইলে, পরে সেই প্রকৃতি দ্বারা আত্মার বন্ধন

সহিত সম্বন্ধ বশতঃ এক আত্মার বন্ধন হইবে, সেইরূপ স্থানের সহিত তুল্য সম্বন্ধ থাকায় অপরাপর আত্মারও নিশ্চয়ই বন্ধন ঘটিবে; সুতরাং মুক্ত আত্মারও পুনরায় বন্ধ ঘটিতে পারে। তাহার পর, কর্ম্ম ও অবস্থা, উভয়ই দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম; অসঙ্গ আত্মাতে উহাদের অস্তিত্ব নাই; সুতরাং কর্ম্ম বা অবস্থা দ্বারাও আত্মার বন্ধন সম্ভব হয় না। অপরের ধর্ম্মদ্বারা অপরের বন্ধন স্বীকার করিলে মুক্ত আত্মারও বন্ধন হইতে পারে, তাহা ত কাহারই অভিপ্রেত নহে।

ঘটিতে পারে ; সুতরাং আত্ম-বন্ধনের জন্য বাধ্য হইয়া প্রকৃতিকে সংযোগের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় (১)।

সংযোগের সহায়তা ব্যতীত কেবল প্রকৃতি দ্বারাও যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মার বন্ধন (দুঃখযোগ) সম্ভবপর হয় না ; তখন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে,—

"ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্‌যোগাদৃতে ॥" ১।১৯ ॥

আত্মা যখন নিত্য শুদ্ধ, জ্ঞান ও মুক্তস্বভাব (২) ; তখন প্রকৃতির সহিত সংযোগ ব্যতীত কখনই তাহার দুঃখ-যোগরূপ বন্ধন-সম্বন্ধ হইতেই পারে না ; অতএব প্রকৃতির সহিত আত্মার যে, এক প্রকার বিজাতীয় সংযোগ, তাহা হইতেই আত্মার বন্ধন বা দুঃখ-সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে (২) ; সুতরাং আত্মার দুঃখ-

---

(১) "প্রকৃতিনিবন্ধনাৎ চেৎ, ন, তস্যা অপি পারতন্ত্র্যম্" ॥ ১।১৮ ॥

অর্থাৎ প্রকৃতিও যখন সংযোগ ব্যতীত বন্ধন ঘটাইতে অক্ষম—পরতন্ত্র, তখন সাক্ষাৎ প্রকৃতিকেও বন্ধনের কারণ বলিতে পারা যায় না।

(২) নিত্য অর্থ—যাহা কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। নিত্যশুদ্ধ অর্থ—সর্ব্বদা পাপপুণ্যবর্জ্জিত। নিত্যবুদ্ধ অর্থ—যাহার জ্ঞান-প্রকাশ কখনও বিলুপ্ত হয় না। নিত্যমুক্ত অর্থ—যাহা কখনও বাস্তব দুঃখে সংযুক্ত নহে। আত্মা চিরকালই উক্ত প্রকার স্বভাবসম্পন্ন।

(৩) এস্থলে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥" (সাংখ্যকারিকা ২০)

অর্থাৎ পুরুষের সংযোগ লাভ করিয়া অচেতন বুদ্ধি (লিঙ্গ) চেতনের ন্যায় হয়, আবার প্রকৃতির সংযোগলাভ করিয়া প্রকৃতি-ধর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি দ্বারা উদাসীন—নিষ্ক্রিয় পুরুষও (আত্মাও) জ্ঞাতা ও কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হয়।

সম্বন্ধরূপ বন্ধ বাস্তবিক নহে, ঔপাধিক—আগন্তুক। বলা আবশ্যক যে, অগ্নি-সংযোগে যেরূপ জলে উষ্ণতার উৎপত্তি হয়, কিংবা সৌরভসংযোগে বায়ুমণ্ডলে যেরূপ গন্ধের আবির্ভাব হয়, আত্মার দুঃখ-সংযোগ সেরূপ নহে; পরন্তু রক্ত পুষ্পের সন্নিধানে অবস্থিত শুভ্র স্ফটিকে যেরূপ লৌহিত্যের প্রতিবিম্বন হয়, ঠিক সেইরূপ অন্তঃকরণস্থিত দুঃখেরই আত্মাতে প্রতিবিম্বন হয় মাত্র; বস্তুতঃ সেই দুঃখ দ্বারা আত্মার স্বরূপতঃ কোনপ্রকার বিকার বা বিপর্য্যয় ঘটে না। এই অভিপ্রায়ে সৌরপুরাণ বলিয়াছেন—

"যথা হি কেবলো রক্তঃ স্ফটিকো লক্ষ্যতে জনৈঃ।
রঞ্জকাদ্যুপধানেন তদ্বৎ পরমপূরুষঃ॥"

কেবল—বিশুদ্ধ স্ফটিক যেমন রঞ্জক জবাকুসুমাদি বস্তুর সহযোগে রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত সংযোগে স্বভাব-শুদ্ধ পুরুষও বুদ্ধিগত সুখ-দুঃখাদিযুক্ত বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে (১)।

উল্লিখিত আলোচনার ফলে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব; স্বরূপতঃ তাহাতে সুখ-দুঃখাদির সম্পর্কমাত্রও নাই; কেবল বুদ্ধির সহিত সংযোগের

(১) এখানে জানা আবশ্যক যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত পুরুষের যে, নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তাহা ধরিয়া এই সংযোগ-ব্যবহার হয় না; পরন্তু প্রকৃতির পরিণামভূত বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত যে, পুরুষের বিজাতীয় সংযোগ ঘটে, তাহাতেই পুরুষের সুখ-দুঃখাদি প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে; এই জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই বুদ্ধির সহিত পুরুষের যে, সংযোগ, সেই সংযোগকে লক্ষ্য করিয়াই 'প্রকৃতি-পুরুষসংযোগ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দরুণ, দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ববৎ তাহাতেও বুদ্ধি ও বুদ্ধিধর্ম্ম দুঃখ-প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানান্ধ জীব সেই সমুদয় বুদ্ধিধর্ম্মকেই আত্মাতে প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশমান দর্শন করিয়া অবিবেক বশে (আত্মা ও অনাত্মার বিবেক বা বিভেদ করিতে না পারিয়া) সেই অনাত্মধর্ম্মকেই আত্মধর্ম্ম বলিয়া মনে করে; এবং তাহার ফলে শোকমোহে অভিভূত হইয়া থাকে। অতএব সুখ-দুঃখাদি-বিহীন আত্মাকে যে, সুখ-দুঃখাদিযুক্ত বলিয়া মনে করা, তাহা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সেই ভ্রান্তির মূল হইতেছে—অবিবেক, আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য-বোধের অভাব। এই অবিবেকই বুদ্ধি-পুরুষসংযোগের মূল কারণ; একথা পরবর্ত্তী—

"তদ্‌যোগোঽপ্যবিবেকাৎ" (১।৫৫)

সূত্রে স্বয়ং সূত্রকারই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন (১)।

---

(১) তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা চেতন ও নিত্যশুদ্ধ, আর বুদ্ধি প্রাকৃতিক জড় পদার্থ। প্রাক্তন অদৃষ্টের প্রেরণায় বুদ্ধির সহিত আত্মার সংযোগ ঘটে। তাহার পর, বুদ্ধিগত ধর্ম্মসমূহ সন্নিহিত আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয়। তখন চেতনের সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন বুদ্ধিও চেতনের মত প্রতীত হয়। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—আত্মাতে যেমন বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পড়ে, বুদ্ধিতেও তেমনই আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। এইরূপ পরস্পর প্রতিবিম্বপাতের ফলে উভয়েই উভয়াকারে প্রতিভাসমান হয়। সেই কারণে তখন উভয়ের প্রভেদ সহজে বুদ্ধিগম্য হয় না; পরস্পরেতে পরস্পরের অভেদ-ভ্রম উপস্থিত হয়। জন্মান্তরার্জ্জিত এই অভেদভ্রম বা অবিবেক হইতেই আত্মার সঙ্গে সংস্কারসহিত বুদ্ধির বারংবার সংযোগ ঘটিয়া থাকে।

অবিবেকই যে, জীবের দুঃখ-নিদান, এ বিষয়ে গোতম, পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিকগণও একবাক্যে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। গোতম মিথ্যাজ্ঞানকে দুঃখ-যোগের নিদান বলিয়াছেন; আর পতঞ্জলি অবিদ্যাকে বুদ্ধিসংযোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। অবিদ্যা ও মিথ্যাজ্ঞান উক্ত অবিবেকেরই নামান্তর মাত্র।

অতঃপর চিন্তনীয় বিষয় হইতেছে এই যে, উক্ত অবিবেক নিবারণের উপায় কি? এমন অব্যর্থ উপায় কি আছে, যাহা দ্বারা সর্ব্বানর্থের নিদান এই অবিবেক-বীজ সমূলে উন্মূলিত করিতে পারা যায়? তদুত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—

"নিয়ত-কারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ॥" ১।৫৬॥

অভিপ্রায় এই যে, কার্য্যমাত্রই কারণ-সাপেক্ষ; কারণ কিন্তু সেরূপ নহে—সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ (নিয়ত ও অনিয়ত) দুই প্রকারই হইতে পারে। কার্য্যবিশেষের জন্য কতকগুলি কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং সে সকল কারণ সন্নিহিত থাকিলে তদনুরূপ কার্য্যোৎপত্তিও অনিবার্য্য হইয়া থাকে। সেই সমুদয় কারণকে নিয়ত কারণ বলা হয়। অন্ধকার নিরসনের পক্ষে আলোক হইতেছে নিয়ত কারণ; কেন না, অন্ধকার অপনয়নের জন্য আলোক ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, এবং আলোক-সন্নিধানে অন্ধকারের বিনাশও

---

(১) গোতম বলিয়াছেন—"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ॥" ন্যায়দর্শন ১।১।৩।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"তস্য হেতুরবিদ্যা॥" পাতঞ্জলদর্শন। ২।২৪।

সুনিশ্চিত ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; পক্ষান্তরে, জগতে আলোক ভিন্ন এমন কোন বস্তু নাই, যাহা দ্বারা অন্ধকারের সমুচ্ছেদ করা যাইতে পারে ; অতএব আলোকই অন্ধকার উচ্ছেদের নিয়ত কারণ। অন্ধকার নিরসনে আলোক যেমন নিয়ত কারণ, অজ্ঞানের বা অবিবেকের নিরসনে জ্ঞানও তেমনই নিয়ত কারণ ; জ্ঞান ব্যতীত সহস্র চেষ্টায়ও অজ্ঞানের অপনয়ন করা সম্ভবপর হয় না ; হয় না বলিয়াই উহা অজ্ঞান-নিরসনের নিয়ত কারণ। এই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—অজ্ঞাননাশের নিয়ত কারণ—বিবেক-জ্ঞানের সাহায্যেই সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অবিবেকের উচ্ছেদ হইতে পারে ; অতএব যাঁহারা দুঃখময় সংসার-বন্ধনের আত্যন্তিক উচ্ছেদ করিতে অভিলাষী—মুমুক্ষু, তাঁহারা অগ্রে দুঃখ-নিদান সেই অবিবেক-ধ্বংসের জন্য বিবেক-জ্ঞানোপযোগী উপায়-লাভে যত্নপর হইবেন (১)।

এখানে জানা আবশ্যক যে, আমাদের জ্ঞান ও অজ্ঞান (ভ্রম), উভয়ই দুইশ্রেণীতে বিভক্ত—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ হইতে কিংবা যুক্তিতর্কাদিসমন্বিত অনুমানের সাহায্যে, অথবা তাদৃশ অন্য কোন উপায়ে আমাদের যে সমুদয় জ্ঞান বা অজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে সমুদয় জ্ঞান ও অজ্ঞান পরোক্ষশ্রেণীভুক্ত ; আর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে যে সমুদয় জ্ঞান বা অজ্ঞানের

---

(১) চিত্ত নির্ম্মল না হইলে বিবেক-জ্ঞান জন্মে না ; এই জন্য চিত্তশুদ্ধির অনুকূল যে সমুদয় উপায়—নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি বিহিত আছে, মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বদা সেই সমুদয় উপায়ের অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক।

উৎপত্তি হয়, সে সমুদয় অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষশ্রেণীর অন্তর্গত। তন্মধ্যে যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান উপস্থিত হইলে পরোক্ষ, অপরোক্ষ উভয়বিধ অজ্ঞানই বিনষ্ট হয়, কিন্তু পরোক্ষজ্ঞানে কখনই অপরোক্ষ অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না, বা হইতে পারে না; কারণ, পরোক্ষজ্ঞান অপেক্ষা অপরোক্ষ অজ্ঞান অত্যন্ত বলবান্। দুর্ব্বল কখনই প্রবলের বাধা ঘটাইতে পারে না; সুতরাং কেবল শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশলব্ধ কিংবা যুক্তিতর্কাদিসম্ভূত পরোক্ষ বিবেকজ্ঞান দ্বারাও আত্ম-বিষয়ক অপরোক্ষ ভ্রম বিদূরিত হয় না। ঐ প্রত্যক্ষাত্মক অবিবেক-ধ্বংসের জন্য আত্মা ও অনাত্মা বিষয়ে প্রত্যক্ষ বিবেক-জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়। এ কথা সূত্রকার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—

"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে" ॥ ১।৫৯ ॥

অর্থাৎ এই যে, আত্মা ও অনাত্ম-বিষয়ক অবিবেক বা অজ্ঞান, যাহা হইতে সমস্ত জীবজগৎ নিরন্তর দুঃখসাগরে ভাসিতেছে। যতক্ষণ তদ্বিরুদ্ধে জীবের প্রত্যক্ষানুভূতি না হইবে, ততক্ষণ শত যুক্তিতর্কেও (পরোক্ষ জ্ঞানেও) উহার বাধা বা অপনয়ন সম্ভবপর হইবে না। দিগ্‌ভ্রম ইহার উত্তম উদাহরণ,—দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শত যুক্তিতর্কে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও, ততক্ষণ সে কিছুতেই সেই প্রকৃত দিক্‌টী উপলব্ধি করিতে পারিবে না, যতক্ষণ সে নিজে উহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারে। এই দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় আত্ম-বিষয়ে ভ্রান্ত ব্যক্তিও যে পর্য্যন্ত আত্মা ও অনাত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই

অবিবেক-মোহ বিধ্বস্ত করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে না; এইজন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিকে অপরোক্ষ বিবেকজ্ঞানের সাধনে সতত যত্নপর হইতে হয়।

উক্ত বিবেকজ্ঞান-লাভের পক্ষে একান্ত অপেক্ষিত—পুরুষ, প্রকৃতি ও তদ্বিকার বুদ্ধি প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও তৎসাধক ত্রিবিধ প্রমাণ এবং তদুপযোগী অন্যান্য বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্য-শাস্ত্রে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

[প্রমাণ।]

শাস্ত্রোক্ত বিষয়কে সাধারণতঃ 'প্রমেয়' বলে। প্রমেয়-সিদ্ধি প্রমাণ-সাপেক্ষ। "প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি" প্রমাণ হইতেই প্রমেয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত পদার্থ লৌকিকই হউক, আর অলৌকিকই হউক, যতক্ষণ কোন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হয়, ততক্ষণ সে পদার্থের অস্তিত্বাদি সম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দেহ হয় না ও হইতে পারে না। প্রমাণশূন্য অপ্রামাণিক পদার্থের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বাতুল ভিন্ন কেহই স্বীকার করিতে পারে না। এই জন্য প্রমেয় নিরূপণের অগ্রে প্রমাণ চিন্তা করা গ্রন্থকারের পক্ষে আবশ্যক হয়।

প্রমাণ অর্থ—প্রমা জ্ঞানের সাধন। প্রমা অর্থ—যথার্থ জ্ঞান। সেই প্রমা জ্ঞান যাহা দ্বারা সুনিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম প্রমাণ। সাংখ্যমতে—প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, প্রথমতঃ কোন একটী ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন একটী দৃশ্য বিষয়ের সান্নিধ্য উপস্থিত হয়; পরে, সেই সন্নিহিত বিষয়টী যদি সেই

ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ-যোগ্য হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই ইন্দ্রিয়টী সেই বিষয়ের সঙ্গে সংযোগলাভ করে। অতঃপর অন্তঃকরণগত তমোগুণ—যাহা দ্বারা সত্ত্বগুণের প্রকাশন-শক্তি আবৃত বা বাধা-প্রাপ্ত ছিল, তাহা আপনা হইতেই ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বগুণ প্রবল বা উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। তখন সেই শুদ্ধসত্ত্ব অচেতন অন্তঃকরণে সন্নিহিত চিন্ময় পুরুষ (আত্মা) প্রতিবিম্বিত হয়; তখন আলোক-সন্নিহিত নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় অচেতন অন্তঃকরণও চেতনের ন্যায় উজ্জ্বল ও পরপ্রকাশনে সমর্থ হয়। তাহার পর, তৈজস অন্তঃকরণ সেই ইন্দ্রিয়-গৃহীত বিষয়ে যাইয়া পতিত হয়, এবং তাহার আকারে আকারিত হয়। অন্তঃকরণের যে, এইরূপে বিষয়াকারে পরিণাম. ইহারই অপর নাম—বৃত্তি ও অধ্যবসায়। বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ সমুৎপাদন করাই বিষয়াভিমুখে বৃত্তি নির্গমনের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পরই বৃত্তির বিষয়ীভূত সেই বিষয়টী আলোকচিত্রের ন্যায় বুদ্ধি-দর্পণে আসিয়া প্রতিবিম্বিত হয়। তখন অন্তঃকরণ সেই প্রতিফলিত বিষয়ের গুণাদি দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া, সেই বিষয়াকারেই আপনাকে পরিচিত করে, এবং গৃহীত বিষয় ও তদ্বিষয়ক বৃত্তিসহকারে আপনাকেও আবার নিকটস্থ পুরুষে (আত্মাতে) প্রতিবিম্বাকারে প্রতিফলিত করে। ইহাই সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণ নিয়ম বা ব্যবস্থা।

ইহার মধ্যে নিত্যশুদ্ধ চেতন আত্মা হইতেছে—প্রমাতা (জ্ঞাতা), অন্তঃকরণের বিষয়াকারে বৃত্তি হইতেছে—প্রমাণ,

আর বিষয়াকারা অন্তঃকরণবৃত্তির যে, চেতন পুরুষে প্রতিবিম্বন, তাহা হইতেছে—প্রমা—প্রমাণের ফল। ইহার অপর নাম বোধ ও অনুব্যবসায় প্রভৃতি (১)।

উপরে যে, জ্ঞানোৎপত্তির প্রণালী প্রদর্শিত হইল, ইহা সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত। তিনি বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যোন্য প্রতিবিম্বন স্বীকার করেন। পুরুষ যেমন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অচেতন বুদ্ধিকেও চেতনের ন্যায় প্রকাশশীল করে, বুদ্ধিও আবার তেমনই বিষয়াকারা বৃত্তির সহিত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া সুখদুঃখাদিবিহীন নিষ্ক্রিয় পুরুষকেও সক্রিয় ও সুখদুঃখাদিবিশিষ্টের ন্যায় করিয়া তোলে (২)। ইহার ফলে, জড়স্বভাব

---

(১) বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

"প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ।
প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥
প্রতিবিম্বিতবৃত্তীনাং বিষয়ো মেয় উচ্যতে।
সাক্ষাদ্দর্শনরূপং চ সাক্ষিত্বং বক্ষ্যতি স্ফুটম্॥" (ভাষ্য ১।৮৩)।

আমাদের মতে শুদ্ধচেতন পুরুষই প্রমাতা (জ্ঞাতা), অন্তঃকরণের বৃত্তি হইতেছে প্রমাণ, আর বিষয়াকারে আকারিত অন্তঃকরণের বৃত্তির যে, চেতন আত্মাতে প্রতিবিম্বপাত, তাহার নাম প্রমা—প্রমাণফল জ্ঞান। বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর নাম মেয়। ইহার সাক্ষাৎ দ্রষ্টার নাম সাক্ষী। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শব্দ—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেই এই নিয়ম।

(২) শাস্ত্রান্তরেও পুরুষে এইরূপ প্রতিবিম্বপাত উল্লিখিত আছে।

"গৃহীতানিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ আত্মনে যঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তঃকরণরূপায় তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥" (ভাষ্যধৃত পুরাণ-বচন।)

বুদ্ধিও বিষয়ের প্রকাশে সমর্থ হয়, আবার নির্ব্বিশেষ পুরুষও সবিশেষ বলিয়া পরিচিত হয়। পুরুষে যে, বিষয়াকারা বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বন, তাহাই পুরুষের ভোগ। এতদতিরিক্ত কোন প্রকার বাস্তবিক ভোগ পুরুষে সম্ভবপর হয় না। অথচ—

"চিদবসানো ভোগঃ॥" ১।১০৪।

এই সূত্র হইতে জানা যায় যে, ভোগ্য বিষয়ের যে, চিৎস্বরূপ পুরুষে পর্য্যবসান—পরিসমাপ্তি, তাহাই পুরুষের ভোগ। কিন্তু অচেতন ভোগ্যবিষয় কখনই চিৎস্বরূপে পর্য্যবসিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে নির্ব্বিকার পুরুষও কখনই বুদ্ধির ন্যায় বিষয়াকারে পরিণত হইতে পারে না; অথচ জগতে পুরুষের ভোগ অপ্রসিদ্ধও নহে; কাজেই—অগত্যা উক্ত প্রকার প্রতিবিম্ব-সম্বন্ধেই পুরুষের ভোগ স্বীকার করিতে হয়। প্রতিবিম্ব-সংযোগে কোন বস্তুরই স্বরূপহানি ঘটে না; সুতরাং প্রতিবিম্বরূপ ভোগ দ্বারা কূটস্থ পুরুষেরও স্বরূপহানি বা বিকারদোষ সম্ভাবিত হয় না। যেরূপ ভোগের দ্বারা ভোক্তার পরিণাম বা বিকার সংঘটিত হয়, সেরূপ যথার্থ ভোগ বুদ্ধিতেই হয়, পুরুষে হয় না। বুদ্ধিগত সেই ভোগই পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া 'পুরুষের ভোগ' বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই মাঘ কবিও "ফলভাজি সমীক্ষ্যোক্তেবুর্দ্ধের্ভোগ ইবাত্মনি" বলিয়া উপমা দিয়াছেন।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরিণামশীলা বুদ্ধিই যখন সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করে, এবং পুরুষ যখন কেবল সাক্ষিরূপে

বুদ্ধিকৃত কর্ম্মরাশি নিরীক্ষণ মাত্র করে; তখন—"ফলং চ কর্ত্তৃ-গামি" অর্থাৎ ক্রিয়ার ফল কর্ত্তাতেই হয়, এই নিয়মানুসারে সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বশালিনী কেবল বুদ্ধিতেই কর্ম্মফলের উপভোগ হইতে পারে, পুরুষে তাহা হয় কি প্রকারে? একের কৃত কর্ম্মের ফল অপরে ভোগ করে, একথা স্বীকার করিলে, জগতে বিষম বিশৃঙ্খলা বা অব্যবস্থা আসিয়া পড়ে। এ কথার উত্তরে সাংখ্যকার বলেন; যদিও অধিকাংশস্থলে, কর্ত্তাকেই স্বসম্পাদিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে দেখা যায় সত্য, তথাপি উহাই জগতে অব্যভিচারী নিয়ম নহে। কেন না,—

"অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ ॥" ১।১০৫ ॥

অর্থাৎ কর্ত্তাই যে, কেবল স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিবে, অন্যে করিবে না, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। অন্যকৃত কর্ম্মফলও অন্যকে ভোগ করিতে দেখা যায়,—পাচক অন্ন পাক করে, অন্যে তাহা ভোজন করে। এখানে পাকক্রিয়া ও ভোজন ক্রিয়ার কর্ত্তা এক নহে, স্বতন্ত্র; সুতরাং কর্ত্তাকেই কেবল স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম সার্ব্বত্রিক নহে— প্রায়িক মাত্র। অতএব পুরুষ (আত্মা) কর্ত্তা না হইয়াও ফলভোগে অধিকারী হইতে পারে; কোন বাধা দেখা যায় না।

এ পর্য্যন্ত প্রমাণ-ব্যবহার সম্বন্ধে যে সমুদয় কথা বলা হইল, সে সমুদয়ই ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর কথা। 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'কার মহামতি বাচস্পতিমিশ্র এ মতে সম্মত নহেন। তিনি বলেন—

'চিন্ময় পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রাকৃতিক বুদ্ধির পরিণাম হয়—

অচেতন বুদ্ধিও পুরুষের ন্যায় চেতনায়মান হয়। সেই লব্ধচৈতন্যা বুদ্ধিতে আসিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ প্রতিফলিত হয়। উদাসীন বা নিষ্ক্রিয় পুরুষে সে সমুদয়ের কোন প্রকার প্রতিবিম্ব সংস্পর্শ হয় না; পুরুষ যেমন ছিল, তেমনই থাকে। কেবল পৌরুষ চৈতন্য আসিয়া. অচেতন জড়স্বভাব বুদ্ধিতে যে সমুদয় বিষয় প্রতিবিম্বিত থাকে, সেই সমুদয় প্রতিবিম্বিত বিষয় ও বুদ্ধি.উভয়কেই প্রকাশ করে মাত্র, কিন্তু তাহার কোন অংশ গ্রহণ করে না; সুতরাং পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে কিংবা অন্য কোনপ্রকারেও ভোগ-সম্বন্ধ আদৌ ঘটে না। তথাপি বুদ্ধি তখন চেতনবৎ উদ্ভাসিত থাকায়, লোকে বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য বুঝিতে পারে না। এই বুঝিতে না পারারই নাম 'অবিবেক' বা অজ্ঞান। এই অবিবেকের ফলে বুদ্ধিকেই আত্মা মনে করিয়া বুদ্ধির ভোগকেই (বিষয় গ্রহণকেই) আত্মার ভোগ বলিয়া মনে করে। স্বয়ং ভগবান্‌ও নিম্নলিখিত—

> "কার্য্য-কারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
> পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
> পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।"
> "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য"— (গীতা ১৩।২০-২১)।

এই শ্লোকে উক্ত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। সূত্রকার বলিয়াছেন—

> "অবিবেকাদ্বা তৎসিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ॥" ১।১০৬।

অর্থাৎ কর্ত্রীস্বরূপা বুদ্ধিতেই ফল নিষ্পন্ন হয় সত্য, কিন্তু

কেবল অবিবেকবশতঃ (বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদগ্রহণের অভাব নিবন্ধন) অসঙ্গ পুরুষেও সেই ফলের ভোগ প্রতীত হয় মাত্র; বস্তুতঃ তাহাতে কোন প্রকার ভোগ সম্বন্ধই নাই (১)। এই মতে, ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে সত্ত্বসমুদ্রেক বশতঃ বুদ্ধিতে যে, বিষয়াকারা বৃত্তি হয়, তাহারই নাম প্রমাণ। আর অবিবেক বশতঃ পুরুষে যে, তাহার প্রতিভাস হয়, তাহার নাম প্রমা বা প্রমাণফল (২)।

এ নিয়ম প্রত্যক্ষাদি সর্ব্বপ্রমাণ-সাধারণ; কোন স্থানেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। অতএব প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণ-ক্ষেত্রেই উল্লিখিত নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। অতঃপর প্রমাণ-গত বিভাগ প্রদর্শন করা আবশ্যক হইতেছে। বলা

---

(১) ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অর্থ এইরূপ—সুখদুঃখ-ভোগাত্মক ফল কর্ত্রীস্বরূপা বুদ্ধিতে জন্মে না; জন্মে পুরুষে। কেবল অবিবেকবশতঃ কর্ত্রীস্বরূপা বুদ্ধিতে ভোগাভিমান হয় মাত্র।

(২) এ বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্রের নিজস্ব উক্তি এই :—

"উপাত্তবিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তৌ সত্যাং বুদ্ধেস্তমোঽভিভবে সতি, যঃ সত্ত্বসমুদ্রেকঃ, সঃ অধ্যবসায় ইতি, বৃত্তিরিতি, জ্ঞানমিতি চাখ্যায়তে। ইদং তাবৎ প্রমাণম্। অনেন যঃ চেতনাশক্তেরনুগ্রহঃ, তৎ ফলং—প্রমা বোধ ইতি।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। ৫।)

এখানে বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের যে উদ্রেক বা প্রাধান্য, তাহাই প্রমাণ, এবং তাহা দ্বারা যে, চেতন পুরুষের প্রতি অনুগ্রহ, তাহাই প্রমাণ-ফল। পুরুষ স্বভাবতঃ সুখ-দুঃখাদিবিহীন হইয়াও বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হওয়ায়, বুদ্ধি যে, পুরুষকে আপনার গুণে বিভূষিতপ্রায় করে, ইহাই পুরুষের প্রতি অনুগ্রহ।

বাহুল্য যে, প্রমাণের বিভাগ বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক দর্শনই বিশেষ-ভাবে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন। প্রত্যেকেই যেন অপরের অঙ্গীকৃত প্রমাণবিভাগ স্বীকার করিতে সমধিক কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন। তাহার ফলে, প্রমাণসংখ্যা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। ন্যায়দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

[প্রমাণ বিভাগ]

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। প্রমাণের সংখ্যা এতদপেক্ষা ন্যূনাধিক হইতে পারে না। এই ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্যেই সমস্ত অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং, প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি।"

প্রমেয় বা জ্ঞাতব্য পদার্থ নিরূপণ করাই প্রমাণের একমাত্র উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে তিনপ্রকার প্রমাণই যথেষ্ট; সুতরাং উক্ত তিনের অধিক বা ন্যূনসংখ্যক প্রমাণ কল্পনা করা সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অনাবশ্যক। সাংখ্যাচার্য্যগণ অন্যান্য দার্শনিকগণের অভিমত উপমান ও অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণ-সমূহকে উক্ত তিনপ্রকার প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন; কাজেই তাঁহারা সে সকল প্রমাণকে পৃথক্ করিয়া গণনা করেন নাই। সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ—

"যৎ সম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং, তৎ প্রত্যক্ষম্" ॥ ১।৮৯ ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বা আন্তর বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে

পর, অন্তঃকরণের (বুদ্ধিতত্ত্বের) যে, সেই সম্বন্ধ বিষয়ের আকারে বৃত্তি বা পরিণতিবিশেষ হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখানে বলা আবশ্যক যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের পর অন্তঃকরণের যে, বিষয়ের আকার ধারণ, সেই আকারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে; পরন্তু সেই আকার যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই আকারাশ্রয় বৃত্তিরই নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বিজ্ঞানভিক্ষুর মত (১)।

উপরে যে, প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল, ইহা কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষের লক্ষণ মাত্র; কিন্তু যোগ-শক্তি প্রভাবে যোগিজনের যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বস্তু বিষয়ে অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়, ইহা তাহার লক্ষণ নহে; সুতরাং যোগিজনের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইলেও কথিত লক্ষণে কোন দোষ ঘটিতেছে না। এই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

"যোগিনামবাহ্য-প্রত্যক্ষত্বাৎ ন দোষঃ ॥" ১।৯০ ॥

অভিপ্রায় এই যে, যোগিপুরুষদিগের যে, প্রত্যক্ষ, তাহা বস্তুতঃ বাহ্য প্রত্যক্ষই নয়; আমাদের কথিত লক্ষণটী বাহ্যপ্রত্যক্ষের (লৌকিক প্রত্যক্ষের) জন্য বিহিত; সুতরাং ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ যোগিপ্রত্যক্ষ এ লক্ষণের অনন্তর্গত বা অবিষয় হওয়ায় দোষাবহ হইতে পারে না।

---

(১) বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

"তথাচ স্বার্থসন্নিকর্ষজন্যাকারস্যাশ্রয়ো বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণমিতি নিষ্কর্ষঃ।"

অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষের ফলে যে, অন্তঃকরণের আকারবিশেষ হয়, সেই আকারের আশ্রয়ভূত বুদ্ধিবৃত্তির নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহাই সূত্রের ফলিতার্থ।

উল্লিখিত প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে বস্তুসত্তা প্রমাণিত হয় সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষই বস্তুসত্তা নির্দ্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড নহে। সময় ও অবস্থাভেদে প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু বিদ্যমান সত্ত্বেও প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়া থাকে (১)। বিশেষতঃ জগতে প্রত্যক্ষের অযোগ্য —অতীন্দ্রিয় বস্তুও বিস্তর আছে, যেমন, প্রকৃতি, পুরুষ, অদৃষ্ট, সৃষ্টিক্রম ও প্রলয় প্রভৃতি। নির্দ্দোষ অনুমান ও আপ্তবাক্যের সাহায্যে সে সকল পদার্থেরও অস্তিত্ব অবধারণ করিতে হয়। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"সামান্যতোদৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ" ॥ ১।১০৩ ॥

'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানের সাহায্যে প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদুভয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আরও স্পষ্ট কথায় আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্ ॥"

(সাংখ্যকারিকা—৬)

যে সকল পদার্থ অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সাধারণতঃ 'সামান্যতোদৃষ্ট'নামক অনুমানের দ্বারা সে সকল পদার্থের অস্তিত্ব

---

(১) সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"অতি দূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥" ৭ ॥

দৃশ্য বস্তুর অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়দোষ, মনের চাঞ্চল্য, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভূত থাকা, অপর বস্তুর সহিত মিলিত (একীভূত) হইয়া থাকা—এই সমস্ত কারণে বিদ্যমান বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয় না।

জানিতে পারা যায়; আর যে সকল পদার্থ 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানের দ্বারাও জানিতে পারা যায় না, সে সকল পদার্থও আপ্তবাক্য দ্বারা জানিতে পারা যায়। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যক্ষ না হইলেই যে, বস্তুর অভাব কল্পনা করিতে হইবে, ইহা যুক্তি ও ব্যবহারবিরুদ্ধ কথা। কেন না, প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক অতিদূরত্বাদি এমন বহুতর কারণ আছে, যে সকলের দ্বারা অতিপ্রসিদ্ধ বস্তুও লোকের প্রত্যক্ষগোচর হয় না বা হইতে পারে না; সুতরাং যাহারা একমাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী নাস্তিক (চার্ব্বাক সম্প্রদায়), তাহাদের পক্ষেও অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অপলাপ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর হয় না। তাহাদিগকেও বাধ্য হইয়া অনুমান ও আপ্তবাক্যের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হয় (১)। অতএব প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমান এবং আপ্তবচনেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা দ্বারাও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে হয়; নচেৎ জাগতিক সমস্ত ব্যবহারই অচল হইয়া পড়ে। অতঃপর অনুমানের কথা বলা হইতেছে। অনুমান (অনুমিতি) কি?

"প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্॥" ১।১০০॥

---

(১) যাহারা একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী নাস্তিক, তাহারা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর লোকদিগকে নিশ্চয়ই দেখিতে পান না। তখন তাহারা কি গৃহজনের অভাব নিশ্চয় করিয়া থাকেন? এবং শিষ্যকে যখন কোন দুরূহ বিষয় উপদেশ করিতে থাকেন, তখন তাহারা শিষ্যের মনোভাব বুঝিয়াই উপদেশ করেন; নচেৎ শিষ্য তাহার কথা বুঝিবে কেন? তখন তাহারা কি শিষ্যের মনোবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন? এই সমস্ত কারণে অনুমানাদিরও প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

প্রতিবন্ধ অর্থ—ব্যাপ্তি (ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব)। দৃশ্ অর্থ—জ্ঞান। প্রতিবদ্ধ অর্থ—ব্যাপক—সাধ্য। ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে যে, ব্যাপকের জ্ঞান, তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। এতাদৃশ অনুমান হইতে যে, অপ্রত্যক্ষ সাধ্য বস্তু বিষয়ে পুরুষের বোধ, তাহার নাম—অনুমিতি। ইহাই অনুমান প্রমাণের ফল—অনুমিতি। সাংখ্যমতে অনুমান বা ব্যাপ্তির লক্ষণ এইরূপ—

"নিয়ত-ধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ॥" ৫।২৮॥

আশ্রিত বস্তুমাত্রই ধর্ম্ম-পদবাচ্য, আর যাহাতে আশ্রিত থাকে, তাহার নাম ধর্ম্মী। তন্মধ্যে ধর্ম্মী পদার্থ হয় সাধ্য, আর ধর্ম্ম হয় তাহার সাধন বা হেতু। উক্ত সাধ্য ও সাধন, এতদুভয়ের যে, নিয়ত (অব্যভিচরিত ভাবে) সাহিত্য—একত্র অবস্থিতি, অথবা উক্ত উভয়ের মধ্যে কেবল সাধনেরই যে, সাধ্যের সহিত নিয়ত সহাবস্থিতি, তাহার নাম ব্যাপ্তি (১)। এই ব্যাপ্তি ও

(১) যেখানে দুইটী পদার্থই (সাধ্য ও সাধন) পরস্পরকে ছাড়িয়া পৃথক্ভাবে না থাকে, সেই দুইটী পদার্থকে বলে 'সমনিয়ত-বৃত্তি'। যেমন—গন্ধ ও পৃথিবী, সৌরভ ও চন্দন। ইহাদের একটী থাকিলেই অপরটীও থাকিতে বাধ্য। এই জাতীয় সাধ্য ও সাধন উভয়েরই সাহচর্য্য থাকা স্বাভাবিক। আর যেখানে এরূপ সমনিয়তভাব নাই—একটী ছাড়িয়াও অপরটী থাকিতে পারে। যেমন ধূম ও বহ্নি। ধূমই বহ্নি ছাড়িয়া থাকে না, কিন্তু বহ্নি ধূম ছাড়িয়াও বহুস্থানে থাকে। সেরূপ স্থলে কেবল একটীর—সাধন বস্তুটীর মাত্র সাহিত্য থাকা আবশ্যক হয়। এইরূপ অভিপ্রায়েই সূত্রে 'উভয়োঃ' ও 'একতরস্য বা' বলা হইয়াছে। ন্যায়দর্শনের আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্যাপ্তির কথা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, এখানে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

অনুমান একই অর্থ। ন্যায়াচার্য্যগণ এই অনুমানকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) পূর্ব্ববৎ, (২) শেষবৎ, ও (৩) সামান্যতোদৃষ্ট। সাংখ্যাচার্য্যগণ এরূপ বিভাগ নিজেরা কল্পনা না করিলেও, স্পষ্টাক্ষরে অনুমোদন করিয়াছেন—

"ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্" (সাংখ্যকারিকা—৭)।

মহামতি বাচস্পতিমিশ্র উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অনুমান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এ বিষয়ে যাহাদের কৌতূহল আছে, তাহারা 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' দেখিলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের জন্য সাধ্য ও সাধনের সাহচর্য্য বা সহাবস্থিতি যে, কতবার দেখা আবশ্যক, তাহার নিয়ম নাই। তবে এ কথা সত্য যে,—

"ন সকৃদ্গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥" ৫।২৮।

একবার মাত্র সাহচর্য্য দর্শনেই হেতু-সাধ্যের সাহচর্য্য স্থির হয় না; পরন্তু একাধিকবার দর্শনের আবশ্যক হয়; এবং সেরূপ দর্শনের ফলেই নির্দ্দোষ ব্যাপ্তিরচনা করা সম্ভব হয়। আমরা এখানে আর একটীমাত্র কথা বলিয়াই অনুমানের বিষয় শেষ করিব।

অনুমিতিজ্ঞানে সাধ্য, সাধন ও পক্ষ, এই তিনটী বিষয় জানা থাকা আবশ্যক হয়। যে বিষয়টী প্রমাণ করিতে হয়, তাহা সাধ্য, যাহা দ্বারা প্রমাণ করিতে হয়, তাহা সাধন বা হেতু, আর যে স্থানে বা যাহাতে ঐ সাধ্য পদার্থটী থাকে, তাহার নাম পক্ষ। এই তিনটী বিষয় জানা না থাকিলে অনুমান না

ব্যাপ্তিরচনা করা সম্ভব হয় না। ব্যাপ্তিরচনার নিয়ম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ন্যায়দর্শনের প্রস্তাবে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে; এইজন্য এখানে আর অধিক কথা বলা আবশ্যক মনে করি না।

[শব্দ ও অনুমানের সম্বন্ধ।]

অনুমানের সহিত শব্দ-প্রমাণের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। লোকে অনুমানের সাহায্যেই প্রথমে শব্দার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। শব্দার্থ-বোধসম্পন্ন দুই ব্যক্তির শব্দব্যবহার ও তদনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান দর্শন করিয়া সন্নিহিত বালক—যাহার সেই সকল শব্দের অর্থবোধ জন্মে নাই, এমন লোক, যে শব্দের যাহা অর্থ, তাহা অনুমানের দ্বারা স্থির করিয়া লয় (১)। যতক্ষণ—

"বাচ্য-বাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ॥" ৫।৩৭।

শব্দ ও অর্থের বাচ্য-বাচকভাব (শব্দ হয় বাচক, আর অর্থ হয়

---

(১) একজন বৃদ্ধ একটী যুবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'গাং আনয়' (একটী গরু লইয়া এস)। আদেশপ্রাপ্ত লোকটী তৎক্ষণাৎ একটী প্রাণী লইয়া আসিল। ঐ বৃদ্ধ পুনরায় সেই লোকটীকে বলিল—'গাং বধান, অশ্বম্ আনয়' অর্থাৎ গরুটা বাঁধিয়া রাখ; একটী অশ্ব আনয়ন কর। ইহা দেখিয়া নিকটস্থ তৃতীয় লোকটী অনুমান করিল যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন আদেশ প্রাপ্তিমাত্র কার্য্য করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে ঐ শব্দগুলির অর্থ জানে। এইরূপ শব্দের সংযোজন ও বিয়োজনের দ্বারা কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা সে বুঝিয়া লয়।

বাচ্য, এই সম্বন্ধ জানিতে না পারা যায়, ততক্ষণ কোন শব্দ হইতেই অর্থবোধ করা কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। শব্দার্থের বাচ্য-বাচকভাব গ্রহণে অনুমানের অপেক্ষা আছে বলিয়াই অনুমানের অনন্তর শব্দপ্রমাণের স্থান। শব্দপ্রমাণ কাহাকে বলে?—

[শব্দ প্রমাণ।]

"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ॥" ১।১০॥

যে সমস্ত কারণ বর্ত্তমান থাকিলে শব্দার্থবোধ নিষ্পন্ন হইতে পারে, সেই সমুদয় কারণসহকৃত শব্দ হইতে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহার নাম শব্দপ্রমাণ। পুরুষগত বোধ ইহার ফল—প্রমা (১)।

শব্দ ও অর্থ—উভয়েতেই এক একপ্রকার শক্তি আছে, তন্মধ্যে শব্দে আছে বাচকতা শক্তি, আর অর্থে আছে বাচ্যতা শক্তি। এই দ্বিবিধ শক্তি দ্বারাই শব্দ ও অর্থ পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ

---

(১) ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনং তু।" ৫।

ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—'আপ্তা প্রাপ্তা যুক্তেতি যাবৎ। আপ্তা চাসৌ শ্রুতিশ্চ ইতি—আপ্তশ্রুতিঃ। শ্রুতিঃ—বাক্যজনিতং বাক্যার্থজ্ঞানম্; তচ্চ স্বতঃ প্রমাণম্; অপৌরুষেয়-বেদবাক্য-জনিতত্বেন সকলদোষাশঙ্কাবিনির্মুক্তত্বেন যুক্তং ভবতি। এবং বেদমূলক-স্মৃতীতিহাস-পুরাণবাক্য-জনিতমপি জ্ঞানং যুক্তম্।'

তাৎপর্য্য—আপ্ত অর্থ যুক্ত, অর্থাৎ শাব্দবোধের উপযোগী কারণ-সম্পন্ন। তাদৃশ বাক্য জনিত বাক্যার্থ জ্ঞানের নাম—আপ্তবচন। বেদবাক্য স্বভাবতই নির্দোষ; সুতরাং তাহা নিশ্চয়ই যুক্ত, যুক্ত বলিয়াই স্বতঃ প্রমাণ।

হইয়া থাকে। যেখানে শব্দ ও অর্থের মধ্যে উক্ত শক্তি বা বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ নাই, সেখানে কোনরূপ শব্দার্থবোধই জন্মে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার শব্দ-শক্তি জানে না, শব্দও তাহার নিকট কখনই আপনার অর্থ প্রকাশ করে না; এই জন্য শব্দার্থবুভুৎসু ব্যক্তিকে আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধব্যবহার ও প্রসিদ্ধ শব্দের সান্নিধ্য প্রভৃতি উপায়ে অগ্রে উক্তপ্রকার শব্দার্থ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। যে ব্যক্তি লৌকিক শব্দ অবলম্বনে উক্তপ্রকার বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ অবগত হয়, বৈদিক শব্দার্থ-বোধও তাহারই নিকট সহজ ও সুখসম্পাদ্য হইয়া থাকে; কারণ, শব্দশক্তি জিনিষটা উভয় স্থলেই সমান বা একরূপ, কেবল ব্যবহারে যাহা কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয় মাত্র।

[বেদ।]

বেদ অপৌরুষেয় ও অলৌকিক অর্থের বোধক; উহার শক্তিও স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ, আধুনিক নহে; সুতরাং বৃদ্ধব্যবহারাদি দ্বারা যদিও উহার শক্তি বা বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ নির্ণয় করা অসম্ভব হউক; তথাপি বেদার্থবোধ অসম্ভব হইতে পারে না; কারণ, বৈদিক শব্দমধ্যেও স্বভাবসিদ্ধ যে শক্তি নিহিত আছে, অভিজ্ঞ পণ্ডিত-গণ প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থ বিশ্লেষণপূর্ব্বক সেই স্বাভাবিক শক্তিকেই সাধারণের বোধগম্য মাত্র করিয়া থাকেন; কিন্তু আধুনিক শব্দের ন্যায় বৈদিক শব্দেরও অর্থবিশেষে কোন প্রকার সঙ্কেত সংস্থাপন করেন না; সুতরাং লৌকিক ও বৈদিক—উভয়বিধ শব্দেই অর্থবোধের জন্য বৃদ্ধব্যবহারাদির যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে।

[পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রমেয়-নির্দ্ধারণ করাই প্রমাণ-নিরূপণের উদ্দেশ্য। সাংখ্যশাস্ত্রও সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই তিনপ্রকার প্রমাণের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রমাণত্রয়ের সাহায্যে যত প্রকার প্রমেয় (পদার্থ) অবধারিত হইতে পারে, সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেব সেই সমস্ত প্রমেয় একটীমাত্র সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন—

"সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি, উভয়মিন্দ্রিয়ম্, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥" ১।৬১ ॥

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যে, সাম্যাবস্থা অর্থাৎ সময় বিশেষে যাহাদের সাম্যাবস্থা ঘটিয়া থাকে, এমন যে গুণত্রয়, সেই গুণত্রয়ের নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহৎ তত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার হইতে পাঁচপ্রকার তন্মাত্র (শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র), এবং উভয় প্রকার ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) প্রাদুর্ভূত হয়। উক্ত তন্মাত্র হইতে আবার আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচপ্রকার স্থূল মহাভূত প্রাদুর্ভূত হয়। এতদতিরিক্ত একটী তত্ত্ব আছে, তাহার নাম পুরুষ (জীবাত্মা)। এই পঁচিশটী বস্তু সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রমেয় বা প্রতিপাদ্য এবং 'তত্ত্ব' নামে প্রসিদ্ধ। সাংখ্যমতে পদার্থসংখ্যা এতদপেক্ষা অধিক বা ন্যূন সম্ভবপর হয় না।

[তত্ত্বের শ্রেণীভেদ]

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ উল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন (১)। প্রথম কেবলই প্রকৃতি, দ্বিতীয় কেবলই বিকৃতি, তৃতীয় প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়রূপ, চতুর্থ অনুভয়রূপ—প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয় (কূটস্থ)। তন্মধ্যে কেবলই প্রকৃতি এক—সাম্যাবস্থাবিশিষ্ট গুণত্রয়, কেবলই বিকৃতি বা কার্য্যাত্মক ষোড়শ—পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি-বিকৃতি সপ্তবিধ—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র। প্রকৃতি অর্থ—অপর তত্ত্বের উপাদান কারণ। বিকৃতি অর্থ—পরিণাম বা কার্য্য। তন্মধ্যে ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতি হইতেছে কেবলই প্রকৃতি, কারণ, উহা হইতে মহৎতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, কিন্তু উহার আর কারণান্তর নাই। পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়, অথচ উহারা অপর কোনও তত্ত্বের উপাদান নহে; এইজন্য উক্ত ষোড়শ তত্ত্ব কেবলই বিকৃতিরূপে গণ্য। তাহার পর, মহৎতত্ত্ব মূলপ্রকৃতি হইতে

---

(১) 'তত্ত্ব' শব্দটী পদার্থের মৌলিকতা প্রকাশক। যে সমুদয় পদার্থ বিজাতীয় অন্য পদার্থের উৎপাদক, অথবা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত, সেই সমুদায় পদার্থই এই শাস্ত্রে 'তত্ত্ব' নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে 'তত্ত্ব' অর্থ সত্য—যথার্থ, যাহার অপলাপ করা সম্ভব হয় না। সংকলনের পদ্ধতিভেদে শাস্ত্রে তত্ত্বসংখ্যা অনেকপ্রকার হইয়াছে। কোথাও এক, কোথাও ছয়, কোথাও ষোড়শ, কোথাও বা অন্যপ্রকার লিখিত দেখা যায়। এইজন্য ভাগবতে লিখিত আছে—

"একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ॥"

উৎপন্ন, অথচ অহঙ্কারতত্ত্বের জনক; এইরূপ অহঙ্কারতত্ত্বও মহৎতত্ত্ব হইতে প্রসূত, অথচ পঞ্চতন্মাত্রের জনক; এইরূপ পঞ্চতন্মাত্র যেমন অহঙ্কার হইতে প্রসূত, তেমনি আবার পঞ্চ মহাভূতের প্রসূতি; এইরূপে জন্য-জনকভাবাপন্ন হওয়ায় উক্ত সাতটী তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়াত্মক বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু নিত্য নির্ব্বিকার উদাসীন পুরুষ অপর কোন তত্ত্ব হইতে উৎপন্নও হয় না, কিংবা অপর কোন তত্ত্ব উৎপাদনও করে না; এই জন্য প্রকৃতি-বিকৃতিভাববর্জ্জিত—অনুভয়রূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে (১)।

[সৎকার্য্যবাদ।]

সৎকার্য্যবাদ সাংখ্যশাস্ত্রের একটী বিশেষ সিদ্ধান্ত এবং এই অংশেই সাংখ্যশাস্ত্রের বিশিষ্টতা। এই সৎকার্য্যবাদের অপর

ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্ বিদুষাং কিমশোভনম্॥"

(প্রবচনভাষ্য ৬১ সূত্র)।

উল্লিখিত প্রমাণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, যিনি যেরূপ বস্তুসত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি তদনুসারে তত্ত্বসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা কেহই অযৌক্তিক কথা বলেন নাই; কারণ, তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্, জ্ঞানী ছিলেন; জ্ঞানীর পক্ষে অযৌক্তিক কথা বলা কখনই সম্ভব হয় না। সাংখ্যমতে গুণ গুণী ও ধর্ম্ম ধর্ম্মী অভিন্ন পদার্থ। আশ্রয়ের অতিরিক্ত আশ্রিত গুণাদির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই; সুতরাং এমতে দর্শনান্তর-সম্মত গুণকর্ম্মাদি পদার্থগুলি উক্ত তত্ত্বসমূহেরই অন্তর্গত।

ঈশ্বরকৃষ্ণের উক্তি এইরূপ—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

(সাংখ্যকারিকা ৩)

নাম পরিণামবাদ। সাংখ্য সৎকার্য্যবাদী; সুতরাং সাংখ্যমতে কারণের ন্যায় কার্য্যগুলিও সৎ—নিত্য বা চিরন্তন। যাহা অসৎ অবস্তু—আকাশকুসুমতুল্য, শত প্রযত্নেও কস্মিন্‌কালেও তাহার উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয় না, বা হইতে পারে না। কপিল বলিয়াছেন—

"নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ" ॥৫।৫২॥

অত্যন্ত অসৎ নৃশৃঙ্গ (মনুষ্যের শৃঙ্গ) যেমন অপ্রসিদ্ধ—কখনও উৎপন্ন হয় না, অন্যত্রও তেমনই অসৎ পদার্থের কখনও উৎপত্তি হয় না। অসতের যেমন উৎপত্তি হয় না, তেমনি সতেরও বিনাশ হয় না। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন—"নাসদুৎপদ্যতে, ন চ সদ্বিনশ্যতি।" বৃহৎ বটবৃক্ষ যেরূপ ক্ষুদ্র বটবীজে সূক্ষ্মরূপে বা বীজভাবে লুক্কায়িত থাকে, দুগ্ধের মধ্যে নবনীত যেরূপ সূক্ষ্ম অব্যক্ত ভাবে নিহিত থাকে, ঠিক সেইরূপ জায়মান কার্য্যমাত্রই স্ব স্ব কারণের মধ্যে সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে, অনন্তর যথোপযুক্ত কারণ-সংযোগে ও কারকব্যাপারে সেই সমুদয় অব্যক্ত কার্য্যই স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে সেরূপ পদার্থ কস্মিন্‌কালেও হয় না; হইবে না; এবং অতীতেও তাহার দৃষ্টান্ত মিলে না। ইহাই সৎকার্য্যবাদের বৈশিষ্ট্য। সাংখ্যমতে পরিগণিত তত্ত্বমাত্রই নিত্য। নিত্য পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত; এক পরিণামী নিত্য, অপর কূটস্থ নিত্য। তন্মধ্যে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থসমূহ পরিণামী নিত্য আর পুরুষ কেবল অপরিণামী কূটস্থ নিত্য। পরিণামী নিত্য

পদার্থগুলি নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল (১), আর কূটস্থ-নিত্য পদার্থ নিত্য নির্ব্বিকার ও অপরিবর্ত্তনস্বভাব।

সাংখ্যোক্ত সৎকার্য্যবাদের বিপক্ষে উল্লেখযোগ্য আরও দুইটী প্রসিদ্ধ মতবাদ আছে। একটী অসৎকার্য্যবাদ, অপরটী বিবর্ত্তবাদ। বৌদ্ধ ও নৈয়ায়িক অসৎকার্য্যবাদী, আর শঙ্কর-মতাবলম্বী বৈদান্তিকগণ বিবর্ত্তবাদী। তন্মধ্যে নৈয়ায়িকগণ বলেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে কোন জন্য-পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকে না; পূর্ব্ববর্ত্তী সৎ কারণ হইতে অসৎ—অবিদ্যমান কার্য্য উৎপন্ন হয়। পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের নিত্য পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই বিশ্বের নাম-গন্ধও ছিল না; ছিল কেবল কারণভূত পরমাণুপুঞ্জ। ইদানীং স্থূল ঘটপটাদি জন্য-পদার্থের অবস্থাও এতদনুরূপ। কারণের ন্যায় কার্য্যও সৎপদার্থ হইলে কারণব্যাপারের কোনই সার্থকতা থাকে না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকে অসৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সেই সৎস্বরূপ কারণ হইতে অসৎ কার্য্যের আরম্ভ বা উৎপত্তি স্বীকার করেন বলিয়াই নৈয়ায়িকের মতকে 'আরম্ভবাদ'ও বলা হয়।

অসৎকার্য্যবাদী বৌদ্ধগণ আবার কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কারণের সত্ত্বও উড়াইয়া দেন। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যবস্তুটী যেমন

---

(১) মহামতি বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—"পরিণামস্বভাবা হি গুণা না-পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী—১৬)।

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় পরিণামস্বভাব, ক্ষণকালও পরিণাম ছাড়া থাকে না।

অসৎ—অবিদ্যমান, তৎকারণও তেমনই অসৎ—অবিদ্যমান। কেন না, উপাদান কারণের ধ্বংস না হইলে কখনও কোন কার্য্য আত্মলাভ করিতে পারে না। বীজ বিধ্বস্ত না হইলে কখনও অঙ্কুর জন্মে না; দুগ্ধের বিনাশ না হইলে কখনও দধির উদ্ভব হয় না। তেমনই মৃত্তিকার ধ্বংস না হইলে, তাহা হইতেও ঘটের উৎপত্তি হয় না ইত্যাদি। বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকগণের মতে জন্য-পদার্থমাত্রই অসৎ—অবস্তু; ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। কোনদিনই দৃশ্য কার্য্য জগতের সত্তা ছিল না, হইবেও না। এই অসৎ জগৎ নিত্য সৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র, অর্থাৎ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে অজ্ঞান বশতঃ এই বিশাল জগৎ প্রকাশ পাইতেছে—আমাদের অজ্ঞানবশে রজ্জুতে যেমন সর্প প্রকাশ পাইয়া থাকে, জগতের প্রকাশও ঠিক তেমনই। বিবর্ত্ত ও পরিণামবাদে প্রভেদ এই যে,—

"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥"

পরিণামস্থলে কারণবস্তুটী এমনভাবে কার্য্যাকার পরিগ্রহ করে যে, তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্বই থাকে না; কার্য্যাবস্থাই তাহার অবস্থা হইয়া পড়ে; যেমন দুগ্ধের দধিরূপে পরিণাম। দধিভাব প্রাপ্তির পর দুগ্ধের আর কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু বিবর্ত্তস্থলে তাহা হয় না। বিবর্ত্তকার্য্যটী যাহাকে অবলম্বন করিয়া আত্মলাভ করে, সেই আশ্রয়বস্তুটী অবিকৃত ভাবেই থাকে; তাহার স্বরূপসত্তার অণুমাত্রও অপচয় বা উপচয় ঘটে না; দর্শক স্বীয় অজ্ঞানবশে কেবল তাহাতে অন্য রূপ দর্শন করে মাত্র; যেমন

রজ্জুতে সর্প। সেখানে রজ্জু রজ্জুই থাকে; কেবল অজ্ঞান প্রভাবে দ্রষ্টার নিকট সর্পাকারে প্রকটিত হয়, এবং দ্রষ্টার অজ্ঞান বিদূরিত হইলে পর, সেই রজ্জুই আবার নিজের প্রকৃত-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার অভয়প্রদ হয়। ইহাই পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য।

সাংখ্যাচার্য্যগণ এ সকল বাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা বলেন, যে বস্তু নিজে অসৎ—আকাশ-কুসুমকল্প, তাহারও যদি উৎপত্তি সম্ভাবিত হয়, তবে বন্ধ্যার পুত্র, কচ্ছপের রোম এবং আকাশের কুসুমও সমুৎপাদন করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইত। তাহার পর, বৌদ্ধমতে যে, কারণের অভাব (ধ্বংস) হইতে কার্য্যোৎপত্তি কল্পিত হইয়া থাকে; তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, অবস্তু অভাব হইতে কখনও কোনও ভাব কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, বা হইতে পারে না। অঙ্কুর কখনও বীজের অভাব হইতে জন্মে না; বিধ্বস্ত বীজাবয়ব হইতেই জন্মে। ধ্বংস বা অভাব কার্য্যোৎপাদক হইলে, কার্য্যোৎপাদনের জন্য কাহাকেও আর চিন্তা করিতে হইত না; কারণ, অভাব সর্ব্বত্রই সুলভ। অতএব উক্ত বৌদ্ধমতটা যুক্তিসহ নহে। আর বিবর্ত্তবাদও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, এই জগৎ ব্রহ্ম-বিবর্ত্ত হইলে রজ্জু-সর্পের ন্যায় জগতেরও অসত্যতা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; কিন্তু যাহা পুরুষানুক্রমে বিনা বাধায় সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানেও যাহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় বা অসত্যতা বিষয়ে কোনও বলবৎ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে না, তখন কি করিয়া জগৎকে ব্রহ্মবিবর্ত্ত—অসত্য বলিয়া

উপেক্ষা করা যাইতে পারে? এই কারণেই বিবর্ত্তবাদের উপরও বিশ্বাসস্থাপন করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, পরিণামবাদে যখন এসমস্ত দোষের কোনই সম্ভাবনা নাই, তখন তাহাই নির্দ্দোষ ও সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বুঝিতে হইবে, দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই সূক্ষ্ম বীজরূপে প্রকৃতির গর্ভে নিহিত ছিল, পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ তাহাই বিভিন্নপ্রকার আকারে অভিব্যক্ত বা আবির্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালীন কার্য্য-বস্তুর সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয় বুঝিতে হইবে। কথাপ্রসঙ্গে আমরা অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি; এখন প্রকৃত কথার অবতারণা করা যাউক।

[প্রকৃতি।]

পূর্ব্বে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রথম তত্ত্বটার নাম প্রকৃতি (১)। প্রকৃতির তিনটী অংশ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই অংশত্রয় প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যপদার্থ হইলেও, পুরুষের ভোগসাধন করে বলিয়া, কিংবা রজ্জুর (ত্রিতন্তুর) ন্যায় পরস্পর মিলিতভাবে থাকে বলিয়া, অথবা পুরুষরূপ পশুকে (অজ্ঞ জীবকে) সংসারস্তম্ভে আবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া, জগতে

---

(১) বিজ্ঞানভিক্ষু প্রকৃতিশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিয়াছেন—
"প্রকরোতি—ইতি প্রকৃতিঃ, অথবা প্রকৃষ্টা কৃতিরস্যাঃ ইতি প্রকৃতিঃ।"
প্রকৃতির বাচক আরও অনেক শব্দ আছে। যথা—
"ব্রাহ্মীতি বিদ্যাবিদ্যেতি মায়েতি চ তথা পরে।
প্রকৃতিশ্চ পরা চেতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥" ইত্যাদি।

'গুণ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ উহারা বৈশেষিকাভি-মত গুণপদার্থ নহে (১)। উক্ত গুণত্রয়ের সমষ্টিই প্রকৃতি। গুণাতিরিক্ত প্রকৃতির সদ্ভাবে কোনও প্রমাণ নাই, এবং গুণে ও প্রকৃতিতে কোন প্রভেদও নাই—যাহা গুণ, তাহাই প্রকৃতি; যাহা প্রকৃতি, তাহাই গুণ; গুণ ও প্রকৃতি বস্তুতঃ এক অভিন্ন পদার্থ (২)। সূত্রকার বলিয়াছেন—

সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ ॥৬।৩৯॥

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটী গুণ প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে; পরন্তু প্রকৃতিরই স্বরূপ। যেমন ঘট একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তদাশ্রিত রূপ রসাদি ধর্ম্মগুলি ঘট হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, প্রকৃতি ও সত্ত্বাদি গুণ কিন্তু সেরূপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; অবস্থা-ভেদে গুণত্রয়ই প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র।

---

(১) বৈশেষিকের মতে গুণ বলিলে দ্রব্যসমবেত ও গুণক্রিয়ারহিত পদার্থ বুঝায়; কিন্তু সাংখ্যের গুণপদার্থ সেরূপ নহে। কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অপর কোন দ্রব্যে আশ্রিত নহে, এবং গুণক্রিয়াবর্জ্জিতও নহে। উহারা রূপ-রসাদিগুণসম্পন্ন এবং অন্যত্র অনাশ্রিত স্বতন্ত্র দ্রব্যপদার্থ। উক্ত গুণত্রয়ই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ। গুণত্রয়ের কার্য্যও স্বভাবাদি পরে বিবৃত করা হইবে।

(২) "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ"
"গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।" "প্রকৃতের্গুণাঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে, গুণ ও প্রকৃতির পার্থক্য নির্দেশ, তাহা কেবল অল্পজ্ঞ লোকদিগের বোধ-সৌকর্য্যার্থ অভেদে ভেদ-কল্পনা মাত্র।

প্রকৃতির কথা বলিতে হইলেই, অগ্রে তদীয় গুণত্রয়ের স্বরূপ ও চরিত্রাদি চিন্তা করা আবশ্যক হয়। কারণ, সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে বাদ দিলে প্রকৃতির অস্তিত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং গুণত্রয়ের স্বরূপাদি চিন্তা সাংখ্যসিদ্ধান্তে বিশেষ উপযোগী ও অনুপেক্ষণীয়। গুণত্রয়ের স্বরূপ-পরিচয়প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টমুপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥" সাংখ্যকারিকা ১৩॥

সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশস্বভাব; রজোগুণ উপষ্টম্ভক ও ক্রিয়া-স্বভাব; তমোগুণ গুরুত্বসম্পন্ন ও আবরণশীল। উপমাচ্ছলে বলিতে হয়—সত্ত্বগুণ তেজের মত—প্রকাশক, রজোগুণ বায়ুর মত—ক্রিয়াত্মক, আর তমোগুণ অন্ধকারের তুল্য—আবরক। ইহা হইতেই উহাদের স্বভাব ও কার্য্যকারিতা বুঝিয়া লইতে হইবে।

উক্ত গুণত্রয়ের স্বভাব বড়ই বিচিত্র; উহারা কখনও পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্‌ভাবে থাকে না, এবং পরস্পরের সহায়তা না লইয়া কেহ কোন কার্য্য করিতেও সমর্থ হয় না, অথচ প্রত্যেকেই অপর দুইটী গুণকে প্রতিনিয়ত পরাজিত করিয়া প্রবল হইবার চেষ্টা করে। এইরূপে পরস্পরকে অভিভব করিবার প্রবৃত্তি উহাদের স্বভাবসিদ্ধ; সে স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া উহারা মুহূর্ত্তমাত্রও থাকে না; অথচ পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব এই গুণত্রয়ই আবার পরস্পরের সহযোগিভাবে প্রত্যেকের কার্য্যে

সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। এইপ্রকার বিচিত্র স্বভাব লইয়াই গুণময়ী প্রকৃতি বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা করিয়া থাকেন।

উক্ত গুণত্রয়ের আর একটী স্বভাব—পরিণাম। সে পরিণাম ক্ষণকালের জন্যও বিরত থাকে না (১)। সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে, তমঃ তমোরূপে প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিণত হইতেছে। এই জাতীয় পরিণামকে সাংখ্যশাস্ত্রে 'সরূপ পরিণাম' বলে। যতক্ষণ একটী গুণ প্রবল হইয়া অপর দুইটী গুণকে আপনার অধীন করিয়া লইতে না পারে—ত্রিগুণই সমান শক্তিতে ক্রিয়া করিতে থাকে, ততক্ষণ এইরূপ 'সরূপ' পরিণামই চলিতে থাকে।

---

(১) গুণত্রয়ের স্বভাব প্রদর্শনপ্রসঙ্গে পাতঞ্জলভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"চলং গুণবৃত্তম্" অর্থাৎ ক্রিয়াই গুণের স্বভাব, এবং "পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ১৬) অর্থাৎ পরিণামস্বভাব গুণত্রয় ক্ষণকালও পরিণামশূন্যভাবে থাকে না। আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও "প্রকৃতি-সরূপং বিরূপং চ" বলিয়া সরূপ-বিরূপভেদে দ্বিবিধ পবিণাম স্বীকার করিয়াছেন। ব্যবহার-জগতেও উক্ত উভয়বিধ পরিণামের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যথা, গাভীর স্তন হইতে দুগ্ধ বহির্গত করা হইল; কিছু সময় পর্য্যন্ত দুগ্ধ ঠিক রহিল; তাহার পরে সেই দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হইল। এখানে বুঝিতে হইবে যে, দুগ্ধ বহির্গত হইয়াই প্রতিক্ষণে পরিণামান্তর প্রাপ্ত হইতেছিল—দধিভাবের জন্য অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু যতক্ষণ দধিরূপে পরিণত হয় নাই—সরূপ পরিণামে ছিল, ততক্ষণ আমরা সেই দুগ্ধই রহিয়াছে 'মনে করিয়া থাকি; যেই বিরূপ পরিণাম উপস্থিত হয়, তখনই আমরা উহাকে অন্য জিনিষ—দধি বলিয়া ব্যবহার করি।

যেই মুহূর্ত্তে একটী গুণের দ্বারা অপর গুণদ্বয় পরাভূত হইয়া পড়ে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বিশেষ বিশেষ কার্য্য সৃষ্টি আরব্ধ হইতে থাকে। এই জাতীয় পরিণামকে 'বিরূপ পরিণাম' বলে। গুণত্রয়ের সরূপ পরিণামে হয় প্রলয়, আর বিরূপ পরিণামে হয় সৃষ্টি। ভোক্তা জীবগণের পূর্ব্বতন কর্ম্মজনিত অদৃষ্টই (পুণ্য-পাপই) গুণত্রয়ের উক্ত প্রকার দ্বিবিধ পরিণামকে যথানিয়মে পরিচালিত করিয়া থাকে (১)। প্রত্যেক গুণই অসংখ্য—অনন্ত, এবং প্রত্যেক স্থানেই প্রত্যেক গুণ বিদ্যমান আছে; কোথাও উহাদের অত্যন্ত অভাব নাই। গুণের মধ্যে অণু বিভু দ্বিবিধ পরিমাণই আছে।

প্রলয় সময়ে গুণত্রয়ই সাম্যাবস্থায় বা অবিকারাবস্থায় থাকে; এইজন্য সাম্যাবস্থাযুক্ত গুণত্রয়কে প্রকৃতি বলা হয়। গুণাতিরিক্ত যে, প্রকৃতি বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রকৃতি সর্ব্ব জগতের উপাদান হইলেও সাম্যাবস্থায় বা প্রলয়-

(১) প্রলয় সময়েও গুণত্রয়ের পরিণাম স্থগিত থাকে না; তখনও গুণত্রয় নিজনিজরূপে পরিণত হইতে থাকে; জীবগণের ভোগকাল নিকটবর্ত্তী হইলে জীবের অদৃষ্টের প্রেরণায় গুণত্রয়ের মধ্যে এমনই একপ্রকার বিক্ষোভ উপস্থিত হয়; যাহার ফলে উক্ত গুণত্রয় বিভিন্নাকারে পরিণত হইয়া বিশাল জগদুৎপাদনে সমর্থ হয়। প্রলয় সময়েও যদি গুণের ক্রিয়া (পরিণাম) না থাকে, তবে প্রলয়ের কালসংখ্যা নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কেন না, কালের পরিমাণ ক্রিয়াদ্বারাই সম্পাদিত হয়; সুতরাং কালের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্যই প্রলয়কালেও গুণগণের পরিণাম বা ক্রিয়া স্বীকার করা আবশ্যক হয়।

কালে তাহাতে কোন প্রকার শব্দস্পর্শাদি গুণসম্বন্ধ থাকে না। পুরাণশাস্ত্রও একথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্রূপাদিভিরসংযুতম্।
ত্রিগুণং তদ্ জগদ্যোনিরনাদি-প্রভবাপ্যয়ম্॥"

(১।১২৮ সূত্রের ভাষ্যধৃত বিষ্ণুপুরাণ)

ত্রিগুণাত্মিকা জগদ্যোনি প্রকৃতি যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি গুণ বর্জ্জিত, এবং আদি অন্ত ও জন্ম রহিত, এ কথাই উল্লিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

[প্রকৃতির অপরিচ্ছিন্নত্ব।]

উক্ত প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন, কি অপরিচ্ছিন্ন, এ কথার সমাধান প্রসঙ্গে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্॥" ১।৭৬॥

"তদুৎপত্তিশ্রুতেশ্চ॥" ১।৭৭॥

অর্থাৎ সর্ব্বজগতের উপাদানভূত মূল প্রকৃতি কখনই পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ কার্য্য যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেরূপ উপাদান কারণ পরিচ্ছিন্নও হইতে পারে, কিন্তু অসীম জগতের উপাদান বা মূল কারণ প্রকৃতি কখনই সসীম হইতে পারে না; কাজেই জগৎকারণ প্রকৃতিকে পরিচ্ছিন্ন বলিতে পারা যায় না (১)। এ কথার সমর্থন-কল্পে সূত্রকার পুনশ্চ ষষ্ঠাধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাদ্ বিভুত্বম্॥" ৬।৩৬॥

---

(১) একথার অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতি অর্থই গুণত্রয়। জগতে কোথাও সেই গুণত্রয়ের—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অভাব নাই; অনন্ত

দেশ কালনির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র প্রকৃতির কার্য্যদর্শনে বুঝা যায় যে, প্রকৃতি ব্যাপক পদার্থ—পরিচ্ছিন্ন নহে। বিশেষতঃ প্রকৃতিকে পরিচ্ছিন্ন বলিলে, তাহার উৎপত্তিও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; কারণ, জগতে কোথাও কোন পরিচ্ছিন্ন পদার্থ উৎপত্তিবিহীন (নিত্য), দৃষ্টিগোচর হয় না; কাজেই সে পক্ষে উহার নিত্যতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর হয় না। তাহার পর, "যদল্পং তৎ মর্ত্ত্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যত স্পষ্টাক্ষরেই পরিচ্ছিন্ন পদার্থের বিনাশবার্ত্তা কীর্ত্তন করিতেছে। প্রকৃতির উৎপত্তি-বিনাশ স্বীকার করিলে কেবল যে, নিত্যতারই হানি হয়, তাহা নহে; পরন্তু উহার

সত্ত্ব, অনন্ত রজঃ ও অনন্ত তমোগুণে জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে। এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

"পরিচ্ছিন্নত্বমত্র—দৈশিকাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বম্, তদভাবশ্চ ব্যাপকত্বম্ (অপরিচ্ছিন্নত্বম্)। তথাচ জগৎকারণত্বস্য দৈশিকাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বমেব—ইতি প্রকৃতের্ব্যাপকত্বমিতি।"

অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন কথার অর্থ না জানিলে অপরিচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ বুঝা যায় না; এইজন্য প্রথমে পরিচ্ছিন্ন কথার অর্থ বলিতেছেন। এখানে পরিচ্ছিন্নত্ব অর্থ—যে বস্তুর কোন স্থানেও অভাব থাকে—যাহা কোথাও অভাবের প্রতিযোগী হয়, তাদৃশ অভাব-প্রতিযোগিতাবিশিষ্ট বস্তুর ধর্ম্ম হইল—পরিচ্ছিন্নত্ব; তদ্বিপরীতত্বই অপরিচ্ছিন্নত্ব। গুণত্রয়ের কোথাও অভাব নাই; এইজন্য গুণত্রয়কে অপরিচ্ছিন্ন বা ব্যাপক বলা হয়। যেমন—সমস্ত দেহেই প্রাণ আছে, কোন দেহেই তাহার অভাব নাই; এইজন্য প্রাণকে প্রাণিদেহের ব্যাপক বলা হয়, ইহাও ঠিক তেমনই।

মূলপ্রকৃতিত্বও ব্যাহত হয়; এবং উহারও উৎপত্তির জন্য অপর প্রকৃতি কল্পনার আবশ্যক হয়, আবার তাহার উৎপত্তির জন্যও অপর প্রকৃতি কল্পনা করিতে হয়, এইরূপে কারণ ধারা কল্পনা করিলে নিশ্চয়ই অপ্রতিবিধেয় 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া পড়িবে, যাহা বারণ করিবার জন্য প্রতিবাদীকে বাধ্য হইয়া একস্থানে যাইয়া কালপ্রবাহে কারণ-কল্পনার শেষ করিতেই হইবে;— নিশ্চয়ই কোন একটী বস্তুকে উৎপত্তি-বিনাশবিহীন নিত্য মূল-কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে,—

"পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্ ॥" ১৬৮ ॥

অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পিত প্রকৃতির জন্যও অপর প্রকৃতি (কারণ) কল্পনা করিলে যে, দুর্ব্বার 'অনবস্থা' দোষ সম্ভাবিত হয়, যাহার ফলে কোন কালেই মূলকারণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না; সেই দোষ পরিহারের জন্য যদি নিশ্চয়ই একটী মূলকারণ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কেবল নামভেদ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইল না; অর্থাৎ আমরা যাহাকে 'প্রকৃতি' নামে নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহাকেই তোমরা অপর একটী নূতন নামে অভিহিত করিবে মাত্র; সুতরাং ইহাতে কল্পনার গৌরব ছাড়া আর কিছুমাত্র লাঘব দৃষ্ট হয় না; অতএব—

"মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্ ॥" ১।৬৭ ॥

সূত্রকার বলিয়াছেন, মূলকারণের যখন আর কারণান্তর কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না; তখন মূলকারণটী নিশ্চয়ই অমূলক, অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যের মূলকারণ প্রকৃতির আর কারণান্তর নাই। ফলকথা,

যাহাকেই মূলকারণ বলিয়া কল্পনা করিবে, তাহাই আমাদের অভিমত প্রকৃতি। প্রকৃতির পরিচয় প্রদানপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্,
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমাণাং স্বরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে ;
জহাত্যেকাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"

এই একই শ্লোকে প্রকৃতির স্বরূপ, সংখ্যা ও কার্য্য প্রভৃতি অতি সংক্ষেপে ও সুস্পষ্ট কথায় বর্ণিত হইয়াছে। 'অজা' ও 'একা' বলায় নিত্যতা ও সংখ্যা জানা গেল ; 'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং' কথায় যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ বলা হইল ; দ্বিতীয় চরণে প্রকৃতিসৃষ্ট জগতের ত্রিগুণময়ভাব সূচিত হইয়াছে ; আর তৃতীয় চরণে বদ্ধ জীবের ও চতুর্থ চরণে ভোগবিমুখ মুক্ত জীবের কথা উপন্যস্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ সাংখ্যশাস্ত্রে যে কয়টী বিষয় প্রধান বা মুখ্য, এই শ্লোকে সেই কয়টী বিষয়ই অতি সংক্ষেপে উপন্যস্ত হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ আরও বিশদভাবে একটী শ্লোকে প্রকৃতি ও পুরুষের উত্তম ছবি চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার শ্লোকটী এই :—

"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং, তদ্বিপরীতস্তথাচ পুমান্॥" সাংখ্যকারিকা ১১॥

এখানে ব্যক্ত (প্রকৃতিজাত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি), অব্যক্ত (প্রধান বা প্রকৃতি) ও পুরুষ, এই ত্রিবিধ পদার্থেরই স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রকৃতি ও তৎকার্য্য সমস্তই ত্রিগুণাত্মক, এবং উহারা কখনও ত্রিগুণবিযুক্ত হইয়া থাকে না; এইজন্য অবিবেকী; অধিকন্তু সাধারণভাবে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় বলিয়া 'সামান্য' ও 'বিষয়' পদবাচ্য। তাহার পর, আপনাদের অনুরূপ কার্য্যপ্রপঞ্চ প্রতিনিয়ত প্রসব করে বলিয়া ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই প্রসবধর্ম্মী—কার্য্যোৎপাদন উহাদের স্বভাব। সাংখ্যোক্ত পুরুষ কিন্তু ইহার বিপরীত,—ত্রিগুণত্ব বা অবিবেকাদি ধর্ম্মগুলি কখনও পুরুষে আশ্রয়লাভ করে না। কেন যে, আশ্রয় করিতে পারে না, তাহা পরে বলা হইবে।

[পুরুষ।]

উপরে যে, মূল প্রকৃতির কথা আলোচিত হইল, তাহা হইতেই তদতিরিক্ত ও তদ্বিপরীতস্বভাব পুরুষের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। ত্রিগুণময়ী অচেতন প্রকৃতিই আপনার উপভোক্তা পুরুষের অস্তিত্ব ও অনুসন্ধান-পথ জানাইয়া দেয়। কেন না, দৃশ্যমান বস্তুনিচয় নিরীক্ষণ করিলে সহজেই জানিতে পারা যায় যে, জাগতিক যে সমুদয় পদার্থ নিজে অচেতন জড়স্বভাব, এবং সংহত অর্থাৎ সাবয়ব বা সম্মিলিতভাবে কার্য্যকরে, সে সমুদয় পদার্থের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি উভয়ই পরার্থ,—অপরের উপকার সাধনই উহাদের জন্ম ও স্থিতির একমাত্র উদ্দেশ্য। জড় পদার্থের স্বতন্ত্রভাবে স্বগত কোনও ভোগ সম্ভবপর হয় না, বা হইতে পারে না; কাজেই পরার্থ-পরতাই উহাদের একমাত্র স্বভাব বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

উল্লিখিত প্রকৃতিও অচেতন জড়পদার্থ; এবং পরস্পরাপেক্ষিতভাবে কার্য্যকারী, গুণত্রয়ের সমষ্টি বলিয়া সংহত; সুতরাং তাদৃশ প্রকৃতিও পরার্থ—পরকীয় ভোগসাধনই যে, উহার মুখ্য বা একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় (১)। পক্ষান্তরে, প্রকৃতি যাহার ভোগ সম্পাদন করে, সে পদার্থটী কিন্তু ইহার বিপরীত। তাহাও যদি ত্রিগুণময় সংহত হইত, তবে তাহাকেও নিশ্চয়ই প্রকৃতির ন্যায় পরার্থপর হইতে হইত; সুতরাং অপরিহার্য্য অনবস্থা দোষ সে পক্ষে উপস্থিত হইত; সেই কারণে প্রথম কথিত 'পর' পদার্থ পুরুষকে ত্রিগুণরহিত অসংহত স্বীকার করিতে হয়। তাহার পর, অচেতন প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বস্তুমাত্রই ভোগ্যশ্রেণীর অন্তর্গত; ভোগ্যমাত্রই ভোক্তাকে অপেক্ষা করে; ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্যের অবস্থিতি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কারণ, ভোগ্য বস্তু নিজেই নিজের ভোক্তা হইতে পারে না (২)। অধিকন্তু চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত কোন অচেতনই কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না; অচেতন শকট কখনও অশ্বপ্রভৃতি চেতন

---

(১) এস্থলে সূত্রকার বলিয়াছেন—"সংহত-পরার্থত্বাৎ॥", ১।১৪০॥ অর্থাৎ যেহেতু শয্যা, আসন প্রভৃতি সংহত বস্তুমাত্রই অপর লোকের উপকারার্থ রচিত হয়, সেই হেতু সংহতা প্রকৃতিও পরার্থ। প্রকৃতির ভোগ্য সেই পর বস্তুটীর নাম পুরুষ।

(২) "ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ॥" (১।১৪১) এই সূত্র দ্বারা ত্রিগুণরহিত পুরুষকে প্রকৃতিবিপরীত—অসংহত বলা হইয়াছে। পুরুষ ত্রিগুণাত্মক হইলে তাহাকেও পরার্থ হইতে হইত।

লইয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না; অতএব অচেতন প্রকৃতির পরিচালনার্থও একটী চেতন অধিষ্ঠাতার প্রয়োজন হয়। অধিকন্তু, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কৈবল্য (মুক্তি) লাভের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। দুঃখ-নিবৃত্তিই কৈবল্যের প্রকৃত স্বরূপ; কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বুদ্ধিপ্রভৃতি বস্তুমাত্রই দুঃখের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ যে, উহাদের স্বরূপোচ্ছেদ ব্যতীত দুঃখনিবৃত্তির সম্ভবই হয় না; কারণ, বস্তু কখনই স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বাচিয়া থাকিতে পারে না; যেমন ঔষ্ণ্য-প্রকাশশূন্য অগ্নি। অতি বড় মূর্খলোকও আপনার উচ্ছেদ কামনা করে না; অতএব বিদ্বজ্জনগণের ঐরূপ কৈবল্যলাভের চেষ্টা হইতে অনুমিত হয় যে, সুখ-দুঃখবিনির্ম্মুক্ত এমন কেহ আছে; যাহার পক্ষে ঐরূপ কৈবল্য কামনা করা সম্ভব হয় (১)। অতএব, যেহেতু সংহত পদার্থমাত্রই পরার্থ; যেহেতু সেই 'পর' পদার্থটী ত্রিগুণরহিত অসংহত না হইলে উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না; যেহেতু চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কার্য্যই সম্ভবপর হয় না; যেহেতু ভোক্তার অভাবে

---

(১) "অধিষ্ঠানাৎ॥" ১।১৪২ সূত্র॥

এই সূত্রে অচেতনের অতিরিক্ত চেতন পদার্থের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইয়াছে। গাড়ী প্রভৃতি অচেতন পদার্থকে পরিচালিত করিবার জন্য যেমন চেতন অশ্ব প্রভৃতির আবশ্যক হয়, তেমনি অচেতন প্রকৃতির পরিচালনের জন্যও চেতন পুরুষের আবশ্যক হয়। এক অচেতন কখনই অপর অচেতনের প্রেরক হয় না বা হইতে পারে না।

ভোগ্যের অবস্থিতিই সার্থক হইতে পারে না; এবং যেহেতু বিদ্বান্ লোকেও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ কৈবল্য লাভের জন্য কঠোরতর সাধনা-ক্লেশ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন; সেইহেতু স্বীকার করিতে হইবে যে,—

[পুরুষ]

"শরীরাদি-ব্যতিরিক্তঃ পুমান্ [অস্তি]॥" ১।১৩৯ ॥

স্থূল শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতিপর্য্যন্ত পরিগণিত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত অচেতন-বিলক্ষণ—পুরুষ নামে একটী স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ আছে। বলা বাহুল্য যে, সেই পুরুষকেই প্রকৃতির সেব্য, ভোক্তা, অধিষ্ঠাতা, ত্রিগুণরহিত ও মোক্ষভাগী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (১)।

প্রকৃতির পরিণামভূতা বুদ্ধি নিজে জড় পদার্থ; অগ্রে সে নিজে পুরুষের প্রতিবিম্বে (ছায়ায়) প্রকাশমান হয়, পরে অপর

---

(১) সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ পুরুষের অস্তিত্বসাধনোপযোগী সমস্ত হেতু একটীমাত্র শ্লোকে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্লোকটী এই—

"সংহত-পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥"

(সাংখ্যকারিকা ১৭॥)

তাৎপর্য্য—যেহেতু সংহত বা সম্মিলিতভাবে কার্য্যকারী পদার্থমাত্রই পরার্থ; যেহেতু সেই 'পর' পদার্থটী ত্রিগুণাদি-রহিত না হইলে দোষ হয়; যেহেতু চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন প্রকৃতির ক্রিয়া অসম্ভব হয়; যেহেতু ভোগ্য থাকিলেই তাহার ভোক্তা থাকা আবশ্যক হয়; এবং যেহেতু কৈবল্যলাভের জন্য লোকের চেষ্টা দৃষ্ট হয়, সেইহেতু প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির অতিরিক্ত চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

সকল বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু বুদ্ধি যতক্ষণ পুরুষের ছায়াপ্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে বাহ্য বা আন্তর কোন বিষয়ই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; এইজন্যই বুদ্ধি স্ববিষয় প্রকাশের জন্য পুরুষের সহায়তা অপেক্ষা করে, কিন্তু পুরুষকে কখনও প্রকাশের জন্য অপরকে অপেক্ষা করিতে হয় না, বা করিবার আবশ্যকও হয় না। তাহার কারণ—

"জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ॥" ১।১৪৫॥

পুরুষ স্বয়ং প্রকাশময় চিৎপদার্থ। বুদ্ধির ন্যায় পুরুষও জড় পদার্থ হইলে, অবশ্য তাহা দ্বারা কখনই পরকে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। তাহার পর, পুরুষের ঐ যে, চৈতন্য বা জ্ঞানশক্তি, তাহা আগন্তুক গুণবিশেষ নহে; অর্থাৎ ন্যায়মতে যেরূপ অচেতন আত্মাতে মনঃসংযোগ বশতঃ অভিনব জ্ঞান-গুণের আবির্ভাব স্বীকৃত হয়, সাংখ্যমতে পুরুষের জ্ঞানশক্তি সেরূপ আগন্তুক গুণবিশেষ নহে;—কারণ, শ্রুতিতে পুরুষের নির্গুণত্ব কথিত আছে; অতএব—

"নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্মা॥" ১।১৪৬॥

চৈতন্য বা জ্ঞানশক্তিকে পুরুষের ধর্ম্ম বা গুণ বলিতে পারা যায় না; পরন্তু চৈতন্যই তাহার স্বরূপ (ক)। কেহ কেহ যে,

(ক) আত্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ, তদ্বিষয়ে পুরাণাচার্য্যগণের উক্তি আরও স্পষ্টতর—

"জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্ম্মো ন গুণো বা কথংচন।
জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদা শিবঃ॥"

(সাংখ্যভাষ্য ১।১৪৬॥)

আত্মাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের সে কথাও সত্য বা সমীচীন নহে; কেন না,—

"নৈকস্থানন্দ-চিদ্রূপত্বে, দ্বয়োর্ভেদাৎ॥" ৫।৬৬॥

আনন্দ ও চৈতন্য একই বস্তুর স্বরূপভূত হইতে পারে না; কারণ, অনুভবে ঐ দুইটী পদার্থের অত্যন্ত বিভিন্নতা প্রমাণিত হয়। তবে যে, "সত্যং জ্ঞানমানন্দম্" শ্রুতিতে পুরুষকে আনন্দ-রূপ বলা হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক আনন্দ নহে; পরন্তু—

"দুঃখনিবৃত্তের্গৌণঃ॥ ৫।৬৭॥

আত্মা স্বভাবতই নির্গুণ; তাহার দুঃখ-সম্বন্ধ কস্মিন্ কালে ছিলও না, হইবেও না, এবং বর্ত্তমানেও নাই। নাই বলিয়াই, তাহাকে আনন্দরূপ বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ ঐ কথা 'দুঃখাভাবঃ সুখম্' এই প্রসিদ্ধ প্রবচনেরই অনুবাদ—গৌণার্থবোধক মাত্র (খ)।

উপরে, যে পুরুষের বিষয় আলোচিত হইল, সেই পুরুষই আত্মা। আত্মা চেতন, অসঙ্গ, উদাসীন ও সর্ব্বব্যাপী এবং

(খ) 'দুঃখের নিবৃত্তিতেও যে, সুখবুদ্ধি হয়, লোকব্যবহারই তাহার প্রমাণ। অত্যধিক ভারবাহী ব্যক্তি, সেই ভার ত্যাগ করিয়া সুখ বোধ করে; উৎকট রোগযন্ত্রণাক্লিষ্ট লোক রোগনিবৃত্তিতে আনন্দ পায়, অথচ উক্ত ভারবাহী বা রোগী ভারত্যাগ ও রোগমুক্তি ছাড়া এমন কোনও ভোগ্য বিষয় পায় না, যাহাতে তাহাদের সুখ বোধ হইতে পারে। অথচ তাহারা যে, সুখবোধ করে, সে বিষয়ে কাহারো মতভেদ নাই। আত্মার সম্বন্ধে শ্রুতিকথিত আনন্দও ঠিক সেই প্রকার বুঝিতে হইবে।

অনেক—প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন (*)। আত্মা নিষ্ক্রিয় হইয়াও বুদ্ধির ক্রিয়ায় যেন সক্রিয় হয়, এবং সুখ-দুঃখাদিবিহীন হইয়াও বুদ্ধিগত সুখ-দুঃখাদি দ্বারা যেন সুখ-দুঃখাদিসম্পন্ন বলিয়াই ভ্রান্তি হয়। বুদ্ধির সহিত পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য-বোধের অভাবই এই জাতীয় সমস্ত ভ্রান্তির নিদান। এ সকল কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(*) বৈদান্তিকগণ বলেন—সর্ব্বদেহে আত্মা এক ; দেহভেদেও আত্মার ভেদ হয় না। এ কথার বিপক্ষে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্॥" ১৪৯॥

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও আত্মার (পুরুষের) অনেকত্ব সংস্থাপনের অনুকূলে অনেকগুলি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন—

"জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াচ্চৈব॥"

(সাংখ্যকারিকা ১৮॥)

তাৎপর্য্য এই যে, জন্ম অর্থ উৎপত্তি—নূতন দেহপ্রাপ্তি ; মরণ অর্থ—দেহবিনাশ ; করণ অর্থ—ইন্দ্রিয়বর্গ। এ সমস্তই প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে। একের জন্মে, মরণে বা ইন্দ্রিয়বৈকল্যে যখন অপরের জন্ম, মরণ বা ইন্দ্রিয়-বিঘাত ঘটে না, তখন বুঝা যায় যে, আত্মা বহু—প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন। পক্ষান্তরে, সকলের দেহে যদি একই আত্মা থাকিত, তাহা হইলে একের জন্ম, মরণ বা ইন্দ্রিয়-বৈকল্য ঘটিলে, সকলেই সমানভাবে জন্মমরণাদি অবস্থা অনুভব করিত ; তাহা যখন করে না, তখন বুঝিতে হইবে, আত্মা এক নহে—অনেক। সাত্ত্বিকাদি গুণের প্রভেদও পুরুষ-ভেদের দ্যোতক ; সর্ব্বদেহে একই পুরুষ থাকিলে, কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ বা তামসিক, এই প্রভেদ ঘটিতে পারিত না ; অতএব পুরুষ এক নহে—অনেক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি নিজে ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞানশক্তিবিহীন; পুরুষ আবার জ্ঞানশক্তিযুক্ত হইয়াও ক্রিয়া-শক্তিবিহীন; কাজেই প্রকৃতি বা পুরুষ, কেহই একাকী সৃষ্টি-সাধনে সমর্থ হয় না; এইজন্য সাংখ্যাচার্য্যগণ একটী সুন্দর উপমার উদ্ভাবন করিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারাই সৃষ্টিব্যাপার উপ-পাদন ও সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—

"পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।"

অর্থাৎ একজন ক্রিয়াশক্তিবিহীন পঙ্গু, অপর একজন দৃষ্টিশক্তিবিহীন অন্ধ, ইহারা যেমন একাকী গমনাদি ক্রিয়া করিতে পারে না; কিন্তু উভয়ে মিলিত হইয়া পারে, অর্থাৎ পঙ্গু ব্যক্তি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক পথনির্দ্দেশ করিয়া দিলে পর, গমনশক্তি-সম্পন্ন অন্ধ যেরূপ তদনুসারে পথ চলিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে; সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিও চেতন পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে বিচিত্র জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সেইজন্য বলেন, পঙ্গুর সহিত অন্ধের ন্যায় অগ্রে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ ঘটে, পরে সেই সংযোগের (১) ফলে ত্রিগুণা প্রকৃতির অঙ্গে বিক্ষোভ বা স্পন্দন উপস্থিত হয়। ত্রিগুণের মধ্যে রজোগুণই ক্রিয়াশীল বা চলনস্বভাব; সুতরাং প্রথমে তাহাতেই বিক্ষোভ

(১) জীবের অদৃষ্টই প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ ঘটাইয়া থাকে। সৃষ্টি ও অদৃষ্টপ্রবাহ অনাদি; সুতরাং কোন কালেই অদৃষ্টের অভাব ছিল না।

উপস্থিত হয়; পরে সেই বিক্ষোভের প্রভাবে অপর গুণদ্বয়েও যথাসম্ভব স্পন্দন দেখা দেয়। তাহার ফলে গুণত্রয়ের মধ্যে একটা বিষম বিমর্দ্দন উপস্থিত হয়,—একে অপরকে পরাভূত করিতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে থাকে। এই বিমর্দ্দন হইতেই বিশ্বসৃষ্টির সূত্রপাত আরম্ভ হয়। সেই বিষম বিমর্দ্দনের ফলে ত্রিগুণা প্রকৃতি হইতে সর্ব্বপ্রথমে যে তত্ত্বটী প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার নাম বুদ্ধি।

[মহৎ তত্ত্ব]

লিঙ্গপুরাণে উক্ত আছে—

"গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্ব্বভূব হ।
মনো মহাংশ্চ বিজ্ঞেয় একং তদ্বৃত্তিভেদতঃ॥" (ভাষ্য ১।৬৪।)

এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের মধ্যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইবার পর, প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহত্তত্ত্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে। মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধি, চিত্ত ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি। মহত্তত্ত্বই এই বিশাল বিশ্বতরুর সূক্ষ্ম অঙ্কুরাবস্থা। এখান হইতেই সূক্ষ্ম-স্থূলক্রমে জাগতিক সমস্ত বস্তু পর পর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। স্বয়ং সূত্রকারও—

"মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ॥" ১।৭১॥

এই সূত্রে মহত্তত্ত্বকেই প্রকৃতির আদ্য কার্য্য বা প্রথম পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। বুদ্ধির কার্য্য বা ব্যাপারকে অধ্যবসায় (অবধারণ করা) বলে। এই অধ্যবসায়ই বুদ্ধিতত্ত্বের পরিচায়ক বা বিশেষ লক্ষণ,—

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ॥" ২।১৩॥

অধ্যবসায় অর্থ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। সেই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিই বুদ্ধিতত্ত্বের অসাধারণ ধর্ম্ম; এই অসাধারণ্য জ্ঞাপনের জন্যই সূত্রে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"অধ্যবসায়ঃ বুদ্ধিঃ"। আমরা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় বা অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে সচরাচর যে সমুদয় বিষয় অনুভব করিয়া থাকি; বুদ্ধিই সেই সমুদয় বিষয় সম্বন্ধে একটা নিশ্চয়াত্মক—'ইহা এই প্রকারই' ইত্যাকার জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে (১)।

উক্ত মহত্তত্ত্ব হইতেই অহঙ্কার প্রভৃতি অবশিষ্ট সমস্ত জড়তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ॥" ১।৭৪॥

অর্থাৎ উক্ত মহত্তত্ত্বই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কার্য্যসমুৎপাদনের নিদাম হইলেও, বস্তুতঃ মূলকারণ প্রকৃতিই পরম্পরাক্রমে সে সমুদয় কার্য্যোৎপাদনের উপাদান কারণ। ন্যায়দর্শনের মতে যেমন পরমাণুজাত দ্ব্যণুক-ত্রসরেণুক্রমে জগতের সৃষ্টি হইলেও, দ্ব্যণুকাদি দ্বারা পরমাণুরই কারণতা স্বীকৃত হয়, এখানেও ঠিক তেমনই মহত্তত্ত্বাকারে পরিণত প্রকৃতিকেই নিখিল জগৎ-সৃষ্টির মূলকারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং

---

(১) অতঃপর মনের কথাপ্রসঙ্গে সমস্ত অন্তঃকরণের কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করা হইবে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মহত্তত্ত্ব তিন প্রকার—

"সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্॥"

(সাংখ্যভাষ্য ২।১৮)

প্রকৃতিই প্রথমে মহত্তত্ত্বের আকার গ্রহণ করিয়া, সেই আকারেই অপরাপর কার্য্যবর্গ সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ পরিকল্পনার ফলে 'প্রকৃতিঃ সর্ব্বকারণম্' ইত্যাদি ঋষিবচনেরও সম্পূর্ণরূপে মর্য্যাদা রক্ষিত হয় (১)।

বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতির সত্ত্বাংশ হইতে সমুৎপন্ন ; এই কারণে,—

"তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদি" ॥ ২।১৪ ॥

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, এই সমুদয় কার্য্য-সমুৎপাদন করাই উহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ; কিন্তু—

"মহদুপরাগাদ্ বিপরীতম্ ॥" ২।১৫ ॥

সেই মহত্তত্ত্বই আবার যখন রজঃ বা তমোগুণে উপরঞ্জিত হয়, অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে পরিচালিত হয়, তখন তাহার আর সে ভাব থাকে না ; তখন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম, জ্ঞানের বিনিময়ে অজ্ঞান, বৈরাগ্যের স্থানে অবৈরাগ্য বা বিষয়ানুরাগ এবং ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে অনৈশ্বর্য্য আসিয়া বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়া রাখে। তাহার ফলে, বুদ্ধি তখন অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য বিষয়ে অনুরাগ পোষণ করিতে থাকে।

---

(১) এই সিদ্ধান্ত-সমর্থনের জন্য সূত্রকার ষষ্ঠাধ্যায়ে পুনরায় বলিয়াছেন—

"পারম্পর্য্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ ॥" ৬।৩৫ ॥

মহত্তত্ত্ব সাধারণতঃ প্রকৃতির সাত্ত্বিকাংশ হইতে সমুৎপন্ন হয় ; এইজন্য মহত্তত্ত্বসমষ্টিদ্বারা উপহিত পুরুষকে 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'বিরাট্' পুরুষ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

এইজন্য বিবেকী ব্যক্তিরা আপন আপন বুদ্ধিকে রজঃ ও তমো-গুণের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনাচার ও অসৎসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করেন, এবং সত্ত্বগুণের উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত সদা সদাচার ও সৎসঙ্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

[অহঙ্কার-তত্ত্ব।]

উপরি উক্ত সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব হইতে অন্তঃকরণের আর একটী রূপ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম অহঙ্কার-তত্ত্ব। স্বয়ং সূত্রকার—

"চরমোঽহঙ্কারঃ॥" ১।৭২ ॥

এই সূত্রে অহঙ্কার-তত্ত্বকে প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং "অভিমানোঽহঙ্কারঃ।" (২।১৩) এই সূত্রে 'আমি আমার' ইত্যাকার অভিমানকেই অহঙ্কার-তত্ত্বের অসাধারণ কার্য্য ও লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহত্তত্ত্বের ন্যায় অহঙ্কার-তত্ত্বও কেবলই সাত্ত্বিক নহে; উহারও সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার অবস্থা বিদ্যমান আছে; তদনুসারে বৈকারিক (বৈকৃত), তৈজস ও ভূতাদি বা তামস, এই ত্রিবিধ পৃথক্ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে এবং একই অহঙ্কার হইতে পর্য্যায়ক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—ত্রিবিধ কার্য্যই উৎপন্ন হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই-জন্য একই 'অহঙ্কার-তত্ত্ব' হইতে—পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-প্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ, এই একাদশপ্রকার ইন্দ্রিয়, এবং পাঁচ

প্রকার তন্মাত্র, এই ষোড়শ তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে (১)। উক্ত ষোড়শ তত্ত্বের মধ্যে—

"সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ ॥" ২।১৬ ॥

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনই একমাত্র সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন—সাত্ত্বিক; সেই জন্য উহাদের মধ্যে একমাত্র মন ও ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক একাদশ দেবতা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে, এবং মন ভিন্ন দশবিধ ইন্দ্রিয় রাজসিক অহঙ্কার হইতে, আর 'ভূতাদি'-পদবাচ্য তামসিক অহঙ্কার হইতে তামসিক পঞ্চ তন্মাত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে (২)। সাংখ্যমতে

---

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ—বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (মূত্রদ্বার)। তন্মাত্র পাঁচ—শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা প্রত্যেকেই তন্মাত্র পদবাচ্য।

(২) ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কয়েকটী পৌরাণিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টী পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছেন—

"বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।
অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাৎ মনো বৈকারিকাদভূৎ।
বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ।
তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞান-কর্ম্মময়ানি চ।
তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ ॥" (সাংখ্য ভাষ্য ২।১৮)

এখানে কেবল মনকেই সাত্ত্বিক অহঙ্কারের পরিণাম বলা হইয়াছে, কিন্তু আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ একাদশ ইন্দ্রিয়কেই সাত্ত্বিক অহঙ্কার-প্রসূত বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও সেই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু, রাজস অহঙ্কারের পৃথক্ কোন কার্য্য স্বীকার না করিয়া উক্ত দ্বিবিধ কার্য্যেই রাজস অহঙ্কারের আনুকূল্যমাত্র স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের সিদ্ধান্তও ঠিক এই মতেরই অনেকটা অনুরূপ।

মন অন্তঃকরণ হইয়াও ইন্দ্রিয়শ্রেণীর অন্তর্গত; কেন না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনও সাত্ত্বিক অহঙ্কারসম্ভূত। এই কারণে এবং অন্যান্য কারণেও প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয়গণের সহিত উহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য আছে বলিয়াই সাংখ্যাচার্য্যগণ মনকে ইন্দ্রিয়মধ্যে গণনা করিয়াছেন। মনের বিশেষ কার্য্য হইতেছে—সংকল্প-বিকল্প, অর্থাৎ 'ইহা অমুক, না—অমুক, ইহা শ্বেত, না—পীত' ইত্যাদি প্রকারে সংশয় সমুত্থাপন করা (১)।

বাচস্পতি মিশ্রের মতে মন ও দশবিধ ইন্দ্রিয়, উভয়ই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন; সুতরাং উহারাও সাত্ত্বিক। তন্মধ্যে মন উভয়াত্মক, অর্থাৎ মনঃসংযোগ ব্যতীত যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয়, কেহই কোন কাজ করিতে সমর্থ হয় না, তখন উহা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রেরণাকালে কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপে, আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রেরণাকালে জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপে পরিগণনীয় হয়। মনের যে, এবংবিধ উভয়াত্মকতা, তাহা বিজ্ঞানভিক্ষুরও অনভিমত নহে; কারণ,

---

(১) ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

"উভয়াত্মকমত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ॥"

ইহা ছাড়া তিনি একাদশ ইন্দ্রিয়কেই সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসঃ, তৈজসাদুভয়ম্॥" (সাংখ্যকারিকা ২৫)

এখানে একাদশ ইন্দ্রিয়কে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন বলিয়াছেন, এবং রাজসিক অহঙ্কারের পৃথক্ কার্য্য নিষেধ করিয়াছেন।

স্বয়ং সূত্রকারই "উভয়াত্মকং মনঃ" (২।২৬) সূত্রে মনকে উভয়াত্মক (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ভৌতিক,—বিভিন্ন ভূতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে সমুৎপন্ন; কোন ইন্দ্রিয়ই আহঙ্কারিক নহে। বিশেষতঃ ন্যায় ও বৈশেষিকমতে অহঙ্কার বলিয়া কোন তত্ত্বই নাই; সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গের আহঙ্কারিকত্ব বিষয়ে আশঙ্কাই হয় না (১)। সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেবের মত স্বতন্ত্র। তিনি বলেন—

"আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি॥" ২।২০॥

অর্থাৎ শ্রুতি ও তদনুগত স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে যখন ইন্দ্রিয়গণকে আহঙ্কারিক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন উহারা আহঙ্কারিক ভিন্ন ভৌতিক হইতেই পারে না। অতএব ইন্দ্রিয়গণ যে, অহঙ্কার-তত্ত্বেরই পরিণাম,—কোন ভূতের নহে; ইহাই সাংখ্যের অভিমত সিদ্ধান্ত (২)। ইন্দ্রিয়মাত্রই অতীন্দ্রিয়, অর্থাৎ

---

(১) ন্যায় ও বৈশেষিকমতে অহঙ্কার কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নহে,—মনেরই বৃত্তিবিশেষ মাত্র। বেদান্তমতে—অহঙ্কার অন্তঃকরণেরই অন্তর্গত একটী পদার্থ সত্য, কিন্তু উহা ভৌতিক—অন্তঃকরণেরই একটী বৃত্তিবিশেষ মাত্র; সুতরাং সেসকল মতে ইন্দ্রিয়গণের ভৌতিকত্ব ছাড়া আহঙ্কারিকত্ব সিদ্ধ হয় না।

(২) ইন্দ্রিয়গণের আহঙ্কারিকত্ব প্রতিপাদক কোন শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয় না; স্মৃতি-পুরাণ-বচনই দৃষ্ট হয় মাত্র; তথাপি ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—"প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ কাললুপ্তাপি আচার্য্যবাক্যাৎ, মন্বাদ্যখিলস্মৃতিভ্যশ্চ অনুমীয়তে।" (২।২০)। ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়। যাহা ইন্দ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষ করা হয়, সেগুলি বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়ের গোলক বা বাসস্থান মাত্র। অজ্ঞ লোকেরা সেগুলিকেই ইন্দ্রিয় বলিয়া ভুল করিয়া থাকে। একথা সূত্রকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,—

"অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে॥" ২।২৩॥

ইন্দ্রিয়সমূহের উপাদান ও ক্রিয়াবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও ইন্দ্রিয়গণ যে, অতীন্দ্রিয়, এ বিষয়ে সকল দার্শনিকই একমত হইয়াছেন; সুতরাং এবিষয়ে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক।

অতঃপর স্বতই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের উৎপত্তি বিষয়ে যেমন পারম্পর্য্যবোধক শাস্ত্রবচন দৃষ্ট হয়, অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন উক্ত ষোড়শ পদার্থের উৎপত্তিতেও সেরূপ কোনও ক্রমের কথা কোথাও পরিলক্ষিত হয় কি না। একই সময়ে যে, অহঙ্কার হইতে অপর্য্যায়ে ষোড়শ পদার্থের উৎপত্তি, তাহাও যেন যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে সাংখ্যাচার্য্য বলেন— যদিও একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যুক্তিদ্বারা পারম্পর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না সত্য, তথাপি শাস্ত্রান্তরের সাহায্যে উহাদের উৎপত্তিতেও একটা ক্রম বা পারম্পর্য্য নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন হয় না। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মে কথিত আছে—

"শব্দরাগাৎ শ্রোত্রমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ।
রূপরাগাদভূৎ চক্ষুঃ ঘ্রাণো গন্ধ-জিঘৃক্ষয়া"॥ ইত্যাদি।

অর্থাৎ সেই আদি পুরুষের প্রথমে শব্দ শ্রবণের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা হইল; তাহার ফলে শব্দগ্রহণোপযোগী শ্রবণেন্দ্রিয়

প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপ রূপ-দর্শনের অভিলাষে চক্ষুঃ এবং গন্ধ আঘ্রাণের ইচ্ছায় ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রকাশ পাইল; এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভোগের ইচ্ছায় অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিও প্রাদুর্ভূত হইল।

উল্লিখিত বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে শব্দাদি বিষয়ভোগের অভিলাষ, পশ্চাৎ সেই সেই বিষয়ের গ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি। অভিলাষ বা অনুরাগ সাধারণতঃ মনের ধর্ম্ম; মনঃ অগ্রে না থাকিলে অনুরাগের কথাই হইতে পারে না; সুতরাং উক্ত বাক্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অহঙ্কার হইতে সর্ব্ব প্রথমে মনের সৃষ্টি; অনন্তর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি (১)। শ্রোত্রাদি দশবিধ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ প্রকার তন্মাত্রের

---

(১) ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কেবল মন ও ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টিতেই পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিয়াছেন; ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টিতে ক্রম স্বীকার করেন নাই; অথচ সেই সমুদয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়ের উৎপত্তিতে ক্রমিকতা স্বীকার করিয়াছেন। এতদনুসারে ক্রমোৎপন্ন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়ে ক্রমোৎপন্ন অনুরাগানুসারে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা ও জিহ্বা, এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়েরও ক্রমোৎপত্তি কল্পনা করা বিশেষ অসঙ্গত মনে হয় না। আরও এক কথা,—ভোগ্য বিষয় বিদ্যমান থাকিলেই তদ্বিষয়ে ভোগের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। উক্ত ভারতবাক্যেও শব্দাদি বিষয় গ্রহণের জন্যই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-সৃষ্টির কথা লিখিত আছে; অতএব ইন্দ্রিয়-সৃষ্টির অগ্রেই শব্দাদি বিষয়ের সৃষ্টি-কল্পনা যে, কেন অসঙ্গত হইবে, তাহা ভাষ্যকার বুঝাইয়া দেন নাই, অথবা তদ্বিষয়ে কোন আলোচনাও করেন নাই। কাজেই উক্ত সংশয় নিরাসের কোন পথ দেখা যায় না।

সৃষ্টিতে পৌর্ব্বাপর্য্যবোধক কোনও প্রমাণ না থাকায়, উহাদের উৎপত্তিতে কোনপ্রকার ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়ম কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না। তবে তন্মাত্র সৃষ্টির মধ্যে যে, অবশ্যই পৌর্ব্বাপর্য্য বা একটা ক্রম বিদ্যমান আছে, তাহা পৌরাণিক বচন হইতে জানিতে পারা যায়। যথা,—

> "ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দমাত্রং সসর্জ্জ হ।
> আকাশং সুষিরং তস্মাদুৎপন্নং শব্দলক্ষণম্।
> আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।" ইত্যাদি।

অভিপ্রায় এই যে, তামস (ভূতাদি) অহঙ্কার বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রথমে শব্দ-তন্মাত্র সৃষ্টি করিল; সেই শব্দতন্মাত্র হইতে আবার অবকাশাত্মক ভূতাকাশ সমুৎপন্ন হইল। এই আকাশেই শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দ অভিব্যক্ত হইল। পুনশ্চ আকাশেও বিক্ষোভ উপস্থিত হইল; সেই আকাশ-সহযোগে তামস অহঙ্কার—স্পর্শ-তন্মাত্র সৃষ্টি করিল, ইত্যাদি ক্রমে মূল অহঙ্কার হইতেই পর-পর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র প্রকাশ পাইল (১), এবং সেই পঞ্চবিধ তন্মাত্র হইতে পাঁচপ্রকার স্থূলভূতের (আকাশাদির) উৎপত্তি হইল। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব, এখন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

---

(১) তন্মাত্র অর্থ—শুদ্ধ সেই বস্তুটী। 'শব্দতন্মাত্র' বলিলে বুঝিতে হইবে, শুদ্ধ শব্দমাত্র; উহাতে সুখ, দুঃখ বা মোহের সম্পর্ক নাই; সুতরাং মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য; এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে উহাদিগকে 'অবিশেষ' বলা হইয়া থাকে। শান্ত, ঘোর ও মোহসম্পন্ন বস্তুই 'বিশেষ', তদ্ভিন্ন সমস্তই 'অবিশেষ'।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, দশপ্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। তন্মধ্যে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে বিষয় হইতেছে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; আর বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে—যথাক্রমে বচন (শব্দোচ্চারণ), গ্রহণ, বিচরণ, মলাদিত্যাগ ও আনন্দ। বিশেষ এই যে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা কার্য্য হইতেছে ক্রিয়াসম্পাদন, আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইতেছে জ্ঞান-সমুৎপাদন। এ জ্ঞান পরিস্ফুট বা বিশিষ্টতা-বোধ নহে; অপরিস্ফুট—আলোচনা মাত্র। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহাদ্বারা কোন বস্তুরই কোন বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় না; কেবল একটা বস্তুমাত্রের স্ফুরণ বা প্রতীতি হয় মাত্র।

[ইন্দ্রিয়বৃত্তির যৌগপদ্য।]

উপরি উক্ত বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও শ্রোত্রাদি পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয়, ইহারা সকলেই যথাযোগ্য জ্ঞানসম্পাদন করিয়া থাকে; জ্ঞানসম্পাদন করাই উহাদের মুখ্য ও প্রধান কর্ম্ম; কিন্তু সেই জ্ঞানোৎপাদন কার্য্য যে, ক্রমেই হইবে, কিংবা অক্রমেই (যুগপৎ) হইবে, তাহার কোনও নিয়ম নিবদ্ধ নাই, এবং থাকিতেও পারে না। সময় ও অবস্থানুসারে একই সময়ে সমস্ত করণবর্গেরই ব্যাপার হইতে পারে, আবার অবস্থাভেদে ক্রমশও হইতে পারে (১)। এইজন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—

"ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ॥" ২।৩২॥

(১) নৈয়ায়িকগণ প্রধানতঃ জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করেন না;

এই অব্যবস্থা যে, কেবল সূত্রের অনুরোধেই মানিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে; পরন্তু লোকব্যবহার দৃষ্টেও একথা স্বীকার করিতে হইবে। দেখা যায়—ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে আকাশ নিবিড় জলদজালে পরিবৃত, এবং নিরন্তর বিদ্যুৎপ্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে, এমন সময়ে কোন পথিক বনপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ বিদ্যুতের আলোকে সম্মুখে একটা কিছু দেখিতে পাইল; কিন্তু জিনিষটা যে কি, তাহা বুঝিতে পারিল না; কেন না, চক্ষুঃ ইহার অধিক আর কিছু বুঝাইতে পারে না; (ইহাকেই বলে 'আলোচনা')। সেই সময়েই মনঃ যাইয়া সেই দৃষ্ট বস্তুটার সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক আরম্ভ করিল,—ইহা কি মৃত্তিকাস্তূপ? না, বাঘ? অথবা আর কিছু? সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারও সেই দৃশ্য বস্তুটার সহিত আপনার খাদ্য-খাদকভাব সম্পর্ক বুঝাইয়া দিল; সেই মুহূর্ত্তেই বুদ্ধি বলিয়া দিল যে, ইহা আর কিছু নহে—বাঘ; এখনই পলায়ন করা আবশ্যক। বুদ্ধির নিকট হইতে এইরূপ কর্ত্তব্যোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দ্রষ্টা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। এস্থলে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আলোচনা, মনের বিচার করা, অহঙ্কারের অভিমান, এবং বুদ্ধির কর্ত্তব্যোপদেশ, এ সমুদয় একই সময়ে অপর্য্যায়ে উৎপন্ন হইয়াছে। উল্লিখিত কার্য্যগুলি ক্রমশঃ হইতে থাকিলে, ব্যাঘ্রের নিকট হইতে পলায়ন করা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভব হইত না। অক্রমের ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানোৎপত্তিরও যথেষ্ট উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

তাহারা বলেন—জ্ঞানমাত্রই পর পর বিভিন্ন সময়ে হয়, কেবল ক্ষিপ্রতা-বশতঃ সেই ক্ষণবিভাগটা লোকের অনুভবে আসে না মাত্র; তাই জ্ঞানের যৌগপদ্য বিষয়ে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়।

যেমন—ঈষৎ অন্ধকারের মধ্যে একজন সম্মুখে কি যেন একটা দেখিল; কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। শেষে প্রণিধানপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া বুঝিল যে, সম্মুখস্থ বস্তুটা আর কিছুই নহে, একটা ভীষণ দস্যু,—আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে; এখন আমার পলায়ন করাই আবশ্যক। এইরূপ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। এখানে চক্ষুর 'আলোচনা', মনের বিচার, অহঙ্কারের অভিমান (আমি ইহার বধ্য, ইত্যাকার চিন্তা) ও বুদ্ধির অধ্যবসায় বা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, এবং পলায়ন-প্রবৃত্তি, এই সমুদয় ব্যাপার যথাক্রমে পর পর সমুৎপন্ন হইয়াছিল। এই জাতীয় উদাহরণ দৃষ্টে বেশ বুঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি যে, ক্রমেই হইবে, বা অক্রমেই হইবে, তাহার কোনও নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই।

বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ত্রয়োদশটীকে সাংখ্য-শাস্ত্রে 'করণ' বলে। করণ অর্থ এখানে আত্মার ভোগ-সাধন। উক্ত করণবর্গের মধ্যে বুদ্ধির আসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ,—অপরাপর করণবর্গের ব্যাপারসমূহ বুদ্ধি দ্বারাই সফলতা লাভ করিয়া থাকে; এই কারণে পুরুষ বা আত্মাকে বলা হয় রাজা, বুদ্ধিকে বলা হয় সর্ব্বাধ্যক্ষ বা প্রধান অমাত্য, মনকে বলা হয় দেশাধ্যক্ষ (নায়েব), আর দশ ইন্দ্রিয়কে বলা হয় গ্রামাধ্যক্ষ বা তহসিলদার। ইন্দ্রিয়গণ নানাস্থান হইতে ভোগ্য বিষয়রাশি (শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি) আহরণ করিয়া প্রথমতঃ মনের নিকট অর্পণ করে; মন সেই সকল বিষয় সাধারণভাবে বিচার করিয়া গ্রহণ করে, এবং

সর্ব্বাধ্যক্ষ বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে, অর্থাৎ বুদ্ধি-গ্রাহ্য করে; বুদ্ধি তখন প্রাপ্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে যথাযথভাবে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া প্রভুস্থানীয় আত্মার নিকট উপস্থাপিত করে, অর্থাৎ বুদ্ধি-গৃহীত বিষয়সমূহ সন্নিহিত আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এই প্রতিবিম্বই আত্মার ভোগ, তদতিরিক্ত অন্য কোন রকম ভোগ আত্মার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এ সব কথা পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এখন এই প্রসঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে; দেখা যাউক সাংখ্যমতে প্রাণের কোনও পৃথক্ সত্তা আছে কি না।

সাংখ্যমতে প্রাণ বলিয়া কোনও বায়ুবিশেষ বা স্বতন্ত্র বস্তু নাই; পরন্তু উহা ত্রিবিধ অন্তঃকরণেরই (বুদ্ধি, মনঃ ও অহঙ্কারেরই) সাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপারবিশেষ মাত্র। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"সামান্য-করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ॥" ২।৩১॥

অর্থাৎ জগতে বায়ুবিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ যে, পঞ্চ প্রাণ, তাহা বস্তুতঃ অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বা ক্রিয়ার ফল মাত্র (১)।

---

(১) সাংখ্যাচার্য্যদিগের অভিপ্রায় এই যে, আমরা অহরহঃ যে, শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়াদর্শনে প্রাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকি, তাহা সত্য নহে। কারণ, প্রাণ নামে স্বতন্ত্র কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না; 'পঞ্জরচালন' ন্যায়েই শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। যেমন, একটী পঞ্জরের (খাঁচার) মধ্যে তিনটী পাখী আছে। উহাদের মধ্যে কেহ গান করিতেছে; কেহ আহার করিতেছে; কেহ বা গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছে; এমত অবস্থায় সেই পক্ষিত্রয়ের নিজ নিজ ক্রিয়ার ফলে যেরূপ পঞ্জরটীও আন্দোলিত হইতে থাকে; অথচ পঞ্জর-চালনের জন্য কোন পাখীই চেষ্টা করে না। প্রাণের অবস্থাও

সাংখ্যমতে প্রাণের স্বতন্ত্রতা প্রত্যাখ্যাত হইলেও, বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্থপাদে—

"ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥" ২।৪।৯ ॥

এই সূত্রে প্রাণকে স্বতন্ত্র মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও প্রাণের স্বতন্ত্রতাপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন (১)।

[সূক্ষ্ম শরীর]

পূর্ব্বকথিতা মহামহিমশালিনী প্রকৃতিদেবী উদাসীন আত্মার (পুরুষের), যে ভোগ-সম্পাদনের জন্য, বিচিত্র সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; শরীর ব্যতীত সে ভোগ সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় না; এই কারণে ভোগ্যসৃষ্টির পূর্ব্বেই ভোগ-সাধন ও ভোগায়তন শরীর সমুৎপাদন করা আবশ্যক হয়। এই দুই প্রকার শরীরের

ঠিক তদনুরূপ। অন্তঃকরণত্রয় নিজ নিজ ক্রিয়া করে, তাহার ফলে হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাকেই লোকে প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

(১) সেখানে আচার্য্য শঙ্কর "সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" এই সাংখ্যবচন উদ্ধৃত করিয়া, সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন; এখানে আবার ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু উপরি-উদ্ধৃত বেদান্তের উল্লেখ করিয়া 'বায়ু-ক্রিয়ে' কথা দুইটীর অর্থ করিয়াছেন— বায়ু ও বায়ুর ক্রিয়া, অর্থাৎ বায়ুর পরিণাম'; সুতরাং ইহার মতে বুঝিতে হইবে যে, বেদান্তসূত্রে প্রাণকে কেবল বায়ু বা বায়ুর পরিণাম বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহা দ্বারা উহার সামান্যকরণবৃত্তিত্ব খণ্ডিত হয় নাই।

মধ্যে সূক্ষ্ম শরীরকে ভোগসাধন, আর স্থূল শরীরকে ভোগায়তন বলা হয়। ভোগের জন্য স্থূল শরীরের যেরূপ আবশ্যক, সূক্ষ্ম শরীরেরও সেই রূপই অবশ্যক। ভোগায়তন স্থূল শরীরের কথা পরে বলিব, এখন সূক্ষ্ম শরীরের কথা বলিতেছি। সূক্ষ্ম শরীর কিরূপ, এবং কত প্রকার, সে সম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন—

"সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্" ॥ ৩।৯ ॥

সূত্রের অর্থ এই যে, বুদ্ধি, মনঃ ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সপ্তদশ পদার্থের সমবায়ে রচিত শরীরের নাম 'লিঙ্গ' শরীর (১); ইহারই অপর নাম সূক্ষ্ম শরীর। আদিতে উহা এক—অবিভক্তরূপেই অভিব্যক্ত হয়; পরে—

"ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ ॥" ৩।১০ ॥

বিভিন্নস্বভাব জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সেই এক অখণ্ড সূক্ষ্ম শরীরই বহুভাগে বিভক্ত হইয়া, জীবগণের বিবিধ বৈচিত্র্যময়

---

(১) কেহ কেহ উল্লিখিত সূত্রের ব্যাখ্যা করেন যে, সপ্তদশ ও এক =অষ্টাদশ। তাহাদের মতে অহঙ্কারতত্ত্বও সূক্ষ্ম শরীরের অংশ বলিয়া গৃহীত হয়। বৈদান্তিকগণও সূক্ষ্ম শরীরের অষ্টাদশ অবয়ব কল্পনা করিয়া থাকেন। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"কর্ম্মাত্মা পুরুষো যোঽসৌ বন্ধ-মোক্ষৈঃ প্রযুজ্যতে।
স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ ॥"

ইত্যাদি ভারতবচনে যখন 'সপ্তদশক' কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তখন অহঙ্কারতত্ত্বকে বুদ্ধিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সূক্ষ্ম শরীরের সপ্তদশ অবয়বপক্ষই রক্ষা করিতে হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ভোগকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতা পুরুষের নাম—সূত্রাত্মা ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি; আর বিভক্ত এক একটী সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতা এক একটী পুরুষের নাম—সুর, নর, কিন্নর প্রভৃতি। এই সূক্ষ্ম শরীর লইয়াই পুরুষের (আত্মার) জন্ম, মরণ ও বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক প্রাণিদেহের অধিষ্ঠাতা প্রত্যেক পুরুষই (আত্মাই) অখণ্ড, অনন্ত, নিত্য, নিরবয়ব ও উদাসীন। সর্ব্বব্যাপী নিত্য আত্মার কোন দেহে প্রবেশ বা দেহ হইতে নিষ্ক্রমণকরা কোন মতেই হইতে পারে না; অথচ জন্ম-মরণাদি অবস্থা শাস্ত্রসিদ্ধ ও লোকপ্রসিদ্ধ। বুঝিতে হইবে যে, উল্লিখিত সূক্ষ্ম শরীরের প্রবেশ ও নির্গমকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে ও ব্যবহারে আত্মার ঐরূপ জন্ম-মরণাদি ভাব কল্পিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম শরীর যেরূপ দেহ গ্রহণ করে, সেই দেহের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর পরিমাণ অনুসারে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এই জন্যই মহাভারতে 'সাবিত্রী-সত্যবানের' প্রস্তাবে যমকর্ত্তৃক সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষের নিষ্কর্ষণের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় (১)। প্রকৃত পক্ষে, ব্যবহার-জগতে এই সূক্ষ্ম শরীরই সাধারণের নিকট—'আত্মা' বলিয়া পরিচিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

(১) মহাভারতের উক্তি এইরূপ—

"অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশংগতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাদ্ যমঃ॥"

[অধিষ্ঠান শরীর।]

চিত্র যেমন কোন আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, এবং ছায়া যেমন কোন অবলম্বন ছাড়া অবস্থান করিতে পারে না, উল্লিখিত সূক্ষ্ম শরীরও তেমনই বিনা আশ্রয়ে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না, এবং সূক্ষ্ম তন্মাত্রও উহাকে আশ্রয় দিতে পারে না। উহার আশ্রয়ের জন্য স্থূল বস্তুর আবশ্যক হয়। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত—

"অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ" ॥ ৩১ ॥

'অবিশেষ' পঞ্চতন্মাত্র হইতে 'বিশেষে'র (পাঁচ প্রকার স্থূলভূতের) আরম্ভ বা সৃষ্টি হয়। এখানে 'বিশেষ' অর্থ—শান্ত, ঘোর ও মূঢ়স্বভাব বস্তু, আর 'অবিশেষ' অর্থ—তদ্বিপরীত (১)। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে তন্মাত্র পর্য্যন্ত অষ্টাদশ তত্ত্বের কোথাও শান্ত, ঘোর ও মূঢ়ভাব নাই, কিন্তু তদারব্ধ সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীরপ্রভৃতিতে শান্তাদি ভাব প্রকটিত আছে; এই জন্য স্থূল সূক্ষ্ম উভয় শরীরই 'বিশেষ' নামে অভিহিত থাকে।

---

(১) সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষা এই যে, যে সমুদয় বস্তু জীবগণের সুখ, দুঃখ ও মোহ সমুৎপাদনে সমর্থ, সেই সমুদয় বস্তুর নাম 'বিশেষ'। সুখকর বস্তু 'শান্ত', দুঃখজনক বস্তু 'ঘোর', আর মোহসমুৎপাদক বস্তু 'মূঢ়' নামে অভিহিত হয়। তন্মাত্রপর্য্যন্ত তত্ত্বগুলি মনুষ্যগণের উপভোগ্য নহে; সুতরাং সে সমুদয় হইতে সুখ দুঃখ বা মোহের সম্ভাবনাও নাই; এইজন্য উহারা 'অবিশেষ', আর উপভোগযোগ্য স্থূল ভূত হইতে মনুষ্যগণ পর্য্যায়ক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; এইজন্য উহারা শান্ত, ঘোর ও মূঢ় সংজ্ঞায় অভিহিত 'বিশেষ' পদবাচ্য; আর তন্মাত্রসমূহ কেবলই দেবভোগ্য সুখময় বলিয়া 'শান্ত' নামে অভিহিত। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ॥" (সাংখ্যকারিকা ৩৮)

সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে তন্মাত্রগত গুণসমূহও উহাদের মধ্যে (মনুষ্যাদির গ্রহণযোগ্য-রূপে) অভিব্যক্ত হয়। তখন আকাশে শব্দ, বায়ুতে স্পর্শ, তেজেতে রূপ, জলেতে রস ও পৃথিবীতে গন্ধ প্রকটিত হয়। এইরূপে মহাভূতারব্ধ অন্যান্য বস্তুতেও স্ব স্ব কারণগত গুণসকল সংক্রামিত হইয়া এই জগৎকে জীবগণের অপূর্ব্ব ভোগভূমি ও প্রমোদকাননে পরিণত করিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পঞ্চ মহাভূতেই সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব-সংখ্যার পরিসমাপ্তি। মহাভূতারব্ধ বস্তুগুলি তত্তৎ মহাভূতেরই অন্তর্গত; উহারা স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত নহে। ইহাই সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিমত সিদ্ধান্ত। উপরে যে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে,—

"তস্মাচ্ছরীরবস্ত" ॥ ৩।২ ॥

তাহা হইতেই স্থূল-সূক্ষ্ম নিখিল জীব-শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম শরীরের স্বরূপ ও উৎপত্তিক্রম পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এখন স্থূল শরীরের কথা বলা হইতেছে—

[স্থূল শরীর]

স্থূল শরীর দ্বিবিধ, এক সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রয়ভূত 'অধিষ্ঠান' শরীর, দ্বিতীয় ঐ অধিষ্ঠান শরীরের আশ্রয়ভূত এই স্থূলতর 'ষাট্‌কৌশিক' শরীর (১)। সাংখ্যাচার্য্য—ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সূক্ষ্মা মাতা-পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥" (সাংখ্যকারিকা ৩৯)

(১) আমাদের ভোগায়তন এই স্থূল শরীরের লোম, রক্ত ও মাংস এই তিনটী অংশ মাতৃ-শরীর হইতে, আর স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই অংশ-

শান্ত-ঘোর-মূঢ়স্বভাব 'বিশেষ' তিন প্রকার—এক সূক্ষ্ম শরীর, দ্বিতীয় মাতা-পিতৃসংযোগজ স্থূল শরীর, আর পঞ্চমহাভূত। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী, আর স্থূল শরীর প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল-ভোগাবসানে বিনাশশীল। এই কারিকার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র কেবল স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটী মাত্র শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; আর 'প্রভূতৈঃ' শব্দে পঞ্চ মহাভূতের গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অতিরিক্ত আর একটী তৃতীয় শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; তাহার নাম—অধিষ্ঠান শরীর। এই অধিষ্ঠান শরীরই সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরকে বহন করিয়া বেড়ায়। সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায় উক্ত 'অধিষ্ঠান' শরীরও মাতা-পিতৃজ স্থূল শরীরের আশ্রয়ে থাকিয়া কার্য্য চালায়। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে উদ্ধৃত কারিকার 'প্রভূতৈঃ' শব্দে কেবল পঞ্চভূতের উল্লেখ হয় নাই; পরন্তু ঐ অধিষ্ঠান শরীরেরই উপাদান কারণ—মহাভূতসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব সাংখ্যসম্মত জীব-শরীর দুইটী নহে, তিনটী—সূক্ষ্ম, অধিষ্ঠান ও স্থূল। তন্মধ্যে অধিষ্ঠান শরীরটী সূক্ষ্ম শরীর অপেক্ষা স্থূল, আবার স্থূল শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম। অন্যান্য আস্তিক দার্শনিকের ন্যায় কপিল ও দেহের পাঞ্চভৌতিকতা বা চেতনতা স্বীকার করেন নাই, বরং প্রতিপক্ষগণের ঐ জাতীয়

ত্রয় পিতৃ-শরীর হইতে উৎপন্ন হয়। উক্ত ছয়টী বস্তুকে 'কোশ' বলা হয়। সেই ছয় প্রকার কোশের দ্বারা আরব্ধ হয় বলিয়া স্থূল শরীরকে 'ষাট্‌কৌশিক' নাম দেওয়া হইয়াছে।

বিরুদ্ধ মতবাদ সকল যত্নসহকারে খণ্ডন করিয়া দেহের অচেতনত্ব ও ঐকভৌতিকত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন (১)।

[আলোচনা।]

উক্ত ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে ষাট্‌কৌশিক স্থূল শরীর অনেক প্রকার। জীব স্বকৃত কর্ম্মানুসারে বিভিন্নপ্রকার ভোগ নিষ্পাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রাক্তন কর্ম্মই বিভিন্নাকার ফলভোগোপযোগী দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য-নারকাদিভেদে বিভিন্ন প্রকার শরীর জীবের সম্মুখে উপস্থাপিত করে; জীবগণও বিনা আপত্তিতে সে সকল শরীর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যতকাল ভোগযোগ্য কর্ম্মফল থাকে, ততকাল সেই দেহও অব্যাহতভাবে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকে; সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম তাহার প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, তদ্বিষয়ে কোনও বিচার বিবেচনা করিবার অধিকার নাই। যেই মুহূর্ত্তে সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই দেহের উপযোগিতা ফুরাইয়া যাইবে। জীব তখন এই দেহ

---

(১) দেহ সম্বন্ধে অন্যান্য দার্শনিকগণের বিভিন্নপ্রকার মতবাদসকল ফেলোশিপ প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে; এই কারণে এখানে আর সে সকল কথার সন্নিবেশ করা হইল না। কারণ, ঐ সম্বন্ধে আলোচনা-পদ্ধতি প্রায় সকলেরই একরূপ। কপিল পঞ্চমাধ্যায়ে বিশেষভাবে বলিয়াছেন—"সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাৎ, তদ্ব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ" ॥ ৫।১১২ ॥

অর্থাৎ পৃথিবীই সকল শরীরের প্রকৃত উপাদান, অন্যান্য ভূতসমূহ কেবল তাহার সহায়তা করে মাত্র। যে শরীরে যে ভূতের প্রাধান্য, তদনুসারে তাহার নাম ব্যবহার হইয়া থাকে।

পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থানে চলিয়া যাইবে। এখানে জীব অর্থ সূক্ষ্ম শরীর; কেন না, সর্ব্বব্যাপী নিত্য আত্মার ত গমনাগমন বা জন্ম-মরণাদি কখনও সম্ভব হয় না। সূক্ষ্ম শরীরই প্রকৃত পক্ষে জীবের ভোগাধিষ্ঠান। জীব যে সময়ে বর্ত্তমান স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া বহির্গত হয়, এবং দ্বিতীয় আর একটী ভোগদেহ প্রাপ্ত না হয়—আতিবাহিক-নামক একটী বায়বীয় দেহ মাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে; সেই সময় তাহার কিছুমাত্র ভোগ-শক্তি থাকে না; তখন—

"সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্'' ॥ (ঈশ্বরকৃষ্ণ)

ধর্ম্মাধর্ম্মকৃত সমস্ত ভোগবাসনা এবং ভোগসাধন সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিদ্যমান থাকে; থাকে না কেবল ভোগ করিবার ক্ষমতা। সেই জন্য ঐ সময়টা বড়ই দুঃসহ যাতনাময় হইয়া থাকে। সে সময় পুত্রাদিকৃত জলপিণ্ডাদিদানই তাহার একমাত্র তৃপ্তিলাভের উপায় হয়। সাধারণ নিয়মে জীবকে এক সংবৎসরপর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকিতে হয়; তাহার পর, কর্ম্মানুসারে পুনশ্চ উত্তমাধম ভোগদেহ লাভ করে—পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান সমুদিত না হয়, ততকাল জীবের এইভাবে ঊর্দ্ধাধোগতি অনিবার্য্য হইয়া থাকে (১); কেন না, ইহাই জগৎপ্রকৃতির স্বভাব—

"আ বিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাম্" ॥ ৩।১০ ॥

---

(২৫) সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ ॥ ৫৪ ॥
তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেঃ, তস্মাৎ দুঃখং স্বভাবেন" ॥ ৫৫ ॥

কিন্তু বিবেকজ্ঞান উপস্থিত হইবামাত্র, সৌর-করস্পর্শে নীহার-জালের ন্যায় ঐ সূক্ষ্ম শরীর স্বকীয় উপাদানে বিলীন হইয়া যায়। উক্ত বিবেকজ্ঞান সমুৎপাদনের জন্যই শ্রবণ মননাদি যত কিছু উপায়ের অবতারণা। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের স্বরূপ ও উপযোগিতা প্রথমেই নিরূপিত হইয়াছে, এখন অপরাপর সাধনের কথা সংক্ষেপে বলিতে হইবে। তন্মধ্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধাত্মক যোগ বা ধ্যান হইতেছে উহার প্রধান সাধন। ধ্যান কি ?—

"ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ" ॥ ৬।২৫ ॥

এখানে ধ্যান অর্থ যোগ। যোগাঙ্গ ধ্যানের কথা পরে বলা হইবে। মনের যে, বিষয়শূন্যভাব, তাহা বস্তুতঃ বৃত্তিশূন্য অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং পাতঞ্জলোক্ত "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" এই যোগলক্ষণের সহিত এ লক্ষণের অতি অল্পমাত্রও অর্থগত প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। উক্তপ্রকার যোগসংজ্ঞক চিত্তবৃত্তি-নিরোধ সম্পাদনের জন্য যে সমুদয় উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক ; সূত্রকার একটীমাত্র সূত্রে তাহা সংক্ষেপতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ধ্যান-ধারণাভ্যাস-বৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ" ॥ ৬।২৯ ॥

ধ্যান ও ধারণার, পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে ও বিষয়বৈরাগ্যপ্রভৃতি

অর্থাৎ বুদ্ধিগত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্যে ঊর্দ্ধাধোগমন হয়। তন্মধ্যে সত্ত্ববাহুল্যে স্বর্গাদিলোকে, রজোবাহুল্যে ভূলোকে, আর তমো-বাহুল্যে পশু-স্থাবরাদিদেহে গতি হয়, এবং যেখানেই গমন হউক, সেখানেই জরামরণ ও তজ্জনিত দুঃখভোগ অপরিহার্য্য হইয়া থাকে।

উপায়ের সাহায্যে মানসিক বৃত্তিনিচয় সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ সকল উপায়ের অনুশীলনে যে, কিপ্রকারে মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, সে সম্বন্ধে সূত্রকার নিজের অভিপ্রায় পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"লয়-বিক্ষেপয়োর্ব্যাবৃত্ত্যা—ইত্যাচার্য্যাঃ" ॥ ৬।৩০ ॥

অর্থাৎ উল্লিখিত ধ্যানাদি কার্য্যের অনুশীলন করিতে করিতে 'লয়' নামক নিদ্রাবৃত্তির ও বিক্ষেপকর প্রমাণাদিবৃত্তির ক্রমশঃ নিবৃত্তি হইতে থাকে; এইভাবে ধ্যানবিরোধী চিত্তবৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনিবৃত্ত হইলে পর, চিত্তে আর বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না; সুতরাং তখন পুরুষেও প্রতিবিম্ব পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না; কাজেই তদবস্থায় স্বভাবশুদ্ধ পুরুষের সর্ব্বপ্রকার দুঃখসম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। বাহ্য বা আন্তর—অপর কোনও বিষয় বুদ্ধিগত না হওয়ায়, বুদ্ধি তখন বিমল স্ফটিকমণির ন্যায় নিরতিশয় স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়; এবং বিষয়সম্পর্কজনিত বিক্ষোভও তাহার নিরস্ত হয়। তখন—

"তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ" ॥

বিমল সরোবরে যেরূপ তীরস্থ তরুলতা প্রভৃতি যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, জীবের বিমল বুদ্ধি-দর্পণেও সেইরূপ নিখিল বিশ্ববস্তু অবিকলরূপে প্রতিফলিত হয়। বুদ্ধি তখন আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এইপ্রকার পার্থক্যোপলব্ধিরই নাম—বিবেকজ্ঞান। তাদৃশ বিবেকজ্ঞান

প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র—অরুণোদয়ে অন্ধকারের মত, জীবের পূর্ব্বতন অবিবেক বা দেহাদিগত আত্মভ্রম এবং আত্মগত সুখ-দুঃখাদি-ভ্রান্তি আপনা হইতেই চলিয়া যায়। তখন এক দিকে পুরুষ যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করে, অপর দিকে বুদ্ধিও তেমনই আপনার কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত করিয়া, সেই পুরুষের নিকট হইতে চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করে (১)।

[মুক্তি]

উভয়ের এবম্বিধ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—

"দ্বয়োরেকতরস্য বা ঔদাসীন্যমপবর্গঃ" ॥ ৩।৬৫ ॥

অর্থাৎ, পুরুষ ও বুদ্ধি, এতদুভয়ের যে, ঔদাসীন্য—অসম্বন্ধ বা পৃথক্ ভাবে অবস্থান, অর্থাৎ উভয়ের যে, পরস্পর সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ, তাহার নাম অপবর্গ; কিংবা কেবল পুরুষেরই যে, ঔদাসীন্য বা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ, তাহার নাম অপবর্গ। অপবর্গের অপর নাম মুক্তি ও কৈবল্য প্রভৃতি। এখানেই সেই পুরুষের জন্য প্রকৃতির (বুদ্ধির) করণীয় সমস্ত কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। ইহার পর উভয়েই—বিবিক্তভাবে অবস্থান করে।

---

(১) পুরুষের প্রতি প্রকৃতির দ্বিবিধ কর্ত্তব্য আছে। এক—পুরুষের ভোগ সম্পাদন, দ্বিতীয়—অপবর্গসাধন। প্রকৃতি প্রথমতঃ বুদ্ধিরূপে বিবিধ ভোগ সম্পাদন করে; অবশেষে বিবেকজ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া অপবর্গ সাধন করে। বিবেকজ্ঞান উৎপাদন করিলেই বুদ্ধির কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। পাতঞ্জলভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, "বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তং হি চিত্তচেষ্টিতম্।" অর্থাৎ বুদ্ধির চেষ্টার শেষ সীমা হইতেছে—বিবেকজ্ঞান সমুৎপাদন করা; তাহার পরই বুদ্ধির বিশ্রাম। ইহারই নাম মুক্তি।

এই কারণেই মুক্তিলাভের পক্ষে বিবেকজ্ঞানের উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক।

সাংখ্যাচার্য্যগণ মুক্তিলাভের অনুকূল বহুবিধ উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ সাধনরূপে—ধারণা, ধ্যান, সমাধির, বহিংরঙ্গ সাধনরূপে—আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির এবং বিভিন্ন আশ্রম-বিহিত কর্ম্মসমূহেরও যথেষ্ট উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু সাধনরাজ্যে জ্ঞানকেই উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সূত্রকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ॥" ৩।২৩॥

জ্ঞান হইতেই মুক্তি প্রাদুর্ভূত হয়। এ সিদ্ধান্ত যেমন শাস্ত্র সম্মত, তেমনই যুক্তিদ্বারাও সমর্থিত। কেন না, মুক্তি বলিয়া কোনও অভিনব গুণ বা অবস্থা পুরুষে (আত্মাতে) উপস্থিত হয় না; উহা পুরুষের নিত্যসিদ্ধ বা স্বতঃসিদ্ধ; কেবল অবিবেক-প্রভাবে তাহার প্রকৃত স্বরূপটী প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এবং অবিবেকই অস্বাভাবিকরূপে সুখদুঃখাদি অনাত্মধর্ম্মসমূহ প্রতিফলিত করিয়া মুক্ত আত্মাকেও যেন বন্ধনদশায় উপনীত করে। জ্ঞানই অজ্ঞান নিবৃত্তির অমোঘ উপায়; কাজেই সূত্রকারের "জ্ঞানাৎ মুক্তি" কথাটী যুক্তিবিরুদ্ধ হইতেছে না, বরং সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসম্মত হইতেছে। সূত্রকার নিজেই প্রথমও ষষ্ঠাধ্যায়ে—

"নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ" ॥ ১।৫৬॥

"মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্ন পরা॥" ৬।২০॥

এই সূত্রে উপরি উক্ত অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পুরুষের মুক্তি কিছু নূতন নহে; পরন্তু নিত্যসিদ্ধ; কেবল অজ্ঞান বা অবিবেক তাহার মুক্ত স্বরূপটী উপলব্ধি করিতে দিতেছিল না; সুতরাং অবিবেকই প্রকৃতপক্ষে স্বরূপদর্শনের একমাত্র অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক। বিবেকজ্ঞানোদয়ে সেই অন্তরায় বিধ্বস্ত হয়—চলিয়া যায়; তখন আপনা হইতেই স্বরূপদর্শন প্রকটিত হয়; সুতরাং মুক্তিতে অন্তরায়-ধ্বংস ছাড়া নূতন আর কিছু লাভ হয় না। যদিও মুক্তিদশায় জীবের নূতন কিছু লাভ হয় না, সত্য; তথাপি উহা কাহারও উপেক্ষণীয় বা অনাদরের বস্তু নহে। কারণ—

"বিবেকাৎ নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা॥" ৩।৮৪॥

জগতের জীবমাত্রই যাহার ভয়ে কাতর, অপ্রিয়-বোধে যাহার চতুঃসীমায় যাইতে ইচ্ছা করে না, এবং স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে যাইয়াও যাহার গতি নিরুদ্ধ করিতে পারে না, সেই ত্রিবিধ দুঃখ (—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশ) বিবেকজ্ঞান-প্রভাবে সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব অবশ্যম্ভাবী। অবিবেকই সমস্ত দুঃখের নিদান; বিবেকজ্ঞানের প্রভাবে অবিবেক বিনষ্ট হইলে, তজ্জনিত দুঃখও আর থাকিতে পারে না। সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলেই জীব কৃতার্থতা লাভ করে; ইহার পর তাহার আর এমন কিছুই কর্ত্তব্য বা প্রার্থনীয় থাকে না, যাহার জন্য তাহাকে পুনরায় কর্ম্মময় সংসার-ক্ষেত্রে আসিতে হয় বা জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; অতএব বিবেক-জ্ঞানই জীবের শেষ কার্য্য; তাহার পরই কৃতকৃত্যতা সিদ্ধ হয়।

[মুক্তির বিভাগ]

অপরাপর শাস্ত্রের ন্যায় সাংখ্যশাস্ত্রেও মুক্তির দ্বিবিধ বিভাগ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটীর নাম—বিদেহমুক্তি, অপরটীর নাম—জীবন্মুক্তি। বিদেহমুক্তি সম্বন্ধে কাহারো মতভেদ নাই, এবং থাকিতেও পারে না, কিন্তু জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষের মতভেদ দৃষ্ট হয়। সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু পাতঞ্জল দর্শনের 'বার্ত্তিক' নামক ব্যাখ্যা গ্রন্থে জীবন্মুক্তিকে আপেক্ষিক মুক্তি বলিয়া, উহাকে মুক্তির গৌরবপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন (১)। সাংখ্যসূত্রকার কপিলদেব কিন্তু সেরূপ কথার উল্লেখ করেন নাই; বরং তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের তিনটী সূত্রে (২) শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির সাহায্যে

---

(১) তাহার অভিপ্রায় এই যে, মুক্তি অর্থ কৈবল্য—পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতি। সেই অবস্থায় বুদ্ধির প্রতিবিম্বদ্বারা পুরুষ উপরঞ্জিত হয় না; সুতরাং তদবস্থায় পুরুষের কোন প্রকার ভোগ থাকাও সম্ভব হয় না। অথচ জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে রীতিমত সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন; কাজেই সে অবস্থায় পুরুষের কৈবল্য লাভ সম্ভবে না। দেহ-পাতের পরই তাঁহার বুদ্ধি-সম্বন্ধ থাকে না · সুতরাং ভোগ-সম্বন্ধও ঘটে না; অতএব তাহাই যথার্থ মুক্তি বা কৈবল্য। জীবন্মুক্তে সেরূপ অবস্থা ঘটে না বলিয়াই তাঁহার অবস্থাকে আপেক্ষিক অর্থাৎ সাংসারিক অবস্থার তুলনায় মুক্তি বলিয়া ধরা হয় মাত্র, প্রকৃত পক্ষে উহা কৈবল্য নহে।

(২) "জীবন্মুক্তশ্চ" ॥ ৩।৭৮ ॥

"উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ" ॥ ৩।৭৯ ॥

"শ্রুতিশ্চ" ॥ ৩।৮০ ॥

জীবন্মুক্তির সদ্ভাব স্বীকার করিয়াছেন (১)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু সেখানেও আপনার সে মতটী পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অধিকারীর শক্তিগত তারতম্যানুসারে, অধিকারীর ন্যায় বিবেকজ্ঞানকেও উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে উত্তমাধিকারীর বিবেকজ্ঞান উত্তম (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি), যাহাদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; আর মধ্যমাধিকারীর বিবেকজ্ঞান মধ্যম; তাহা দ্বারা কেবল দৃশ্য বা ভোগ্যবিষয় সমূহের ভোগ্যতাবুদ্ধিমাত্র বাধিত হয়, কিন্তু প্রারব্ধবশে ভোগ-ব্যবহার অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়; আর অধম অধিকারীর যে বিবেকজ্ঞান, তাহা অধম শ্রেণীভুক্ত; কেন না, তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, কেবল জন্মান্তরে সাধনানুষ্ঠানের আনুকূল্য হয় মাত্র।

উক্ত ত্রিবিধ বিবেকের মধ্যে প্রথমোক্ত বিবেকজ্ঞান পরিনিষ্পন্ন হইবার পরই দেহপাত ঘটে; সুতরাং তাদৃশ বিবেকীর মুক্তিই

---

(১) জীবন্মুক্তি-বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতিবচন এই :—

"দীক্ষয়ৈব নরো মুচ্যেৎ তিষ্ঠেৎ মুক্তোঽপি বিগ্রহে।
কুলাল-চক্রমধ্যস্থো বিচ্ছিন্নোঽপি ভ্রমেদ্ ঘটঃ॥"

"পূর্ব্বাভ্যাসবলাৎ কার্য্যে, ন লোকো ন চ বৈদিকঃ।
অপুণ্যপাপঃ সর্ব্বাত্মা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" (নারদীয় স্মৃতি)

তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ বিবেকজ্ঞানরূপ দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেই মুক্ত হয়। মুক্ত হইয়াও, কুম্ভকারের চক্র-মধ্যস্থিত ঘট যেমন ভ্রামক দণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও ঘুরিতে থাকে, তেমনই দীক্ষিত ব্যক্তি প্রাক্তনবশে দেহে থাকিয়া কার্য্য করেন; কিন্তু তিনি লৌকিক ও বৈদিক নিয়মের বহির্ভূত।

বিদেহমুক্তি, এবং তাহাই যথার্থ মুক্তিপদ-বাচ্য; আর মধ্যম বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির যে, মুক্তি, তাহাই জীবন্মুক্তি, ঐ অবস্থায় দেহ ও তদুপযুক্ত ভোগ বিদ্যমান থাকে বলিয়া উহা আপেক্ষিক মুক্তিমাত্র, প্রকৃত মুক্তিপদবাচ্য নহে ইত্যাদি। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ কিন্তু এ ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই; বরং তিনি জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্তের মধ্যে কোনপ্রকার প্রভেদ দেখিতে পান নাই; তিনি জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদূর্দ্ধং ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ" ॥
প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধাননিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি" ॥

(সাংখ্যকারিকা ৬৭—৬৮)।

প্রকৃতি পুরুষের বিবেক-সাক্ষাৎকার হইবার পর, ধর্ম্মাধর্ম্মের 'ফল'-প্রসবশক্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন শরীরপাত সম্ভবপর হইলেও, কুম্ভকারের চক্র যেরূপ কার্য্যসমাপ্তির পরও পূর্ব্ব-সংস্কারবশে কিছু সময় ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ তাঁহার শরীরও প্রারব্ধ সংস্কারবশে কিয়ৎকাল অব্যাহতভাবে বিদ্যমান থাকে। অনন্তর প্রারব্ধ-সংস্কার পরিসমাপ্ত হইলে, প্রকৃতির কার্য্য পরিসমাপ্ত হওয়ায় জন্মান্তরলাভের সম্ভাবনাও নিবৃত্ত হইয়া যায়; তখন ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য উপস্থিত হয়; তখন চিরদিনের জন্য সমস্ত দুঃখ সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়; এবং তাহাকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

[আলোচনা]

দর্শনমাত্রই তত্ত্বনির্ণয়প্রধান। তত্ত্বনির্ণয় আবার প্রমাণ-সাপেক্ষ; শাস্ত্রোক্ত পদার্থ যতক্ষণ কোন প্রমাণদ্বারা সমর্থিত ও সুব্যবস্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহা তত্ত্ব কি অতত্ত্ব অর্থাৎ সত্য কি মিথ্যা, স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না; সুতরাং তাদৃশ বিষয়ে বিচারপটু পণ্ডিত জনের আদর বা আস্থা কখনই হয় না, বা হইতে পারে না। এইজন্য প্রত্যেক দার্শনিকই নিজের অভিমত পদার্থ নিরূপণের অগ্রে প্রমাণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহা দার্শনিক সমাজে প্রচলিত চিরন্তন পদ্ধতি; কেহই এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, সাংখ্যাচার্য্যগণও এ বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। সাংখ্যাচার্য্যগণ তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। এই ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্যেই তাঁহারা নিজেদের অভিমত প্রমেয় সমূহ (প্রতিপাদ্য বিষয় সকল) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

সাংখ্যমতে প্রমেয়-সংখ্যা (তত্ত্বের সংখ্যা) সমষ্টিতে পঁচিশ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঐ পঁচিশটী পদার্থ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত, এক—চেতন, অপর—অচেতন। চেতনের নাম পুরুষ বা আত্মা, আর অচেতনের নাম প্রকৃতি। পুরুষ অসংখ্য এবং দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সকল পুরুষই আকারে প্রকারে ও স্বভাবে একই রকম; সুতরাং উহারা সকলে একই চেতনশ্রেণীর অন্তর্গত। অচেতন প্রকৃতির পরিণাম অনেক (ত্রয়োবিংশতি) হইলেও, বস্তুতঃ সকলেই প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী ও জড়-স্বভাব; এই কারণে উহারা

সকলেই অচেতনশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফলকথা, চেতন ও অচেতন দুই শ্রেণীর পদার্থ লইয়াই সাংখ্যশাস্ত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

অবিবেক প্রভাবে প্রকৃতির সহিত পুরুষের একপ্রকার সংযোগ সম্বন্ধ ঘটে; সেই সংযোগের ফলে প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি বা আবির্ভাব সম্পন্ন হয়, এবং ঐ অবিবেকনিবন্ধনই বুদ্ধিগত সুখ, দুঃখ, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি নির্গুণ পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া, পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়।

পরবর্ত্তী সৃষ্টি আবার দুই ভাগে বিভক্ত; এক—তন্মাত্রসর্গ, দ্বিতীয়—প্রত্যয়সর্গ। তন্মধ্যে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত ও তদুৎপন্ন সমস্ত ভৌতিক পদার্থ লইয়া তন্মাত্রসর্গ; আর বুদ্ধি-কৃত সৃষ্টিমাত্রই প্রত্যয়সর্গ। বুদ্ধিগত বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে আট প্রকার—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, আর অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটী ধর্ম্ম সাত্ত্বিক, আর শেষোক্ত চারিটী ধর্ম্ম—তামস।

[প্রত্যয়সর্গ ও তাহার বিভাগ।]

কথিত প্রত্যয়সর্গ প্রকারান্তরে আবার চারিভাগে বিভক্ত—বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বিপর্য্যয় পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (১)।

(১) অবিদ্যা অর্থ—অনিত্যে নিত্যতাবুদ্ধি, বা অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি। অস্মিতা অর্থ—অনিত্য ও অনাত্ম বস্তুতে নিত্য ও আত্মীয় বোধে অভিমান। রাগ—সুখ ও সুখকর বিষয়ে অভিলাষ। দ্বেষ—ঠিক রাগের বিপরীত ভাব। অভিনিবেশ অর্থ—ভয় বা মরণত্রাস। ইহাদের মধ্যে অবিদ্যা ও অস্মিতা স্বরূপতই বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানাত্মক; অবশিষ্ট তিনটী বিপর্য্যয় হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বিপর্য্যয় মধ্যে পরিগণিত।

এই পাঁচটী বুদ্ধিধর্ম্ম যথাক্রমে তমঃ. মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে পরিচিত। অবিদ্যা সাধারণতঃ প্রকৃতি. মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই আটপ্রকার অনাত্মবিষয় অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে অবিদ্যার আটপ্রকার বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে।

অস্মিতাও বিষয়ভেদে আট ভাগে বিভক্ত। দেবতাগণ অণিমাদি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সমুদয় বিষয়কে নিত্য ও আত্মীয় (আত্ম-তৃপ্তিকর) বলিয়া অভিমান পোষণ করেন ; এই কারণে অস্মিতাকে আট প্রকার বলা হইয়া থাকে। তাহার পর, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটীই অনুরাগের সাধারণ বিষয়। সেই বিষয়গুলি দিব্য অদিব্যভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; সুতরাং বিষয়ের বিভাগানুসারে অনুরাগও দশপ্রকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। দ্বেষ অষ্টাদশ প্রকার কথিত হইয়াছে। দিব্যাদিব্যভেদে দশ প্রকার শব্দাদি বিষয়ে প্রবৃত্তির বাধা ঘটিলে যেমন দ্বেষ হয়, তেমনি অণিমাদি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যদ্বারাও শব্দাদি ভোগের স্বচ্ছন্দতা সম্পাদিত হয় ; এই কারণে সময়বিশেষে উক্ত ঐশ্বর্য্য বিষয়েও দ্বেষ উপস্থিত হইয়া থাকে ; এইজন্য দ্বেষকে অষ্টাদশ প্রকার বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রত্যয়সর্গ—অশক্তি। অশক্তি আটাশ প্রকার ;— বুদ্ধির সাহায্যকারী একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি (অসামর্থ্য) একাদশ প্রকার ; আর বুদ্ধির স্বকীয় অশক্তি হইল সপ্তদশ প্রকার ; যথা—নয় প্রকার তুষ্টির বিপর্য্যয়ে অস্মিতা নয় প্রকার ;

আর আট প্রকার সিদ্ধির বিপর্য্যয়ে অশক্তি আট প্রকার; সমষ্টিতে অশক্তির বিভাগ অষ্টাবিংশতি প্রকার।

তৃতীয় প্রত্যয় সর্গ—তুষ্টি। তুষ্টি নয়প্রকার—বাহ্য পাঁচ ও আধ্যাত্মিক চারি প্রকার। তন্মধ্যে ভোগবিষয়ে - অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ ও হিংসাদোষ দর্শনে উপজাত বৈরাগ্য হইতে যে, তুষ্টি বা সন্তোষ, তাহা বহির্বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বাহ্য, এবং পাঁচ প্রকার কারণ হইতে হয় বলিয়া পাঁচ প্রকার।

আধ্যাত্মিক চারি প্রকার তুষ্টির ক্রমিক নাম—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য। তন্মধ্যে, 'প্রকৃতি' নামক তুষ্টি এই যে, প্রকৃতিই বিবেক-সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া থাকে, আমার সম্বন্ধেও প্রকৃতিই তাহা করিবে, তজ্জন্য আমার প্রচেষ্টা অনাবশ্যক, এইরূপ ধারণায় সন্তুষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকা। সন্ন্যাসগ্রহণের ফলেই কালে মুক্তি হইবে; মুক্তির জন্য আর অধিক ক্লেশ করা অনাবশ্যক; এইরূপে যে, সন্তোষ, তাহা 'উপাদান' নামক তুষ্টি। দীর্ঘকাল ধ্যানাভ্যাসাদি সাধনানুষ্ঠানে যে তুষ্টি, তাহা 'কাল' সংজ্ঞক তুষ্টি। আর সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরমোৎকর্ষ 'ধর্ম্মমেঘ' নামক সমাধিলাভেই যে, পরিতোষ তাহা 'ভাগ্য' নামিক তুষ্টি (১)।

---

(১) বাচস্পতি মিশ্র বলেন—বিবেক-সাক্ষাৎকার প্রকৃতিরই পরিণাম; প্রকৃতিই তাহা সম্পাদন করিবে, এইরূপ ভ্রান্তিবশে যে, শ্রবণ মননাদি কার্য্য হইতে বিরত থাকা, তাহা 'প্রকৃতি' নামক তুষ্টি। বিবেক-সাক্ষাৎকার প্রকৃতির কার্য্য হইলেও সন্ন্যাসের অপেক্ষা করে; এই বুদ্ধিতে যে, ধ্যানাভ্যাস না করিয়া কেবল সন্ন্যাসমাত্র গ্রহণেই সন্তোষ, তাহার নাম 'উপাদান'

চতুর্থ প্রত্যয়সর্গের নাম সিদ্ধি। সিদ্ধি আট প্রকার। তন্মধ্যে দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক; সুতরাং দুঃখনিবৃত্তিরূপ সিদ্ধিও তিন প্রকার। ইহা ছাড়া আরও পাঁচ প্রকার সিদ্ধি আছে; যথা—অধ্যয়ন (গুরুর নিকট হইতে অক্ষর গ্রহণ); তাহার পর ঐ সকল শব্দের অর্থ জানা; অনন্তর সেই শব্দার্থের সত্যতাবধারণের উদ্দেশ্যে উহ অর্থাৎ বিচার; সপ্তম সিদ্ধি সুহৃৎপ্রাপ্তি, অর্থাৎ আপনার অধিগত বিষয়ে লব্ধবিদ্য পণ্ডিতগণের সহিত জিজ্ঞাসুরূপে আলোচনা। অষ্টম সিদ্ধি—দান; ধনাদিদানে বশীকৃত গুরু মন খুলিয়া শিষ্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন; সুতরাং তাহাও সিদ্ধিলাভের বিশেষ অনুকূল। উক্ত আট প্রকার সিদ্ধির মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী সিদ্ধিই মুখ্য সিদ্ধি; তদ্ভিন্ন বিষয়গুলি সিদ্ধিলাভের উপায় বা অনুকূল বলিয়া 'সিদ্ধি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র।

এই যে, প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ, উহারা উভয়েই পরস্পর-সাপেক্ষ; কারণ, প্রত্যয়সর্গের অভাবে তন্মাত্রসর্গ—ভূতভৌতিক পদার্থের কোনপ্রকারেই উপযোগিতা নাই; আবার তন্মাত্রসর্গ না থাকিলেও প্রত্যয়-সর্গের কোনপ্রকার প্রয়োজন দেখা যায় না; এইজন্য ঐ দ্বিবিধ সর্গকে পরস্পর সাপেক্ষ বলা হয়।

তুষ্টি। কেবল সন্ন্যাস গ্রহণেও বিবেক-সাক্ষাৎকার হয় না, কালের অপেক্ষা করে; এই ধারণায় যে, চুপ করিয়া থাকা, তাহা 'কাল' নামক তুষ্টি। ভাগ্যে না থাকিলে কিছুতেই বিবেক-সাক্ষাৎকার হয় না, এই বুদ্ধিতে যে, সাধনানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকা, তাহা 'ভাগ্য' নামক তুষ্টি।

[শরীর]

সাংখ্যমতে শরীর তিন প্রকার—এক স্থূল, দ্বিতীয় সূক্ষ্ম, তৃতীয় অধিষ্ঠান বা আতিবাহিক। স্থূল দেহ পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়ভেদে অনেক প্রকার। স্থূলদেহ যেরূপ সূক্ষ্ম দেহের আশ্রয়, তেমনি অধিষ্ঠান দেহও সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রয়। সূক্ষ্ম শরীর এই স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া উক্ত অধিষ্ঠান দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীর কখনও অন্য একটী শরীর অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সূক্ষ্ম দেহটী বিভিন্নপ্রকার স্থূলদেহ গ্রহণ করে, আবার কর্ম্মফলের ভোগশেষে তাহা পরিত্যাগ করে। এইরূপে যে, স্থূল শরীরের গ্রহণ ও পরিত্যাগ, তাহারই নাম—জন্ম ও মরণ। প্রকৃতপক্ষে আত্মার জন্মও নাই, মরণও নাই। দেহাদির জন্মমরণই অবিবেকবশতঃ আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র।

উপরি উক্ত অবিবেকনিবৃত্তির জন্য বিবেকজ্ঞানের আবশ্যক হয়। বিবেকজ্ঞান অর্থ—প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মপদার্থ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া জানা—প্রত্যক্ষ করা। ইহার জন্য যোগ বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধের প্রয়োজন হয়, এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য সাধনেরও আবশ্যক হয়। ফলকথা, বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সাধকের প্রাক্তন কর্ম্মরাশি দগ্ধ বা নির্ব্বীজ হইয়া যায়; সে সকল কর্ম্ম আর জন্মান্তর সম্পাদনে সমর্থ হয় না; অধিকন্তু অবিবেকক্ষয়ে তন্মূলক দুঃখেরও উপশম হইয়া যায়, কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলমাত্র তখন উপভুক্ত হইতে

থাকে। সেই প্রারব্ধক্ষয়ের পর দেহপাত হইলেই আত্মার কৈবল্য বা মোক্ষ অভিব্যক্ত হয়।

[ঈশ্বর]

সাংখ্যমতে মুক্তি বা সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কোনও আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই। মুক্তির জন্য আত্মানাত্ম-বিবেকজ্ঞানই পর্য্যাপ্ত। তাহার জন্য আর ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন হয় না। তাহার পর, সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃতির পরিচালনার্থও ঈশ্বরের আবশ্যক হয় না। কেন না, ঈশ্বর স্বভাবতই রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ; তাঁহা হইতে কখনই সৃষ্টিগত বৈষম্য সমুৎপন্ন হইতে পারে না। বৈষম্যের প্রতি জীবের কর্ম্মই প্রধান কারণ। অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরবাদীকেও জীবকৃত কর্ম্মকেই সৃষ্টিগত বৈষম্যনিষ্পাদনের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে, কর্ম্ম ও ঈশ্বর—দুইটী কারণ কল্পনা না করিয়া সহজতঃ কেবল কর্ম্মকেই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের বিধায়ক প্রধান কারণ কল্পনা করিলে, সকল দিক্ই রক্ষা পাইতে পারে; তদতিরিক্ত অপ্রসিদ্ধ—অসৎকল্প ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না; পক্ষান্তরে, তাহাতে কল্পনা-গৌরবও আর একটী দোষ ঘটে। অতএব প্রকৃতির নিয়ন্তা বা শুভাশুভ কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই; উহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক। ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এখানেই সাংখ্যদর্শনের আলোচনা শেষ করা হইল। অতঃপর পাতঞ্জল দর্শনের বিষয় আলোচিত হইবে।

পাতঞ্জল দর্শন।

(অবতরণিকা)

দর্শনপর্য্যায়ে আলোচ্য পাতঞ্জল দর্শন চতুর্থ স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন যে, এরূপ সন্নিবেশ কল্পিত হইয়াছে, তাহা প্রথম খণ্ডের ভূমিকামধ্যেই বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হইয়াছে; সুতরাং এখানে সে সব কথার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক ও অতৃপ্তিকর হইবে মনে হয়। এইজন্য, যে অভিপ্রায় প্রচারের উদ্দেশ্যে পাতঞ্জলদর্শন আস্তিক-সমাজে আত্মলাভ করিয়াছে; এবং যে সমুদয় বৈশিষ্ট্য থাকায় উহা সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এখানে কেবল সেই সমুদয় বিষয়েরই অবতারণা ও আলোচনা করা হইবে।

যোগ ও যোগবিদ্যা এদেশের অতি পুরাতন সম্পত্তি। স্মরণাতীত কাল হইতে যে, এদেশে যোগবিদ্যা ও যোগচর্চ্চা সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। জগতে যত রকম সাধন-পথ প্রসিদ্ধ বা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে যোগ-পথ সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বিবাদ ও নিষ্কণ্টক। যোগের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; অতি বড় নাস্তিকও যোগ-মহিমা অপলাপ করিতে সাহসী হয় না; কারণ, যোগের ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এদেশের স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রই যোগকথায় পূর্ণ ও যোগমহিমা প্রচারে ব্যস্ত। অধিক কি, বেদে— উপনিষদেও যোগের কথা প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়—

"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়-ধারণাম্।" (কঠ ৬।১১)

"বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্" (কঠ ৬।১৮)
"ব্রহ্মণ্যাভিব্যক্তিকরাণি যোগে" (শ্বেতাশ্বতর ২।১১)
"সর্ব্বভাব-পরিত্যাগো যোগ ইত্যভিধীয়তে" (মৈত্রী উপঃ ৬।২৫)
"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্" (শ্বেতাশ্বতর ২।৮)
"অথাতো যোগঃ" (মহানারায়ণ ১১।১৪) ইত্যাদি।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহে যোগের ও যোগানুষ্ঠান-প্রণালীর স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, বেদান্তে যে, 'নিদিধ্যাসন' (নিদিধ্যাসিতব্যঃ) বিহিত আছে, তাহাও প্রকৃত পক্ষে চিত্তবৃত্তির নিরোধাত্মক যোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং যোগ ও যোগানুশীলন-পদ্ধতি যে, এদেশের অতি প্রাচীন—স্মরণাতীত কাল হইতে প্রবৃত্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সেই প্রাচীনতম যোগ ও যোগানুশীলন-পদ্ধতিকেই লোকের বোধোপযোগী করিয়া আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভ প্রথমে লোকসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন; এই কারণে তাঁহাকেই যোগবিদ্যার প্রথম উপদেশক আচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহারই উপদিষ্ট যোগ-প্রণালী ও শাসনপদ্ধতি অনু-সরণপূর্ব্বক প্রসিদ্ধ যোগদর্শন (পাতঞ্জলদর্শন) প্রণয়ন করিয়াছেন। পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন যে, হিরণ্যগর্ভোক্ত যোগপদ্ধতিরই ছায়া-বলম্বনে বিরচিত, এ কথা স্বয়ং পতঞ্জলিও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যোগদর্শনের প্রারম্ভে "অথ যোগানুশাসনম্" সূত্রে 'অনুশাসন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'অনু' অর্থ—পশ্চাৎ, 'শাসন' অর্থ—উপদেশ।

সুতরাং অনুশাসন কথার অর্থ হইতেছে—পূর্ব্বোপদিষ্ট বিষয়ের পশ্চাৎ শাসন—উপদেশ। 'অনুশাসন পদের এই প্রকার অর্থ ই যে, সূত্রকারের অভিপ্রেত, তাহা মহামতি বাচস্পতি মিশ্রও স্বকীয় টীকায় বিবৃত করিয়াছেন (১)। তাহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য 'যোগদর্শন' চিরন্তন বা সুপ্রাচীন না হইলেও, তদুপদিষ্ট যোগবিজ্ঞান অতিশয় প্রাচীন ও প্রামাণিক। যোগ-দর্শনকার সেই পুরাতন বিষয়টীকেই সময়োপযোগী ব্যবস্থানুসারে লোকের বোধোপযোগী করিয়া সংকলনপূর্ব্বক সুধীসমাজে সূত্রাকারে প্রচার করিয়াছেন।

যোগবিজ্ঞান সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের অনুমোদিত হইলেও, আলোচ্য যোগদর্শন কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রেরই অন্তর্গত বা অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত। তাহার কারণ এই যে, যোগবিজ্ঞান

---

(১) পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার মহামতি বাচস্পতি মিশ্র আশঙ্কা-পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন যে,—"ননু 'হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ' ইতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতেঃ কথং পতঞ্জলের্যোগ-শাস্ত্বত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্য সূত্রকারেণ 'অনুশাসনম্' ইত্যুক্তম্। শিষ্টস্য শাসনম্" (অনুশাসনং) ইতি টীকা (১।১।১৬)।

অর্থাৎ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের বচন হইতে জানা যায় যে, হিরণ্যগর্ভই যোগ-বিদ্যার প্রথম বক্তা বা উপদেষ্টা; সুতরাং পতঞ্জলিকে প্রথম বক্তা বলা যায় কিরূপে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ স্বয়ং সূত্রকারই সূত্রমধ্যে 'অনুশাসন' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অনুশাসন অর্থ—পূর্ব্বোপদিষ্ট বিষয়ের শাসন বা উপদেশ। হিরণ্যগর্ভ যাহার উপদেশ করিয়াছিলেন, পতঞ্জলি তাহারই উপদেশ করিয়াছেন, নূতন কথা বলেন নাই।

অনুষ্ঠানলভ্য; সে অনুষ্ঠান আবার বিষয়-সাপেক্ষ; যোগ-সাধককে প্রথমতঃ স্থূল-সূক্ষ্মাদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ন্যায়াদি দর্শনে যে সমুদয় বিষয় বিন্যস্ত ও বিবৃত হইয়াছে, সে সমুদয় বিষয় তর্কের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইলেও, যোগাভ্যাসের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে; পক্ষান্তরে, সাংখ্যসম্মত তত্ত্বসমূহ অভিপ্রেত যোগসাধনার বিশেষ অনুকূল। কারণ, সাংখ্যশাস্ত্রে স্থূল-সূক্ষ্মাদিতারতম্যক্রমে এমন সুন্দরভাবে তত্ত্বসংকলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, সে সকলের অবলম্বনে অতি সহজে যোগসাধনা সুনিষ্পন্ন হইতে পারে (১); এই কারণে যোগদর্শনকার আপনার দর্শনে সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসকল গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং যোগাভ্যাসের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য সমর্থনপূর্ব্বক তাঁহাকে উচ্চ আসনে সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি নিজে কোথাও আপনার যোগদর্শনকে সাংখ্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া

(১) অভিপ্রায় এই যে, যোগদর্শনের শেষ উদ্দেশ্য—আত্মদর্শন। সেই আত্মা অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম পদার্থ; মনের সাহায্যেই তাহাকে দেখিতে হয়। মন যদি সেই সূক্ষ্ম আত্মার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ইচ্ছা করে, তবে অগ্রে মনকে সূক্ষ্ম চিন্তায় অভ্যস্ত হইতে হয়। সে পক্ষে পরমাণু পর্য্যন্ত চিন্তাও পর্য্যাপ্ত নহে; কারণ, পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ জড় জগতে আরও আছে। এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্র সূক্ষ্মতত্ত্বের সীমারেখা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন—প্রকৃতিতে তাহার শেষ করিয়াছেন। আত্মাকে তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম স্থানে বসাইয়াছেন। কাজেই সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসমূহ যোগ-সাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে।
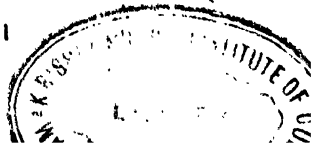
উল্লেখ করেন নাই; অথবা কোথাও সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসমূহেরও পরিগণনা করেন নাই; সুতরাং তৎকৃত যোগদর্শন যে, বস্তুতঃ সাংখ্যসিদ্ধান্তেরই অনুবর্ত্তী, কিংবা অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। যোগশাস্ত্রপ্রবক্তা সুপ্রাচীন বার্ষগণ্য নামক আচার্য্য কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে অদ্বৈতবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্॥" ইতি॥

তাঁহার এই উক্তি আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, দৃশ্যমান জগৎ যে, মায়াময় তুচ্ছ, এ বিষয়ে যোগশাস্ত্র অদ্বৈতবাদী বেদান্তশাস্ত্রের সহিত একমতাবলম্বী। কাজেই, আলোচ্য যোগদর্শন প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কি না, এরূপ সংশয় উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অবশ্য, ব্যাখ্যাতারা প্রায় সকলেই উহাকে 'সাংখ্যপ্রবচন' নামে, কেহ কেহ বা সেশ্বর সাংখ্য নামেও বিশেষিত করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে আমরা এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, বলিয়াছি; অতএব এখানেই একথার শেষ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

[যোগদর্শন]

আলোচ্য যোগদর্শন মহামুনি পতঞ্জলির অপূর্ব্ব কৃতিত্বের ফল; এই জন্য যোগদর্শনের অপর নাম পাতঞ্জল দর্শন। প্রবাদ আছে যে, শেষ নাগ স্বয়ং অনন্তদেব পতঞ্জলি-শরীর পরিগ্রহ

করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন, এবং যোগদর্শন প্রণয়ন করেন। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার স্বয়ং ব্যাসদেব ভাষ্যপ্রারম্ভে যে, মঙ্গলাচরণ শ্লোক রচনা করিয়াছেন; তাহাতে 'অহীশের' নামোল্লেখ আছে। যোগদর্শনের প্রণেতা পতঞ্জলি শেষনাগের অবতার না হইলে, গ্রন্থারম্ভে তাঁহার বন্দনা করা সঙ্গত হইত না; কেন না, গ্রন্থারম্ভে ইষ্টদেবতার ও আচার্য্যের বন্দনা করাই সুধীসম্মত পদ্ধতি। এই সকল কারণে পতঞ্জলিকে শেষনাগের অবতার বলা অসঙ্গত মনে হয় না। যোগদর্শনের উপর ধারেশ্বর ভোজরাজ-কৃত একখানা অনতিবিস্তীর্ণ টীকা আছে, তাহাতে মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে ফণিপতি শেষনাগকেই যোগশাস্ত্রপ্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (১)। পতঞ্জলি যে, যোগদর্শনের রচয়িতা, তদ্বিষয়ে কাহারো মতভেদ নাই; কাজেই উভয় কথার মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত বলিতে হয় যে, পতঞ্জলি ও শেষনাগ—এক অভিন্ন ব্যক্তি। শেষ নাগই পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ হইয়া যোগশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র ও বৈদ্যকশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। পতঞ্জলির রচিত যোগশাস্ত্র—পাতঞ্জল দর্শন, ব্যাকরণ শাস্ত্র—পাণিনিব্যাকরণের মহাভাষ্য, যাহার অপর নাম ফণিভাষ্য; বৈদ্যক গ্রন্থের নাম এখনও অপরিজ্ঞাত।

মহামুনি পতঞ্জলি কোন শুভ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও, তিনি যখন পাণিনীয়

(১) "বাক্‌চেতোবপুষাং মলঃ ফণভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোদ্ধৃতঃ"॥
এই শ্লোকে শেষ নাগকে ব্যাকরণ, যোগ ও বৈদ্যক শাস্ত্রের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ব্যাকরণের উপর ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তখন পাণিনির পরবর্ত্তী কোন এক সময়ে যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

এ কথার উপর এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, পাতঞ্জল দর্শনের উপর যে একটী উপাদেয় ভাষ্যগ্রন্থ আছে, ঐ ভাষ্যগ্রন্থের রচয়িতার নাম ব্যাস। সেই ব্যাস স্বয়ং বেদব্যাস কি অপর কেহ, সে কথা কেহ প্রকাশ করিয়া না বলিলেও, ঐ ব্যাস যে, বেদব্যাস ভিন্ন অপর কেহ নহেন, প্রায় সকলেই সমানভাবে সে ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র সে ধারণাকে আরও অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। তিনি ব্যাসভাষ্যের টীকা করিতে যাইয়া নমস্কার-শ্লোকে বেদব্যাসকেই পাতঞ্জলভাষ্যের রচয়িতা বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। এখন দেখিতে হইবে যে, বেদব্যাস যখন পাণিনিরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং পতঞ্জলি যখন পাণিনিরও পরবর্ত্তী, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী বেদব্যাসদ্বারা বহু পরভবিক যোগদর্শনের ব্যাখ্যা রচনা করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তাহার পর, এখানে যে বেদব্যাসের কথা হইতেছে, সেই বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন) রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের রচনা যে, মহাভারতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা ভগবদ্গীতার—

"ব্রহ্মসূত্র-পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ"

---

(১) "নত্বা পতঞ্জলিমৃষিং বেদব্যাসেন ভাষিতে।
সংক্ষিপ্ত-স্পষ্টবহ্বর্থা ভাষ্যে ব্যাখ্যা বিধাস্যতে।"
(বাচস্পতিকৃত ভাষ্যটীকা)

এই 'ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ' কথা হইতে জানিতে পারা যায়। অথচ সেই ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্যমত খণ্ডনের পর "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" সূত্রে বেদব্যাসকে যোগমতও খণ্ডন করিতে দেখা যায়। এই 'যোগ' শব্দে যে, পাতঞ্জলোক্ত যোগমতকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাও আচার্য্যগণের বচনভঙ্গী হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এখানেও পূর্ব্ববর্ত্তী বেদান্তদর্শনে ভাবয্যতের গর্ভগত যোগদর্শনের উল্লেখ থাকা বিশেষ বিস্ময়কর মনে হয়। এই সমুদয় অসামঞ্জস্য দর্শনে কেহ কেহ মনে করেন যে, যোগদর্শন-প্রণেতা পতঞ্জলি, আর ব্যাকরণভাষ্য-রচয়িতা পতঞ্জলি একই ব্যক্তি নহেন; উঁহারা বিভিন্ন কালবর্ত্তী পৃথক্ লোক। আর যাঁহারা একই পতঞ্জলিকে উভয় গ্রন্থের রচয়িতা মনে করেন, তাহারা বলেন,—বেদব্যাস যখন অমর—চিরজীবী, এমন কি, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গেও তাঁহার কথোপকথনের প্রমাণ পাওয়া যায় (১), তখন তাঁহার পক্ষে পাণিনির পরবর্ত্তী পতঞ্জলির যোগদর্শনের উপর ভাষ্যরচনা করা একটা অসম্ভব ঘটনা হইতে পারে না। আর ব্রহ্মসূত্রে যে, যোগমত-খণ্ডনের কথা আছে, তাহাও সেই মূলভূত হিরণ্যগর্ভোক্ত কিংবা ভগবান্ বার্ষগণ্য-প্রোক্ত যোগমতের কথা;

---

(১) এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যে সময় কাশীধামে অবস্থানপূর্ব্বক বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করেন, সেই সময় একদা বেদব্যাস বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে, তৎকৃত 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' সূত্রের ব্যাখ্যা লইয়া বিচার করেন। সেই বিচারের ফলে, শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রে ভাষ্যের মধ্যে বেদব্যাস-সম্মত ব্যাখ্যাও সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু পতঞ্জলিকৃত যোগের কথা নহে। আমরা এই শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই আমাদের বক্তব্য নির্দ্দেশ করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যোগদর্শন মহামুনি পতঞ্জলির প্রণীত; এবং পতঞ্জলি যে, কে ছিলেন, এবং কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাও এক প্রকার বলাই হইয়াছে। পতঞ্জলি-প্রণীত বলিয়া যোগদর্শনের অপর নাম পাতঞ্জলদর্শন। পাতঞ্জলদর্শন চারি পাদে বিভক্ত এবং ১৯৫টী সূত্রে পরিসমাপ্ত। প্রথম সমাধিপাদ, দ্বিতীয় সাধনপাদ, তৃতীয় বিভূতিপাদ, চতুর্থ কৈবল্যপাদ। পাদগুলির নামকরণ হইতেই তত্তৎপাদের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে পারা যায়। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রত্যেক পাদের পরিশেষে এক একটী শ্লোকে সেই সেই পাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সঙ্কলন করিয়া অধ্যেতৃবর্গের বিশেষরূপে বোধসৌকর্য্য সাধন করিয়া দিয়াছেন (১)। তদনুসারে বিষয় বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয়,—

---

(১) বাচস্পতি মিশ্র কৃত শ্লোকগুলি এই—

"যোগস্যোদ্দেশ-নির্দ্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণম।
যোগোপায়াঃ প্রভেদাশ্চ পাদেঽস্মিন্ পবর্ণিতাঃ॥"

"ক্রিয়াযোগং জগৌ ক্লেশান্ বিপাকান্ কর্ম্মণামিহ।
তদ্দুঃখত্বং তথা ব্যূহান্ পাদে যোগস্য পঞ্চকম্॥"

"অত্রান্তরঙ্গান্যঙ্গানি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ।
সংযমাদ্ ভূতিসংযোগঃ তাসু জ্ঞানং বিবেকজম্॥"

"মুক্ত্যর্হচিত্তং পরলোকমেয়-স্ত-সিদ্ধয়ো ধর্ম্মঘনঃ সমাধিঃ।
দ্বয়ী চ মুক্তিঃ প্রতিপাদিতাস্মিন্ পাদে প্রসঙ্গাদপি চান্যদুক্তম্॥"

প্রথম পাদের বিষয়—যোগ, যোগলক্ষণ, চিত্তবৃত্তিভেদ ও তাহার লক্ষণ, যোগসিদ্ধির উপায় ও প্রকারভেদ। দ্বিতীয় পাদের বিষয়—ক্রিয়াযোগ, ক্লেশপঞ্চক, কর্ম্মবিপাক (কর্ম্মফল) ও তাহার দুঃখ-রূপতা, এবং হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায়, এই ব্যূহ চতুষ্টয়। তৃতীয় পাদের বিষয়—যোগের অন্তরঙ্গ সাধন, পরিণাম, সংযমের ফল—বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যবিশেষ প্রাপ্তি এবং বিবেকজ্ঞান। চতুর্থ পাদের বিষয়—মুক্তিযোগ্য চিত্ত, পরলোক-সত্তা, বাহ্য পদার্থের সত্তাবস্থাপন, চিত্তাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব-সাধন, ধর্ম্মমেঘ সমাধি, জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, এবং প্রকৃতির আপূরণাদি কথা। বলা বাহুল্য যে, এতদতিরিক্ত আরও বহুতর বিষয় উক্ত পাদচতুষ্টয়ে অপ্রধান বা গৌণভাবে স্থান লাভ করিয়াছে, সে সব বিষয় আমরা যথাস্থানে ক্রমশঃ বিবৃত করিতে যত্ন করিব।

যোগদর্শনের অনেকগুলি ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে বেদ-ব্যাসের ভাষ্য, বাচস্পতিমিশ্রের টীকা, বিজ্ঞানভিক্ষুর বার্ত্তিক, ভোজরাজকৃত বৃত্তি এবং যোগমণিপ্রভা বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত আছে। ইহা ছাড়া, যোগশিখা ও যোগতারাবলী প্রভৃতি আরও অনেকগুলি প্রকরণ গ্রন্থ আছে। এখন যোগবিদ্যা ও যোগি-সম্প্রদায় ক্ষীণদশাপ্রাপ্ত হওয়ায়, সে সকল গ্রন্থও ক্রমশঃ বিলোপের দিকে অগ্রসর হইতেছে; কোন কোন গ্রন্থ আবার একে-বারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, মূল যোগদর্শন এখনও অক্ষত শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং উহার ভাষ্য,টীকা

প্রভৃতি এখন পর্য্যন্ত অধীত ও অধ্যাপিত হইতেছে। সূত্রকার পতঞ্জলি—

"অথ যোগানুশাসনম্॥" ১।১।

বলিয়া যোগদর্শন আরম্ভ করিয়াছেন; এবং এই সূত্রেই তিনি আপনার অভিপ্রায় ও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, যোগই যোগদর্শনের মুখ্য বিষয়,—সমস্ত শাস্ত্রটাই যোগ-কথায় পরিপূর্ণ। এ গ্রন্থে এমন কোনও কথা বা প্রসঙ্গ নাই, যাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যোগ বা যোগ-সাধনার সহিত সম্বদ্ধ নহে। নিম্নোদ্ধৃত দ্বিতীয় সূত্রে তাঁহার এই অভিপ্রায় আরও অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। যোগ কি?—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ॥" ১।২॥

চিত্তের বৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ। উক্ত সূত্রে চারিটী শব্দ বিন্যস্ত আছে—যোগ, চিত্ত, বৃত্তি ও নিরোধ। সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, অগ্রে ঐ শব্দগুলির অর্থ জানা আবশ্যক হয়; এইজন্য প্রথমে ঐ সকল শব্দের ভাষ্যসম্মত অর্থ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে,—

'যোগ' শব্দটী 'যুজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যুজ্' ধাতু দুইটী আছে; একটীর অর্থ—সংযোগ বা মিলিত হওয়া, অপরটীর অর্থ—সমাধি (চিত্তের এক প্রকার অবস্থা, যে অবস্থায় চিত্তের বৃত্তিসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া থাকে)। এটী প্রথমোক্ত 'যুজ্' ধাতুর প্রয়োগ নহে; কিন্তু দ্বিতীয় যুজ্ ধাতুরই (যাহার অর্থ—সমাধি, তাহারই) প্রয়োগ; সুতরাং এখানে

'যোগ' অর্থে—সমাধি বুঝিতে হইবে। সূত্রের অপরাপর অংশ ইহারই বিবৃতি বা ব্যাখ্যাস্বরূপ মাত্র। চিত্ত অর্থ—প্রকৃতির সাত্ত্বিক পরিণাম, যাহার অপর নাম বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিতে যে, সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় অসংখ্য পরিস্পন্দন বা চিন্তাধারা নিরন্তর উত্থান-পতনলীলা বিস্তার করিতেছে, তাহারই নাম—বৃত্তি। নিরোধ অর্থ—অবস্থাবিশেষ ; অর্থাৎ যেরূপ অবস্থাবিশেষে উল্লিখিত চিত্তবৃত্তিসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ অবস্থাবিশেষের নাম যোগ। চিত্তের এবংবিধ বৃত্তি-নিরোধ যদিও সকল অবস্থায়ই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে সত্য, তথাপি সে সমস্ত বৃত্তিনিরোধ 'যোগ' সংজ্ঞার অন্তর্ভূত নহে (১) ; কারণ, সেইরূপ বৃত্তিনিরোধই এখানে 'যোগ' কথার অভিপ্রেত অর্থ, যেরূপ নিরোধ নিষ্পন্ন হইলে, অবিদ্যাদি ক্লেশরাশি বিধ্বস্ত হইয়া যায়, বুদ্ধিতে সাত্ত্বিক নির্ম্মল ভাব সমধিক বৃদ্ধিপায়, এবং প্রকৃত নিরোধকে আয়ত্ত করিতে পারাযায়। এই জন্যই

---

(১) ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্ব্বভৌমঃ চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধং চ ইতি চিত্তভূময়ঃ" ইত্যাদি।

অর্থাৎ যোগ অর্থ—সমাধি (চিত্তের নিরোধাবস্থা)। চিত্তের যে, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচপ্রকার ভূমি বা অবস্থা প্রসিদ্ধ আছে ; উহাদের প্রত্যেক অবস্থায়ই অল্পাধিক পরিমাণে বৃত্তিনিরোধ ঘটিয়া থাকে, যেমন—অনুরাগদশায় ক্রোধবৃত্তি নিরুদ্ধ থাকে, আবার ক্রোধকালে অনুরাগবৃত্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, ইত্যাদি। অতএব বৃত্তিনিরোধটা যে, চিত্তের সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সকল অবস্থার বৃত্তিনিরোধকে যোগ বা সমাধি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না।

[যোগ-বিভাগ]

উক্তপ্রকার যোগ বা সমাধি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; এক—সম্প্রজ্ঞাত, অপর—অসম্প্রজ্ঞাত। চিত্তের একাগ্রতাবস্থায় হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, আর পূর্ণ নিরোধাবস্থায় হয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের নিখিল বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না; ধ্যেয়রূপে অবলম্বিত বিষয়ে তখনও চিত্তের চিন্তাবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে; আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে তাহাও থাকে না; সমস্ত বৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অসম্প্রজ্ঞাতের কথা পরে বলা হইবে, এখন সম্প্রজ্ঞাতের কথা বলা যাইতেছে। প্রধানতঃ যে সকল বিষয় অবলম্বনে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সাধনা করিতে হয়, এবং সমাধিদশায় চিত্তের যাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয়, সূত্রকার একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন—

"ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেঃ গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যেষু তৎস্থ-তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ॥" ১।৪১॥

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সাধনার জন্য যোগীকে যথাক্রমে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা, এই তিনপ্রকার বিষয় অবলম্বন করিতে হয়। তন্মধ্যে গ্রাহ্য (বাহ্য বিষয়) দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। গ্রহণ অর্থ—ইন্দ্রিয়বর্গ। গ্রহীতা অর্থ—অস্মিতা (বুদ্ধি ও আত্মার অবিবিক্তভাব)। ধানুষ্ক ব্যক্তি যেমন প্রথমে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম, অনন্তর সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক লক্ষ্যবেধ অভ্যাস করে,

যোগীও ঠিক তদ্রূপ একাগ্রতা শিক্ষার জন্য প্রথমে স্থূল শব্দাদি বিষয় অবলম্বন করেন; পরে সূক্ষ্মভূত পঞ্চ তন্মাত্র অবলম্বন করেন; অনন্তর গ্রহণ-পদবাচ্য চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় অবলম্বন করেন; অতঃপর গ্রহীতাকে অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ 'অস্মিতা'কে অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা সাধনে অগ্রসর হন। একাগ্রতাকালে চিত্তের অবস্থা ঠিক বিশুদ্ধ স্ফটিকমণির ন্যায় হয়। বিমল স্ফটিক যেরূপ সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া নিজেও যেন তদ্রূপই হইয়া যায়, বিষয়ান্তর-চিন্তাশূন্য নির্ম্মল চিত্তও ঠিক সেইরূপই উল্লিখিত গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতাকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে তত্তৎ-বিষয়াকার গ্রহণ করত আপনিও যেন তত্তৎস্বরূপই (তন্ময়ই) হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তখন ধ্যেয় বিষয় ছাড়া চিত্তের আর কোনরূপ পৃথক্ সত্তা প্রতীত হয় না; চিত্ত তখন বিষয়াকারেই পরিচিত হয়। চিত্তের যে, এইভাবে অবলম্বিত বিষয়াকারে অনুরঞ্জিত হওয়া, যোগশাস্ত্রে তাহা 'সমাপত্তি' নামে অভিহিত। 'সমাপত্তি' কেবল সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিনিষ্ঠ চিত্তেরই স্বাভাবিক অবস্থা বা ধর্ম্ম। উল্লিখিত সমাপত্তির বিভাগানুসারে সূত্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেও চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

"বিতর্ক-বিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥" ১।১৭ ॥

অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারিভাগে বিভক্ত—সবিতর্ক, সবি-চার, সানন্দ ও সাস্মিত। তন্মধ্যে বহির্জগতের কোন একটী স্থূলবিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যে, চিত্তের একাগ্রতানুশীলন, তাহার নাম সবিতর্ক সমাধি। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম—তন্মাত্র প্রভৃতি

বিষয় অবলম্বনে যে, চিত্তের একাগ্রতা, অর্থাৎ তজ্জনিত সাক্ষাৎকার, তাহার নাম সবিচার সমাধি। তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়রূপ বিষয় অবলম্বনে যে, চিত্তের একাগ্রতা, তাহার নাম—সানন্দ সমাধি; আর বুদ্ধির সহিত পুরুষের যে অভিন্নতাভ্রান্তিরূপ অস্মিতা, তদবলম্বনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যে, চিত্তের একাগ্রতা, তাহার নাম সাস্মিত সমাধি (১)। এই চতুর্ব্বিধ সমাধিতেই অবলম্বনীভূত বস্তুর তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হওয়া আবশ্যক। যতক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্বের প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ তাহা ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী বিষয় অবলম্বন করিতে নাই।

[অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি]

চিত্তের যেরূপ অবস্থায় ধ্যেয় বিষয়টী প্রকৃষ্টরূপে বিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ চিত্তাবস্থাই 'সম্প্রজ্ঞাত' শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বিষয়ের প্রাধান্য থাকিলেও, ধ্যান,

(১) সবিতর্ক সমাধির অবলম্বন বা ধ্যেয় বিষয়টী স্থূল অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক কোন একটী বস্তু হওয়া আবশ্যক। এইজন্য সবিতর্ক সমাধিকালে যোগিগণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করেন। যতক্ষণ সেই ধ্যেয় বস্তুটীর তত্ত্ব যোগীর হৃদয়-দর্পণে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ সবিতর্ক সমাধি নিষ্পন্ন হইল মনে করিতে নাই। প্রথমে ঐ স্থূল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলে, তাহার পর সবিচারের বিষয় তন্মাত্র অবলম্বন করিবে। তাহা প্রত্যক্ষ হইলে, সানন্দের বিষয়ীভূত ইন্দ্রিয়গণকে অবলম্বন করিবে; অনন্তর অস্মিতা অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বত্রই 'একাগ্রতা' শব্দে বস্তুর সাক্ষাৎকার বুঝিতে হইবে।

ধ্যেয় ও ধ্যাতা, এই তিনই চিন্তাপথে পতিত হয়, সুতরাং তদবস্থায় জ্ঞানকে ঠিক তত্ত্বগ্রাহক বলিতে পারা যায় না, এবং তাহা দ্বারা নিরাবিল আত্মতত্ত্ব-প্রত্যক্ষেরও সম্ভাবনা ঘটে না; যোগীকে সাধন-পথে আরও অগ্রসর হইতে হয়, ক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের জন্য সচেষ্ট হইতে হয়; অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়। এইজন্য সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও তদধিগমের উপায় নির্দ্দেশপূর্ব্বক সূত্রকার বলিতেছেন—

"বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥" ১।১৮ ॥

বিরাম অর্থ—সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালীন চিন্তার পরিত্যাগ, অথবা নিখিল চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব। প্রত্যয় অর্থ—কারণ—পর-বৈরাগ্য। অভ্যাস অর্থ—একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন। পূর্ব্ব অর্থ—পূর্ব্ববর্ত্তী—কারণ। সংস্কারশেষ অর্থ—সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত জ্ঞানসংস্কার মাত্র যে অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে সেই অবস্থাবিশেষ। অন্য অর্থ—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এ সকল কথার সম্মিলিত অর্থ এই যে, বিরামের কারণীভূত পর-বৈরাগ্যের অভ্যাস হইতে যাহার জন্ম, এবং যাহাতে কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, কোনরূপ চিত্তবৃত্তিই থাকে না, তাহাই অন্য, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত হইতে ভিন্ন—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

অভিপ্রায় এই যে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন চিত্তমধ্যে ধ্যেয়বিষয়ক বিবিধ বৃত্তি বা চিন্তা বিদ্যমান থাকিয়া, প্রতিনিয়ত অনুরূপ সংস্কার-ধারা সমুৎপাদন করিতে থাকে, অসম্প্রজ্ঞাত

সমাধিতে সে রকম কোন বৃত্তিই থাকে না; হৃদয়মধ্যে পুনঃ পুনঃ 'পর-বৈরাগ্যে'র অনুশীলন করিতে করিতে সমস্ত চিন্তাবৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া যায়; তখন থাকে কেবল পূর্ব্বতন সংস্কারমাত্র। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন প্রকার চিন্তনীয় বিষয় না থাকায় চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, কেবল পূর্ব্বতন সংস্কার সকল তখনও চিত্তদেশকে অধিকার করিয়া থাকে; কিন্তু সে সকল সংস্কার চিত্তে বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন প্রকার স্মৃতি সমুৎপাদন করে না। ক্রমে সেই সমুদয় সংস্কারও দীর্ঘকাল কোন উদ্বোধক (স্মৃতিজনক সামগ্রী) না পাইয়া বিলীন হইয়া যায়। এইজন্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নিরোধ-সমাধি ও নির্বীজ সমাধি নামে অভিহিত করা হয়।

যোগীর চিত্তগত অবস্থার তারতম্য এবং আলম্বন বিষয়ের উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে উক্ত নিরোধসমাধি আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এক ভবপ্রত্যয়, অপর উপায়প্রত্যয়। তন্মধ্যে, যাহারা প্রকৃতি, মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মা মনে করিয়া তদ্বিষয়েই নিরোধ সমাধি সাধনা করেন, তাহাদের সমাধিতে অবিদ্যা বা ভ্রান্তিজ্ঞান বিদ্যমান থাকায়, ঐরূপ সমাধিদ্বারা তাহারা কখনও কৈবল্য লাভে সমর্থ হন না, পরন্তু দেবত্বার প্রাপ্ত হইয়া কিংবা প্রকৃতিপ্রভৃতিতে প্রবেশপূর্ব্বক দীর্ঘকাল বিরতব্যাপার হইয়া যেন কৈবল্য পদই অনুভব করিতে থাকেন। নিয়মিত সময় সমাপ্ত হইলে পর তাহারা প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করেন। তাহাদের সমাধি

অবিদ্যাপূর্ব্বক হওয়ায় 'ভবপ্রত্যয়' নামে অভিহিত হয়; আর যাহারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়ভূত শ্রদ্ধা, বীর্য্য, (উৎসাহ), স্মৃতি ও যোগাঙ্গ সমাধির সাহায্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্পাদন করেন, তাহাদের সমাধির নাম 'উপায়প্রত্যয়'; কারণ, তাঁহাদের অবলম্বিত সাধনগুলি বস্তুতই যোগসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়।

কথিত সমাধিযোগ ভবপ্রত্যয়ই হউক, আর উপায়-প্রত্যয়ই হউক, সর্ব্বত্রই চিত্তবৃত্তির নিরোধ থাকা আবশ্যক। কারণ, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইহাই সমাধির সাধারণ লক্ষণ। এ লক্ষণের বহির্ভূত কোন 'যোগ' নাই বা থাকিতে পারে না; সুতরাং চিত্তবৃত্তি-নিরোধই সমস্ত যোগের জীবন। দীর্ঘকালব্যাপী দৃঢ়তর অভ্যাস দ্বারা এই বৃত্তিনিরোধ যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,—চিত্তভূমিতে আর কোন প্রকার বৃত্তি-উদ্ভূত না হয়, পূর্ণ অসম্প্রজ্ঞাতই সমাধির আবির্ভাব হয়,—

" তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্॥ " ১।৩॥

তখন—সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ণতাদশায় দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশক পুরুষ (আত্মা) আপনার স্বরূপে অবস্থান করে, অর্থাৎ তখন কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। আর তদ্ভিন্ন সময়ে—

"বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।" ১।৪॥

অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরহিত অবস্থায় পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়াও প্রকাশ পায় না, বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ চিত্তেতে যখন যেরূপ বৃত্তি উপস্থিত হয়, নির্ব্বিকার পুরুষও তখন সুতরাং উহা সকলেরই প্রার্থনীয় অতি রমণীয় অবস্থা। ঐ

সেই সেই বৃত্তির সমান আকারে পরিচিত হয়; তখন তাহার প্রকৃতস্বরূপ আর প্রতীতির বিষয় হয় না; গৃহীত বিষয়ের আকারই প্রধানতঃ প্রতিভাত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, প্রকাশস্বভাব পুরুষ দ্রষ্টা হইয়াও চিত্তবৃত্তি ভিন্ন অপর কোন বস্তুই দর্শন করে না। চিত্তবৃত্তিই তাহার একমাত্র দৃশ্য—বাহ্য বা আন্তর অপর বিষয়রাশি যতক্ষণ চিত্তবৃত্তির বিষয় না হয়, ততক্ষণ কোন মতেই পুরুষ সে সকল বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। চিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত বস্তুগুলি বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সন্নিহিত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার ফলে, মুগ্ধ পুরুষ ঐ সমুদয় বৃত্তি হইতে আপনার পার্থক্য বুঝিতে না পারিযা আপনাকে তন্ময় মনে করে। এই যে, চিত্তবৃত্তির সহিত পুরুষের পার্থক্যপ্রতীতির অভাব, ইহাই প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বৃত্তিসারূপ্যের ফল; এতদ্ব্যতীত নির্ব্বিকার পুরুষের অন্যপ্রকার সারূপ্যলাভ সম্ভবপর হয় না। তাহার পর দীর্ঘকালব্যাপী দৃঢ়তর অভ্যাস বলে যখন চিত্তের সমস্ত বৃত্তি—অধিক কি প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকখ্যাতিও (ভেদসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত) নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্পূর্ণরূপে সুনিষ্পন্ন হয়, তখন কোন প্রকার বৃত্তি না থাকায় পুরুষের আর বৃত্তিসারূপ্য ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং তদবস্থায় চিন্ময় পুরুষ বিমল মণি-দর্পণের ন্যায় আপনার স্বরূপে আপনি অবস্থান করে। এইরূপে স্বরূপাবস্থানেরই নামান্তর—কৈবল্য ও মুক্তি প্রভৃতি।

কৈবল্য-দশায় জীবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের উপশম হয়;

অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে, অগ্রে সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা আবশ্যক হয়; কিন্তু চিত্তবৃত্তির স্বরূপ, সংখ্যা ও স্বভাবাদি বিজ্ঞাত না থাকিলে, তদ্বিষয়ে নিরোধ-চেষ্টা কখনই ফলবতী হইতে পারে না; এই জন্য সূত্রকার পতঞ্জলি ঋষি চিত্তবৃত্তির বিভাগ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ" ॥ ১।৫ ॥

"প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ" ॥১।৬॥

সাগরবক্ষে জায়মান তরঙ্গমালার ন্যায় মানবের চিত্তমধ্যে নিরন্তর যে সমুদয় স্পন্দন উপস্থিত হয়, সেই সকল স্পন্দনের সাধারণ নাম বৃত্তি। সেই বৃত্তিধারা অনন্ত—অসংখ্য হইলেও, কার্য্যতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত—প্রথম প্রমাণ, দ্বিতীয় বিপর্য্যয়, তৃতীয় বিকল্প, চতুর্থ নিদ্রা, পঞ্চম স্মৃতি। উক্ত পাঁচপ্রকার বৃত্তির প্রত্যেকেই আবার ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্টরূপে দ্বিবিধ। যে সকল চিত্তবৃত্তি জীবের ক্লেশ সমুৎপাদক, সেই সকল ক্লিষ্ট, আর যে সমুদয় বৃত্তি তদ্বিপরীত, সেইগুলি অক্লিষ্ট। জগতে সে রকম চিত্তবৃত্তি কখনও সম্ভবপর হয় না, যাহার সহিত অতি অল্প পরিমাণেও জীবগণের সুখ-দুঃখসম্বন্ধ বিজড়িত না আছে; কাজেই সূত্রকারের উক্ত 'ক্লিষ্ট' 'অক্লিষ্ট' বিভাগ অসঙ্গত হয় নাই। উল্লিখিত পাঁচপ্রকার বৃত্তির মধ্যে—

"প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি" ॥ ১।৭ ॥

প্রমাণবৃত্তি তিন প্রকার—প্রথম প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় অনুমান, তৃতীয় আগম বা শব্দ। সাংখ্যের ন্যায় পাতঞ্জলও ঐ তিনের অধিক

প্রমাণসংখ্যা স্বীকার করেন না, এবং আবশ্যকও মনে করেন না। উক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের পরিচয় এইরূপ—(১) প্রত্যেক বস্তুতেই দুই প্রকার ধর্ম্ম আছে। একটী সামান্য ধর্ম্ম, আর একটী বিশেষ ধর্ম্ম—যেমন ঘটের সামান্য ধর্ম্ম—ঘটত্ব, আর বিশেষ ধর্ম্ম—পার্থিবত্ব ও তৈজসত্ব প্রভৃতি। তন্মধ্যে বিশেষ ধর্ম্মটী গ্রহণ করাই যে প্রমাণবৃত্তির প্রধান কার্য্য, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। আর অনুমেয় পদার্থের তুল্যজাতীয় পদার্থে বিদ্যমান, অথচ ভিন্নজাতীয় পদার্থে অবিদ্যমান, এরূপ হেতু দ্বারা যে, বস্তুর কেবল সামান্য ধর্ম্মমাত্রের গ্রহণ (চিত্তবৃত্তি), তাহার নাম অনুমান। তাহার পর, ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি দোষরহিত—আপ্ত পুরুষ প্রত্যক্ষ করিয়া, কিংবা তাদৃশ লোকের উক্তি শ্রবণ করিয়া অথবা নিজে অনুমান করিয়া যে বিষয় অবগত হইয়াছেন, সেই বিষয়টী সেই ভাবেই অপরকে বুঝাইবার জন্য, যে শব্দ-প্রয়োগ করেন (উপদেশ করেন), তাদৃশ শব্দশ্রবণজনিত যে বৃত্তি, তাহার নাম আগম (২)। দ্বিতীয় চিত্তবৃত্তির নাম—বিপর্য্যয়। বিপর্য্যয় কি ?

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥" ১৮ ॥

---

(১) প্রমাণ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সাংখ্যদর্শনের আলোচনা স্থলে দ্রষ্টব্য।

(২) যে শব্দের বক্তা বক্তব্য বিষয়টী নিজে প্রত্যক্ষও করে নাই, এবং অনুমান দ্বারাও জানে নাই, সেই বক্তা যদি তাদৃশ বিষয়টী অপরকে বুঝাইবার জন্য শব্দপ্রয়োগ করেন, সেই শব্দ প্রমাণ হইবে না। আর বক্তা বিজ্ঞাতার্থ হইয়াও যদি প্রতারণাভিপ্রায়ে এমনভাবে শব্দপ্রয়োগ করে, যাহাতে শ্রোতা বক্তার মনের ভাব না বুঝিয়া অন্য ভাব বুঝিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সেই শব্দও আগম প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। যেমন—"অশ্বত্থামা হতঃ" এই বাক্য।

বিপর্য্যয় অর্থ—মিথ্যাজ্ঞান,—যাহা বিজ্ঞাত বিষয়ে একরূপে থাকে না। অভিপ্রায় এই যে, প্রথম প্রতীতিকালে যে বস্তু যেরূপ আকারে প্রকাশ পায়, পরিণামে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সেই আকার যদি অন্যপ্রকারে প্রতিপন্ন হয়, সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জ্ঞানও যদি বাধিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্য্যয় বা ভ্রম বলা হয়। বিপর্য্যয়ের অপর নাম অবিদ্যা ও অজ্ঞান প্রভৃতি (১)। বিপর্য্যয়ের উদাহরণ—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ও শুক্তিতে রজতজ্ঞান প্রভৃতি। এ সকল স্থলে প্রথমতঃ সর্পের ও রজতের জ্ঞান হয়, পরে প্রমাণদ্বারা উক্ত বিষয় দুইটী—সর্প ও রজত বাধিত হয়, অর্থাৎ মিথ্যা বা অসত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়; সুতরাং জ্ঞান প্রথমে যে আকার গ্রহণ করিয়াছিল, পরিণামে সে আকার (সর্প ও রজত) স্থির থাকে না; কাজেই ঐ প্রকার জ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলা যাইতে পারে। সংশয়াত্মক জ্ঞানও উক্ত বিপর্য্যয়েরই অন্তর্গত; কারণ, সংশয়স্থলেও বিজ্ঞাত বিষয়টীর আকার একপ্রকার থাকে না; এই কারণে সংশয় ও বিপর্য্যয়, উভয়ই অপ্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রকার চিত্তবৃত্তির নাম বিকল্প—

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" ।৯॥

---

(১) বিষ্ণুপুরাণে উক্ত অবিদ্যার পাঁচপ্রকার বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। যথা— "তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞকঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।"

উক্ত তমঃ প্রভৃতিরও আবার অবান্তর বিভাগ অনেক আছে, সাংখ্য-কারিকায় সে সকল বিভাগের নাম উক্ত আছে।

শব্দানুরূপ পদার্থ না থাকিলেও, কেবল শব্দশ্রবণের পর যে, এক প্রকার প্রতীতি হয়, তাহার নাম বিকল্পবৃত্তি। বিকল্পবৃত্তি স্থলে শব্দমাত্র থাকে, কিন্তু সেই শব্দপ্রতিপাদ্য তাদৃশ কোন অর্থ বা বস্তু থাকে না; অথচ ঐ শব্দ শ্রবণমাত্রেই লোকে তৎকালোচিত একটা কিছু বুঝিয়া থাকে. এবং তদনুরূপ ব্যবহারও করিয়া থাকে। যেমন—'অশ্বডিম্ব' 'আত্মার চৈতন্য' ইত্যাদি। অশ্বডিম্ব জগতে অপ্রসিদ্ধ; কিন্তু ব্যবহারক্ষেত্রে 'ইহা ঘোড়ার ডিম, উহা ঘোড়ার ডিম' এরূপ প্রয়োগ প্রায়ই করা হয়। আর সাংখ্যমতে আত্মা ও চৈতন্যের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই—চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ; অথচ পণ্ডিতগণও 'আত্মার চৈতন্য' বলিয়া আত্মা ও চৈতন্যের মধ্যে ভেদব্যবহার করিয়া থাকেন (১)। যাঁহারা বিকল্পবৃত্তির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়বৃত্তির মধ্যেই উহার অন্তর্ভাব করিয়া থাকেন। চতুর্থ আর এক প্রকার বৃত্তি আছে, তাহার নাম নিদ্রা। নিদ্রা বৃত্তি কি?—

"অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥" ১।১০ ॥

চিত্তে তমোগুণ প্রবল হইলে, যথাসম্ভব জাগরণে ইন্দ্রিয়বৃত্তির

---

(১) পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়ের সহিত বিকল্পবৃত্তির প্রভেদ এই যে, বিপর্য্যয় যখন ধরা পড়ে, তখনই তাহার ব্যবহার নিবৃত্ত হইয়া যায়; কিন্তু বিকল্পবৃত্তিস্থলে সেরূপ হয় না; যাহারা জানেন, জগতে ঘোড়ার ডিম নাই, এবং আত্মা হইতে চৈতন্য পৃথক্ নহে, তাহারাও স্বচ্ছন্দচিত্তে ঐ সকল শব্দ লইয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং শ্রোতারাও তদনুসারে একটা কিছু বুঝিয়া থাকে।

ও স্বপ্নসময়ে মনোবৃত্তির অভাব ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তমোগুণই ঐ উভয়প্রকার চিত্তবৃত্তি-বিলোপের কারণ; সেই তমোগুণকে অবলম্বন করিয়া চিত্তের যে, একপ্রকার বৃত্তি উপস্থিত হয় (সুষুপ্তি অবস্থা হয়), তাহার নাম নিদ্রাবৃত্তি। অভিপ্রায় এই যে, যে অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত বৃত্তি এবং পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী সমস্ত মনোবৃত্তি (স্বপ্নবৃত্তি) কিছুই না থাকে, সেই অবস্থা-বিশেষের নাম নিদ্রা। নিদ্রা অর্থ—সুষুপ্তি। সুষুপ্তি সময়েও যে, চিত্তের বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা সুপ্তোত্থিত পুরুষের 'আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই' ইত্যাকার স্মৃতি হইতে অনুমিত হয় (১)। পঞ্চম চিত্তবৃত্তির নাম স্মৃতি। তাহার লক্ষণ—

"অনুভূত-বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥" ১।১১ ॥

সাধারণতঃ অনুভবের বিষয় দুই প্রকার—চিত্তবৃত্তি ও বৃত্তি-গৃহীত বিষয় (ঘটপটাদি)। যেরূপ চিত্তবৃত্তিতে ঐ দুইটী বিষয়ের

---

(১) সুষুপ্তি-ভঙ্গের পর যে, 'সুখমহম্ অস্বাপ্সং, ন কিঞ্চিদবেদিষম্' এই প্রকারে সুখানুভূতি ও অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, তাহা নিশ্চয়ই স্মৃতি-জ্ঞান। স্মৃতিমাত্রই অনুভবপূর্ব্বক; অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত বিষয়েই স্মরণ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যে, ঐ প্রকার সুখানুভূতি ও অজ্ঞানের স্মৃতি, তাহা নিশ্চয়ই অনুভবপূর্ব্বক, অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে ঐ উভয় বিষয়ে চিত্তের বৃত্তি হইয়াছিল বলিয়াই এখন তদ্বিষয়ে স্মৃতি হইতেছে। এই জাতীয় স্মরণ হইতেই সুষুপ্তি সময়ে চিত্ত-বৃত্তির অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

অপহরণ বা পরিত্যাগ না হয়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম স্মৃতি। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও নিদ্রাবৃত্তি দ্বারা যে সমুদয় বিষয় প্রাকৃত লোকের অনুভবগোচর হয়, পূর্ব্ব-সংস্কারসম্পন্ন চিত্তে পুনরায় সমুৎপন্ন বৃত্তিসমূহ যদি সেই সমুদয় বিষয়ের অতিরিক্ত কোন বিষয় গ্রহণ না করে, অর্থাৎ যথাসম্ভব সেই সমুদয় বিষয়ই গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহাকে স্মৃতি-নামক চিত্তবৃত্তি বলে। সূত্রে 'অসম্প্রমোষ' শব্দপ্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, পুত্র যেমন নিজ পিতার ধন সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিলে চৌর্য্যদোষে দূষিত হয় না, তেমনি স্মৃতিরূপ চিত্ত-বৃত্তিও যদি নিজের পিতৃস্থানীয় (জনক) অনুভবের অধিকৃত বিষয়ের সমস্তটা বা অংশবিশেষ গ্রহণ করে, তবে তাহাও তাহার পক্ষে চৌর্য্যবৃত্তি হয় না, অসম্প্রমোষই হয়; পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিলেই চৌর্য্যদোষ ঘটে। ইহা হইতে জানা গেল যে, স্মৃতিতে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অতিরিক্ত কোন বিষয়ই গৃহীত হয় না ও হইতে পারে না (১)।

উপরে, যে পাঁচপ্রকার চিত্তবৃত্তির কথা বলা হইল, পাতঞ্জল-

---

(১) প্রত্যভিজ্ঞা নামে আর একপ্রকার জ্ঞান (চিত্তবৃত্তি) আছে। যেমন—"সোঽয়ং দেবদত্তঃ" অর্থাৎ এই সেই দেবদত্ত নামক ব্যক্তি। এখানে 'অয়ং' অংশে জ্ঞান—প্রত্যক্ষ, আর 'সঃ' অংশে—পরোক্ষ—স্মৃতি। এইজন্য উহা কেবলই প্রত্যক্ষ বা কেবলই অনুভবের অন্তর্গত নহে; পরন্তু উভয়মিশ্রিত; এইজন্যই প্রত্যভিজ্ঞাকে পৃথক্ চিত্তবৃত্তি বলিয়া গণনা করা হইল না।

মতে তদতিরিক্ত আর কোনপ্রকার চিত্তবৃত্তি সম্ভবপর হয় না; সমস্তই এই পাঁচপ্রকারের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত পাঁচপ্রকার বৃত্তিই আবার রাগ, দ্বেষ, মোহানুবিদ্ধ; সুতরাং ক্লেশকর। সুখ ও সুখ-সাধন বস্তুতে রাগ (অনুরাগ), দুঃখ ও দুঃখসাধন বিষয়ে দ্বেষ (অনিষ্টবোধ) হইয়া থাকে; আর মোহ অর্থ—অবিদ্যা। মুমুক্ষু পুরুষকে উল্লিখিত সমস্ত বৃত্তিরই নিরোধ করিতে হইবে। সেই নিরোধের ফলে প্রথমে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, এবং পরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নিষ্পন্ন হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, কথিত চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে চিরাভ্যস্ত দুর্নিবার বৃত্তি-সমূহ নিরুদ্ধ করা যাইতে পারে? তদুত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন—

"অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥" ১।১২ ॥

অভ্যাস অর্থাৎ পৌনঃপুনিক চেষ্টা ও বৈরাগ্য দ্বারা সেই সমুদয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

অভিপ্রায় এই যে, প্রসিদ্ধ নদীর জলরাশি যেরূপ একই দিকে একই ভাবে প্রবাহিত হয়, চিত্ত-নদীর বৃত্তিস্রোতঃ সেরূপ-ভাবে প্রবাহিত হয় না। উভয়দিকেই সমানভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। উহার একদিকে প্রবৃত্তিমার্গ, অপরদিকে নিবৃত্তিমার্গ। তন্মধ্যে প্রবৃত্তিপথে প্রবর্ত্তমান বৃত্তিস্রোতঃ 'ঘোর'—অকল্যাণকর, আর নিবৃত্তিপথে প্রবর্ত্তমান বৃত্তিস্রোতঃ পরম কল্যাণকর। যোগী পুরুষকে প্রথমতঃ বিষয়বৈরাগ্য দ্বারা প্রবৃত্তিপথে প্রবর্ত্তমান

বৃত্তিস্রোতটী নিরুদ্ধ করিতে হয়, পরে নিরোধের পুনঃপুনঃ অনু-শীলনের সাহায্যে নিবৃত্তিপথটী উদ্দীপিত করিতে হয়। এইরূপ চেষ্টার ফলে প্রবৃত্তিস্রোতঃ যতই প্রতিরুদ্ধ হইতে থাকে, দ্বিতীয় স্রোতটী প্রবল হইয়া যোগী পুরুষকে ততই কৈবল্যের দিকে অগ্রসর করিতে থাকে। এখানে চিত্তবৃত্তি নিরোধের পক্ষে অভ্যাস ও বৈরাগ্য, উভয়কেই সম্মিলিতভাবে কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের বিকল্প—হয় অভ্যাস দ্বারা, না হয় বৈরাগ্য দ্বারা, এরূপ বলা হয় নাই। অতএব চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য উভয়কেই তুল্যরূপে গ্রহণ করিতে হয় (১)। তন্মধ্যে—অভ্যাস কাহাকে বলে?—

"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥" ১।১৩ ॥

চিত্তের স্থিরতাসম্পাদনার্থ যে, যম নিয়মাদি সাধন সম্পাদন বিষয়ে যত্ন অর্থাৎ পৌনঃপুনিক চেষ্টা, তাহার নাম অভ্যাস। অভিপ্রায় এই যে, চিত্তের রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিপ্রবাহ প্রবল থাকিলে সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলি স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এবং চিত্তমধ্যে মোহ ও বিক্ষেপের প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে। যতদিন রাজস ও তামস বৃত্তির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিন

---

(১) ভগবদ্গীতায়ও উভয়ের সমুচ্চয় কথিত হইয়াছে,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥"

অর্থাৎ মনঃ স্বভাবতঃ চঞ্চল ও দুর্নিগ্রহ হইলেও অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহার নিগ্রহ করা যাইতে পারে।

চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা একেবারেই সম্ভব হয় না; সুতরাং যোগসিদ্ধিরও সম্ভব থাকে না; এইজন্য যোগাভিলাষী পুরুষকে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনের জন্য (স্থিতৌ) উৎসাহসহকারে দীর্ঘকাল অবিচ্ছেদে বক্ষ্যমাণ যম-নিয়মাদি সাধনসমূহের অনুশীলন করিতে হয়। সেইরূপ নিরন্তর যত্নের ফলে চিত্তের রাজস ও তামস বৃত্তিনিচয় ক্রমশঃ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয় এবং সাত্ত্বিক বৃত্তিধারা প্রবাহিত হয়। এই প্রকার প্রযত্নকেই এখানে 'অভ্যাস' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আদর ও উৎকর্ষবুদ্ধিসহকারে দীর্ঘ-কালব্যাপী নিরন্তর আরাধনা করিলে যথোক্ত অভ্যাস দৃঢ়তর হয়, নচেৎ রাজস তামস বৃত্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া পূর্ব্বসঞ্চিত সাত্ত্বিক প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যেরও পূর্ণমাত্রায় অনুশীলন করিতে হয়। বিষয়-বৈরাগ্য ব্যতীত শুদ্ধ অভ্যাস কখনও স্থিরপদ হইতে পারে না। এইজন্য অভ্যাসের সঙ্গে বৈরাগ্যের অনুশীলন করিতে হয়। বৈরাগ্য কি?—

"দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্॥" ১।১৫॥

আমাদের ভোগ্য বিষয় দুই প্রকার। এক দৃষ্ট, অপর আনুশ্রবিক। 'দৃষ্ট' অর্থ—প্রত্যক্ষসিদ্ধ—ঐহিক; আর 'আনু-শ্রবিক' অর্থ—যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল আগমমাত্রগম্য—পারলৌকিক। যেমন স্বর্গাদি বিষয় (১)। উক্ত উভয়বিধ বিষয়ে

---

(১) স্বর্গ একপ্রকার ভোগস্থান। তাহা কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে; তাদৃশ স্বর্গের অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। কেবল শাস্ত্রগম্য

যে, তৃষ্ণার (ভোগাভিলাষের) অভাব, তাহার নাম বৈরাগ্য। কথিত বৈরাগ্যের আর একটী বিশেষ নাম হইতেছে বশীকার-সংজ্ঞা (১)। 'বশীকারসংজ্ঞা' বৈরাগ্য অপর-বৈরাগ্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট ; ইহা দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির জন্য পর-বৈরাগ্যের আবশ্যক হয়। পর-বৈরাগ্য অর্থ—বৈরাগ্যের চরম সীমা, যাহা দ্বারা প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিষয়মাত্রে বৈতৃষ্ণ্য উপস্থিত হয়। সূত্রকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগু'ণবৈতৃষ্ণ্যম্॥" ১।১৬॥

বলিয়াই স্বর্গ, বিদেহমুক্তি বা প্রকৃতিলয় প্রভৃতি বিষয়গুলি 'আনুশ্রবিক' পদবাচ্য হয়। আনুশ্রবিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ঐরূপ ; "গুরু-মুখাদনুশ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবঃ—বেদঃ ; তত্র প্রাপ্তঃ—জ্ঞাতঃ—আনুশ্রবিকঃ" অর্থাৎ কেবল বেদমাত্রগম্য বিষয়ই আনুশ্রবিক কথার অর্থ।

(১) বৈরাগ্য দুই প্রকার পর-বৈরাগ্য ও অপর-বৈরাগ্য। অপর-বৈরাগ্য আবার চারি প্রকার—প্রথম যতমানসংজ্ঞা, দ্বিতীয় ব্যতিরেক-সংজ্ঞা, তৃতীয় একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা, চতুর্থ বশীকারসংজ্ঞা। সাধারণতঃ অনুরাগ ও বিদ্বেষবশেই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ভোগে ধাবিত হয়, তন্নিবারণার্থ চেষ্টাকে 'যতমানসংজ্ঞা' বলে। অনন্তর, ইন্দ্রিয়গণ যে সকল বিষয় হইতে বিরক্ত হইয়াছে এবং যে সকল বিষয়ে অনুরক্ত আছে, ঐ উভয় প্রকার বিষয়কে বাছিয়া পৃথক্ করার নাম 'ব্যতিরেক সংজ্ঞা'। তাহার পর, ইন্দ্রিয়গণ নিবৃত্ত হইলেও যে, কেবল মনে মনে বিষয় চিন্তা, তাহার নাম 'একেন্দ্রিয়-সংজ্ঞা'। অতঃপর মানসিক ঔৎসুক্যমাত্রেরও যে, নিবৃত্তি, তাহার নাম 'বশীকার সংজ্ঞা'।

প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে চিন্ময় পুরুষের পার্থক্য প্রত্যক্ষ করিলে পর, ত্রিগুণাত্মক সমস্ত বিষয় ভোগে যে, চিত্তের তৃষ্ণার আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহার নাম পর-বৈরাগ্য।

প্রথমতঃ জাগতিক ভোগ্য বিষয় সমূহের অর্জ্জনে, রক্ষণে, ক্ষয়ে ও ভোগে ক্লেশ দর্শন করিয়া প্রথমে তদ্বিষয়ে তৃষ্ণানিবৃত্তি-রূপ অপর-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন মুমুক্ষু পুরুষ শাস্ত্র ও অনুমানাদির সাহায্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর দীর্ঘকাল ঐরূপ অভ্যাসের ফলে রাজস ও তামস বৃত্তিসমূহ অভিভূত এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হইয়া চিত্তকে বিমল মণি-দর্পণের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল প্রকাশসম্পন্ন করিয়া দেয়। তখন স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত পদার্থই সেই বিমল চিত্ত-দর্পণে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়ায় সেই সমুদয় বিষয়ের দোষরাশি প্রত্যক্ষ হইতে থাকে; সুতরাং তখন সহজেই দোষাঘ্রাত সেই সমুদয় বিষয়ে, এমন কি, প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকখ্যাতিতেও (ভেদসাক্ষাৎকারেও) তাঁহার অনুরাগ বিলুপ্ত হইয়া যায়; যোগী তখন তাহা নিরুদ্ধ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভে প্রবৃত্ত হন। এই জন্য পর-বৈরাগ্যকে চিত্তের সত্ত্বোৎকর্ষজাত জ্ঞানপ্রসাদমাত্র বলা হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গেই মুক্তির অবিনাভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ পর-বৈরাগ্যের অভাবে মুক্তির অভাব, পক্ষান্তরে পরবৈরাগ্য সদ্ভাবে মুক্তিরও অবশ্যম্ভাব। এই কারণে মোক্ষাভিলাষী পুরুষকে অপর-বৈরাগ্য দ্বারা পর-বৈরাগ্যলাভে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট থাকিতে হয়।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিসম্পাদনের জন্য যে সকল উপায় বলা

হইয়াছে, এবং পরেও বলা হইবে, কর্ত্তার অধিকারগত তারতম্যানুসারে সে সকলের ফলগত যেমন তারতম্য ঘটে, তেমনি কালগত প্রভেদও যথেষ্ট ঘটিয়া থাকে।

এই অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—

"তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ" ১।২১॥

"মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ।" ১।২২॥

অর্থাৎ সমাধিসাধনে যাহাদের তীব্র আগ্রহ থাকে, তাহাদের পক্ষে সমাধিসিদ্ধি ও তৎফললাভ স্বল্প সময়ে নিষ্পন্ন হয়; আর যাহাদের তাদৃশ তীব্র সংবেগ নাই, তাহাদের পক্ষে বিলম্ব ঘটে; কিন্তু উক্ত তীব্রতার মধ্যেও মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্রভেদে তারতম্যের সম্ভাবনা আছে, তদনুসারে ফললাভেও কালগত যথেষ্ট প্রভেদ সম্ভাবিত হইতে পারে; সেই প্রভেদানুসারে যোগশাস্ত্রে যোগীর বিভাগ নয়প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১)।

[ঈশ্বর]

শীঘ্র সমাধিসিদ্ধির পক্ষে পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস-বৈরাগ্য যেমন বিশেষ অনুকূল উপায়, তেমনি আরও একটী সহজ ও সুগম

---

(১) উপরে লিখিত উপায়ভেদ অনুসারে তদনুষ্ঠানসম্পন্ন যোগীও নয়ভাগে বিভক্ত। তাহার ক্রম এইরূপ:—১। মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র, অধিমাত্রতীব্র; মৃদুমধ্য, মধ্যমধ্য ও অধিমাত্র মধ্য; এইরূপ মৃদুঅধিমাত্র, মধ্য অধিমাত্র ও অধিমাত্র অধিমাত্র। এই নয়প্রকার উপায়ভেদে যোগীরও নয় প্রকার বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মৃদুতীব্র সংবেগবিশিষ্ট যোগীর সমাধি ও তৎফললাভ (কৈবল্যলাভ) আসন্ন, মধ্যতীব্র সংবেগবিশিষ্ট যোগীর আসন্নতর, এবং অধিমাত্র তীব্র সংবেগবিশিষ্ট যোগীর ফললাভ আসন্নতম হইয়া থাকে।

উপায় আছে; যাহার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিলে, যোগীকে সমাধিসিদ্ধির জন্য আর কাহারো সাহায্য লইতে হয় না, সেই উপায়টী হইতেছে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

"ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা ॥" ১।২৩ ॥

দৃঢ়তর অভ্যাস ও বৈরাগ্য যেরূপ সহজে ও স্বল্পকাল মধ্যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করে, একমাত্র ঈশ্বর-প্রণিধানও ঠিক সেইরূপেই শীঘ্র শীঘ্র বৃত্তিনিরোধ সুসম্পন্ন করে। ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থ—ভক্তি-সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা। ভক্তিসহযোগে আরাধনা করিলে ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, এবং অনুগ্রহ করেন—উপাসকের হৃদয়গত সমস্ত পাপমল বিধূত করিয়া যোগ-সিদ্ধির উপযুক্ত অধিকার প্রদান করেন (১)। অতএব যাহারা একান্তচিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাহারা অতি অল্পকালের মধ্যেই অভীষ্ট যোগফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

---

(১) ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥" ১০।১০ ॥

ভাগবতে কথিত আছে—"হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥" উক্ত উভয়স্থলেই ঈশ্বরপরায়ণতার ফলে ঈশ্বরানুগ্রহলাভ ও জ্ঞানযোগে অধিকার প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। অতএব মনে হয়, ঈশ্বরারাধনা যে, চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মক সমাধিসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়, এ বিষয়ে মতভেদ খুব অল্প লোকেরই আছে।

সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব একপ্রকার অস্বীকারই করিয়াছেন; যোগদর্শন যখন সাংখ্যেরই অনুবর্ত্তী অংশবিশেষ, তখন এখানে ঈশ্বরের কথা অনেকটা বিস্ময়কর হইতে পারে সত্য; কিন্তু যোগদর্শনকার এ বিষয়ে সাংখ্যের সম্মান রক্ষা করেন নাই। তিনি দৃঢ়তাসহকারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত না থাকিলে তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ (উপাসনা) করা সম্ভবপর হইতে পারে না; এইজন্য স্বয়ং সূত্রকারই ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবাদি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন—

> "ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ॥" ১২৪॥
> "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ-বীজম্॥" ১।২৫॥

ক্লেশ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। কর্ম্ম দুই প্রকার—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। বিপাক—কর্ম্মফল তিন প্রকার—জন্ম, আয়ুঃ ও সুখ-দুঃখাদি ভোগ। আশয়—বাসনা—পূর্ব্বতন সংস্কার।

সাধারণ জীবগণের ন্যায় আলোচ্য ঈশ্বরও পুরুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সাধারণ জীবপুরুষগণ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সহিত একেবারে সম্বন্ধশূন্য নহে; কোন না কোন সময়ে ক্লেশাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকেই, কিন্তু ঈশ্বরপুরুষ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত,—

ঈশ্বরে ক্লেশ ও কর্ম্মাদি-সম্বন্ধ কখনও ছিল না, সুদূর

ভবিষ্যতেও হইবে না, এবং বর্ত্তমানেও নাই। মুক্ত জীবগণের তৎকালে ক্লেশাদি-সম্পর্ক না থাকিলেও পূর্ব্বে ছিল; আর প্রকৃতিলীন জীবগণের ক্লেশাদি-সম্বন্ধ পূর্ব্ব ও পর উভয় কালেই অক্ষুণ্ণ থাকে; ঈশ্বরে কিন্তু কালত্রয়েই তাহার সম্পূর্ণ অভাব। ইহাই সাধারণ জীবপুরুষ অপেক্ষা ঈশ্বরের বিশেষত্ব; এই বৈশিষ্ট্য সূচনার জন্যই সূত্রমধ্যে ঈশ্বরকে শুধু পুরুষ না বলিয়া 'পুরুষবিশেষ' বলা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া অপরিসীম জ্ঞানশক্তিও জীবসাধারণ হইতে ঈশ্বরের বিশিষ্টতা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ব্যবহার-জগতে জ্ঞানমাত্রেরই ন্যূনাধিকভাব পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানের সেই ন্যূনাধিকভাব ঈশ্বরে পরিসমাপ্ত হইয়া ন্যূনাধিকভাবের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ অনন্তে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেই অপরিসীম জ্ঞান-প্রভাবেই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এইজন্য সূত্রকার তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার বীজভূত জ্ঞানশক্তিকে নিরতিশয় (সর্ব্বাপেক্ষা অধিক) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (১)।

উল্লিখিত সূত্রার্থ হইতে জানা গেল যে, ঈশ্বর স্বরূপতঃ পুরুষ-পদবাচ্য হইলেও, সাধারণ সংসারী বা মুক্তপুরুষ হইতে অত্যন্ত

(১) সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল ধর্ম্ম বা গুণের ন্যূনাধিকভাব দৃষ্ট হয়, নিশ্চয়ই সে সকল ধর্ম্ম বা গুণ কোন একস্থানে নিরতিশয়ভাব (অসীমত্ব) ধারণ করে। যেমন, পরিমাণ একটী ন্যূনাধিকভাবাপন্ন গুণ, আকাশে তাহার নিরতিশয়ভাব দৃষ্ট হয়। ন্যূনাধিকভাবাপন্ন জ্ঞানের সম্বন্ধেও ঐরূপ নিরতিশয়ভাব কল্পনা করা যুক্তিসম্মত হয়; সুতরাং ঈশ্বরীয় জ্ঞানের নিরতিশয়ত্বোক্তি যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

পৃথক্। সাধারণ পুরুষ অবিদ্যাদি ক্লেশের অধীন, শুভাশুভ কর্ম্মজনিত পুণ্য পাপের পরবশ, এবং কর্ম্মানুযায়ী জন্ম, জীবন ও ভোগের ক্রীত দাস, অধিকন্তু পূর্ব্বসঞ্চিত আশয় বা বাসনা দ্বারা নিয়ত পরিচালিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের স্বভাব ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র,—তিনি অনন্ত জ্ঞানের আকর—সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং সেখানে ভ্রান্তিজ্ঞানময় অবিদ্যা ও অবিদ্যামূলক অস্মিতা বা রাগদ্বেষ প্রভৃতি ক্লেশের অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। এই কারণেই পরবর্ত্তী কর্ম্ম, বিপাক ও তদনুকূল আশয়ও তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না; কারণ, উক্ত ক্লেশ-সম্বন্ধই কর্ম্মাদি সম্বন্ধের মূল কারণ (১)। কাজেই যাহাতে ক্লেশ-সম্বন্ধ নাই, কর্ম্মাদির সম্বন্ধও তাহাতে হয় না ও হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর ও সাধারণ জীব স্বরূপতঃ একজাতীয় পদার্থ (পুরুষ) হইলেও, তিনি নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, এবং চিরকালই জীবসুলভ দোষরাশি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। এই কারণে সূত্রকর্ত্তা তাঁহাকেই আদিগুরুর পদে অভিষিক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥" ১।২৬॥

অর্থাৎ জগতে ব্রহ্মা প্রভৃতি, যাহারা আদিগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ,

---

(১) "অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং" ইত্যাদি সূত্রে স্বয়ং সূত্রকারই অবিদ্যাকে অস্মিতাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার পর—"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্মবেদনীয়ঃ।" (২।১২) সূত্রে ক্লেশকেই কর্ম্মাশয়োৎপত্তির মূল কারণ বলা হইয়াছে, এবং "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" (২।১৩) এই সূত্রে আবার মূলীভূত ক্লেশসত্ত্বেই কর্ম্মের বিপাক বা পরিণাম ফল—জাতি, আয়ু ও ভোগের সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন।

ঈশ্বর তাঁহাদেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা, নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরানুগ্রহ প্রভাবেই ব্রহ্মা প্রভৃতি আদি গুরুগণ বিমল দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন (১)। শ্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রও এ কথার সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া থাকে। মুমুক্ষু পুরুষ যোগসিদ্ধির জন্য এবংবিধ ঈশ্বরের আরাধনায় তৎপর হইবেন।

ঈশ্বরের আরাধনা করিতে হইলে তাঁহার নাম-মন্ত্রাদির পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক হয়, তদভাবে উপাসনাই অচল হইয়া পড়ে। বিশেষ এই যে, একই ব্যক্তির একাধিক নাম প্রসিদ্ধ থাকিলেও, সকল নামই তাহার প্রিয় হয় না, কোন একটী নামই যেমন তাহার সমধিকপ্রিয় বা প্রীতিবর্দ্ধক হয়, এবং সেই প্রিয় নামে সম্বোধন করিলেই যেমন তাহার সমধিক প্রীতি বৃদ্ধি পায়, ঈশ্বরের সম্বন্ধেও সেই কথা। ঈশ্বরের নাম অসংখ্য ; সুতরাং যে কোন নামেই তাঁহার আরাধনা চলিতে পারে সত্য : কিন্তু তাঁহার

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, গুরুপদাভিষিক্ত ব্রহ্মা প্রভৃতি আদিপুরুষ হইলেও, অপরাপর জীবের ন্যায় উৎপত্তিশীল—নিত্য নহে ; সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞানসম্পদ্‌ও নিত্য নহে—আগন্তুক। নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন ঈশ্বর হইতেই সে জ্ঞানসম্পদ্ আসিয়াছে, বুঝিতে হইবে। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে এ কথা বলিয়াছেন—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥" ৬।১৮ ॥

পুরাণশাস্ত্রও এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" এবং "প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী, অজস্র"—ইত্যাদি (শ্রীমদ্ভাগবত)।

আশু প্রীতিসম্পাদনের জন্য একটী বিশেষ নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই নাম নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে সূত্রকার বলিতেছেন—

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥" ১।২৭ ॥

প্রসিদ্ধ 'প্রণব' পদই তাঁহার বাচক। অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরবাচক অসংখ্য নামই শাস্ত্রমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, এবং ব্যবহার-জগতেও তাঁহার বহু নাম প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে প্রণবই তাঁহার প্রিয়তম নাম; কারণ, ঈশ্বরের সহিত প্রণবের যে, বাচ্য-বাচক-ভাব সম্বন্ধ, তাহা অনাদিসিদ্ধ; ব্যক্তি বিশেষের সংকেতকৃত নহে; এই বিশিষ্টতাটী অপর কোন নামেই নাই; নাই বলিয়াই প্রণব নাম তাঁহার এত প্রিয়। সেই প্রিয় নামে সম্বোধন করিলে (আরাধনা করিলে) তিনি সহজেই সন্তুষ্ট হন, এবং সন্তুষ্ট হইয়া আরাধকের যোগসিদ্ধির সহায় হন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার সহায়তা লাভ করিলে জগতে কাহাকেও ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। এই জন্যই সূত্রকার যোগসিদ্ধির (চিত্তবৃত্তি-নিরোধের) সহজ উপায়রূপে প্রণবের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যোগসিদ্ধিকামী ব্যক্তিকে—

"তজ্জপস্তদর্থ-ভাবনম্ ॥" ১।২৮ ॥

উক্ত 'প্রণব' মন্ত্রের জপ করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রণবার্থ পরমেশ্বর বিষয়েও চিন্তা করিতে হইবে। এই ভাবে

প্রণবের জপ ও প্রণবার্থ—পরমেশ্বরের ভাবনা করিতে করিতে যোগীর চিত্ত একাগ্রতা-সম্পন্ন হইয়া থাকে (১)। অধিকন্তু—

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তবায়াভাবশ্চ॥" ১।২৯॥

সেই প্রণব-জপ ও প্রণবার্থ-ভাবনার ফলে যোগীর আত্ম-চৈতন্য প্রত্যক্ষগোচর হয়, এবং যোগসাধনার প্রবল প্রতিপক্ষ চিত্ত-বিক্ষেপকর 'ব্যাধি, স্ত্যান' প্রভৃতি অন্তরায় সমূহও বিধ্বস্ত হয় (২)।

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর-প্রসাদাভিলাষী যোগীকে প্রথমে ঈশ্বরাভিধায়ক শব্দ (প্রিয় নাম) অবগত হইতে হয়। অনন্তর সেই প্রিয় নামটী নিরন্তর জপ করিতে হয়। কেবল জপ করিলেই হয় না; জপের সঙ্গে নামের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরকেও হৃদয়ে চিন্তা করিতে হয়। এই উভয়বিধ কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হয়। তাঁহার প্রসাদে যোগীর চিত্ত নির্ম্মল হইয়া বৃত্তিনিরোধের (যোগসিদ্ধির) যোগ্যতা লাভ করে। ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায়-যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রসীদতি॥" (ভাষ্যধৃত বচন)।

অর্থাৎ প্রথমতঃ পাঠ বা জপের সাহায্যে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। যোগানুষ্ঠানের দ্বারা আবার মন্ত্রার্থ ভাবনা করিবে। এই উভয়বিধ উপায়ানুষ্ঠানের দ্বারা পরমাত্মা প্রসন্ন হন, অর্থাৎ তাহার প্রসাদ লাভ করা যায়।

(২) সূত্রে যোগসাধনার অন্তরায়সমূহ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—"ব্যাধি-স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদালস্যাবিরতি-ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাঃ, তেঽন্তরায়াঃ॥" ১।৩০॥

ব্যাধি অর্থ—ধাতু-বৈষম্য। ব্যাধিতে শরীর অপটু হইয়া মনকেও অপটু করিয়া থাকে। 'স্ত্যান অর্থ—চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা বা একপ্রকার

উক্ত অন্তরায়সমূহ অবিধ্বস্ত অবস্থায় কেবল যে, চিত্তবিক্ষেপ সমুৎপাদন করিয়াই বিরত হয়, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ, মনোগ্লানি, শরীরকম্প এবং শ্বাস ও প্রশ্বাসাদি সমুৎপাদন করিয়াও যোগবিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। অন্তরায় সমূহের ধ্বংস হইলে, যোগীর সে সব বিঘ্নের সম্ভাবনাও দূর হইয়া যায়; তখন তিনি আপনার কর্ত্তব্য পথে অবাধে অগ্রসর হইতে পারেন। পরমেশ্বরপ্রসাদে যেমন চিত্তবৃত্তি-নিরোধের আনুকূল্য হয়, তেমনই অন্তরায়-ধ্বংসেরও সহায়তা হয়; এইজন্য যোগসাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্তরায় নিরাসার্থ পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করা বিশেষ উপযোগী ও আবশ্যক। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, যোগসিদ্ধি ও যোগফল-লাভের পক্ষে চিত্তশুদ্ধির উপযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অবিশুদ্ধচিত্তে যোগ-সাধনার প্রয়াস কেবল পণ্ড পরিশ্রম মাত্র।

চিত্তবিশোধনের জন্য আরও যে সকল উপায় গ্রহণ করিে

জড়তা। সংশয় অর্থ—উভয় বিষয়াবগাহী জ্ঞান; যেমন, যোগ ও যো৽ সাধন সমূহ সফল কি বিফল ইত্যাদি। প্রমাদ—সমাধিসাধনে অমনোযো৽ আলস্য অর্থ—দৈহিক ও মানসিক গুরুত্ব বশতঃ কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তি অভাব। অবিরতি অর্থ—বিষয়ভোগের তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শন অর্থ—বিপরীত জ্ঞান। অলব্ধভূমিকত্ব অর্থ—সমাধির অনুকূল চিত্তাবস্থা লাভ করিতে না পারা। আর অনবস্থিতত্ব অর্থ—সমাধির উপযুক্ত ভূমি কথঞ্চিৎ লাভ করিলেও, তাহাতে মনের অস্থিতি। এই অবস্থাগুলি স্বভাবতই চিত্তের স্থিরতা বিনষ্ট করিয়া চিত্তকে নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া 'বিক্ষেপ', আর সমাধির বিঘ্ন ঘটায় বলিয়া 'অন্তরায়' নামে কথিত হয়।

পারা যায়, স্বয়ং সূত্রকার সে সকলেরও নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখ-দুঃখ-
পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্॥" ১।৩৩॥

সুখ-সম্ভোগপরায়ণ ব্যক্তিতে মৈত্রীভাবনা, দুঃখীর প্রতি করুণা, ধার্ম্মিকে হর্ষ বা সহানুভূতি, আর পাপীর প্রতি উপেক্ষা, অর্থাৎ পাপীর সঙ্গ পরিত্যাগ করা, এই কয়েকটী বিষয় হৃদয়মধ্যে ভাবনা (সংস্কারবদ্ধ) করিতে পারিলে তাহারা সহজেই চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে (১)। ইহা ছাড়া—

" প্রচ্ছর্দ্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" ১।৩৪॥

প্রাণবায়ুর যে প্রচ্ছর্দ্দন (যথারীতি বহিষ্করণ) ও বিধারণ অর্থাৎ মধ্যে নিরোধ, তাহা দ্বারাও চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদিত হইতে র। এখানে প্রচ্ছর্দ্দন শব্দে প্রাণায়ামোক্ত রেচন, আর ারণ শব্দে কুম্ভক বুঝিতে হইবে। সূত্রে 'পূরণের' কোন কথাই

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ—নির্ম্মল; কেবল রাগ ও হিংসাদি দোষের সংস্পর্শে মলিন হইয়া থাকে। উল্লিখিত ভাবনার া চিত্তের সেই মলিনতা অপনীত হওয়ায় উহার প্রসন্নতা জন্মে। সুখীতে মৈত্রীভাবনায় দ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতা নষ্ট হয়, দুঃখীর প্রতি করুণা ভাবনাদ্বারা হিংসাপ্রবৃত্তি দূর হয়। পুণ্যকর্ম্মে সহানুভূতি ভাবনাদ্বারা মাৎসর্য্য বা অসূয়াবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। পাপীকে উপেক্ষা করার দরুণ পাপ-কর্ম্মে আসক্তি তিরোহিত হয়। ঐসকল দোষ বিনষ্ট হইলেই চিত্তের প্রকাশ-শক্তি আপনা হইতেই অভিব্যক্ত হয়।

নাই; কিন্তু পূরণব্যতীত যখন রেচন ও ধারণ (কুম্ভক) হইতে পারে না; তখন সূত্রে উল্লেখ না থাকিলেও পূরণের কর্ত্তব্যতা বুঝিতে হইবে। ফলকথা, প্রথমে বাহ্য বায়ুর দেহাভ্যন্তরে পূরণ, অনন্তর দেহমধ্যেই বিশেষভাবে ধারণ, এবং অবশেষে অন্তর্নিরুদ্ধ সেই বায়ুর প্রচ্ছর্দ্দন করিতে হয় (১)। এইরূপে দীর্ঘকাল প্রাণায়াম করিলে রাজসিক ও তামসিক ভাবগুলি বিদূরিত হইয়া যায়; ক্রমে সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়। তখন চিত্ত স্বচ্ছ ও স্থিরভাবাপন্ন হয়। এতদতিরিক্ত 'বিষয়বতী' প্রবৃত্তি প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার উপায় আছে, সে সকলের সাহায্যেও চিত্তপ্রসাদন করা যাইতে পারে (২)।

চিত্তপ্রসাদনের পক্ষে যতপ্রকার উপায় আছে বা থাকিতে পারে, তন্মধ্যে 'ধ্যানের' আসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য সূত্রকার ধ্যানের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"যথাভিমত-ধ্যানাদ্বা।" ১।৩৯ ॥

চিত্তের স্থিরতা ও প্রসন্নতা সম্পাদনের পক্ষে ধ্যানের আবশ্যকতা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ধ্যানমাত্রেই আলম্বন-সাপেক্ষ; বিনা আলম্বনে কখনই ধ্যান হইতে পারে না; অথচ সেই ধ্যানের

---

(১) তাৎপর্য্য—কেহ কেহ বলেন, যোগাঙ্গ প্রাণায়াম ও কর্ম্মাঙ্গ প্রাণায়াম পরস্পর ভিন্ন। কর্ম্মাঙ্গ প্রাণায়ামে পূরক, কুম্ভক ও রেচক, এই তিনের অপেক্ষা থাকিলেও আলোচ্য যোগাঙ্গ প্রাণায়ামে পূরকের আবশ্যকতা হয় না। উহার প্রণালীও স্বতন্ত্র; প্রথমতঃ কৌষ্ঠ বায়ুর বিরেচন (প্রচ্ছর্দ্দন) করিবে; শেষে বহিঃস্থিত বায়ুকে বাহিরেই স্থির রাখিতে হইবে।

(২) বিষয়বতী প্রবৃত্তির কথা সমাধিপাদের ৩৫ সূত্রে বিবৃত আছে।

আলম্বন বস্তুটী যে, কি, বা কেমন হইবে, তাহাও কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারে না; স্বয়ং সূত্রকারও বলিতে পারেন নাই। কেবল এই মাত্র বলিয়া তিনি নিরস্ত হইয়াছেন যে, যোগীর যাহা অভিমত—মনঃপ্রিয়—যাহা দেখিলে তাহার চক্ষুঃ ও মনঃ স্বতই বিমুগ্ধ হয়, সেইরূপ কোন একটী বিষয়—বিষ্ণুমূর্ত্তি বা শিবমূর্ত্তি প্রভৃতি লইয়া ধ্যান করিতে হয়। তাহাতেই যোগীর চিত্ত স্থির ও প্রসন্ন হইয়া থাকে। চিত্ত একবার কোন বিষয়ে স্থিরতর হইলে, অন্যত্রও তাহার স্থিরতা লাভ করা দুঃসাধ্য হয় না। যথোক্ত প্রকার উপায় দ্বারা চিত্ত স্থির ও পরিমার্জ্জিত হইলে, যোগী চেষ্টা করিলেই সেই চিত্তদ্বারা অতি সূক্ষ্ম—পরমাণুপর্য্যন্ত এবং অতি বৃহৎ—মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে কোন বিষয়ে চিত্তকে স্থির বা একাগ্র করিতে সমর্থ হন। এইরূপে উৎপন্ন একাগ্রতাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির 'সমাপত্তি' শব্দ-বাচ্য।

[সাধনপাদ বা ক্রিয়াযোগ।]

এপর্য্যন্ত যোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল, সে সমস্তই জ্ঞানযোগের কথা। জ্ঞান-সাপেক্ষ বা জ্ঞানাত্মক শ্রদ্ধাদি উপায়ের সাহায্যে অগ্রে চিত্ত স্থির করিতে হয়, পশ্চাৎ যথাবিধি উপায়ে যোগসিদ্ধি লাভ করিতে হয়, কিন্তু যাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী নহে—ব্যুত্থিতচিত্ত (চঞ্চলচিত্ত), তাহাদের পক্ষে প্রথমেই জ্ঞান-যোগের সাহায্য লাভ করা নিতান্তই অসম্ভব; সুতরাং তাহাদের পক্ষে ঐ সকল উপায়দ্বারা যোগসিদ্ধি ও যোগফল লাভ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তাহাদের পক্ষে ক্রিয়াযোগই যোগ-

সাধনার প্রথম সোপান। তাঁহারা প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগের সাহায্যে আপনার অধিকার অর্জ্জন করিবেন, পরে সোপানারোহণক্রমে অধিকারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরপর উন্নততর সাধনপথ অবলম্বন করিয়া যোগসিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইবেন (১)। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার প্রথমে জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া, দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগের উপদেশ দিয়াছেন।—ক্রিয়াযোগ কি ?—

"তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥" ২।১ ॥

তপস্যা (২), স্বাধ্যায় (প্রণব প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ),

---

(১) সাধারণতঃ চিত্তের জ্ঞানপ্রতিবন্ধক দোষ তিন প্রকার—মল, বিক্ষেপ ও আবরণ। তন্মধ্যে মলদোষ—রাগ দ্বেষ ও তন্মূলক বাসনা; বিক্ষেপ দোষ—রজোগুণের প্রবলতাজনিত চিত্তের চাঞ্চল্য; আর আবরণ দোষ—অবিদ্যা বা ভ্রান্তিজ্ঞান। ক্রিয়াযোগদ্বারা মলদোষ, ধ্যানযোগ দ্বারা বিক্ষেপদোষ, আর বিবেকজ্ঞানদ্বারা আবরণদোষ নিবারণ করিতে হয়। মলদোষ নিবারণের জন্য ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করা প্রাথমিক যোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও আবশ্যক।

(২) শাস্ত্রবিহিত ক্লেশকর কর্ম্মের নাম তপঃ। সিদ্ধিলাভের যত রকম উপায় বা সাধন আছে, তন্মধ্যে তপস্যার মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঋষিগণ বলিয়াছেন—"নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ," অর্থাৎ তপস্বীর অসাধ্য কিছু নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তপস্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানের পর্য্যাপ্ত উপায় বলিয়াছেন—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব—তপো ব্রহ্ম" অর্থাৎ তপই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃষ্ট সাধন; অতএব তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর ইত্যাদি। ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"অনাদি-কর্ম্মক্লেশ-বাসনাচিত্রা প্রত্যুপস্থিত-বিষয়জালা চাশুদ্ধিঃ নান্তরে

ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল পরম গুরু পরমেশ্বরে সমর্পণ করা, এই সকল অনুষ্ঠানকে 'ক্রিয়াযোগ' বলা হয়। যোগসিদ্ধির উপায় বলিয়া ঐ সকল ক্রিয়াকেও 'যোগ' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

ক্রিয়াযোগের উদ্দেশ্য দুইটী—এক অভিলষিত সমাধি-সমুৎপাদন, দ্বিতীয় সমাধির প্রবল প্রতিপক্ষ অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশের তনুতা-(ক্ষীণতা-) সম্পাদন। এ কথা স্বয়ং সূত্রকারই পরবর্ত্তী—

"সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥" ২।২ ॥

সূত্রে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন। ক্লেশ কত প্রকার এবং সে সকলের নাম কি? তদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"অবিদ্যাস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥" ২।৩ ॥

'ক্লেশ' পাঁচপ্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা অর্থ—ভ্রান্তিজ্ঞান—অনিত্যে নিত্যতা বুদ্ধি ও অনাত্মায় আত্মতাবুদ্ধি প্রভৃতি। অস্মিতা অর্থ—অহঙ্কার—আত্মা

তপঃ সন্তেদমাপদ্যতে—ইতি তপস উপাদানম্। তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাধমানমনেনাসেব্যমিতি।"

তাৎপর্য্য এই যে, চিত্তগত যে অশুদ্ধি অনাদিকাল হইতে বিচিত্র কর্ম্ম ও ক্লেশ বাসনার আলয় হইয়া আছে, এবং বিবিধ ভোগ্য বিষয় উপস্থাপন করাই যাহার প্রধান কার্য্য, সেই অবিশুদ্ধি কখনই তপস্যা ব্যতীত বিনষ্ট হইতে পারে না; এই জন্যই তপস্যার প্রয়োজন। অবশ্য, সেই তপস্যাও এমন ভাবে করিতে হইবে, যাহাতে চিত্তগত প্রসন্নতার কোন প্রকার হানি না ঘটে।

ও বুদ্ধিতে অভেদাভিমান। রাগ অর্থ—অনুরাগ, অর্থাৎ সুখ ও সুখসাধন বস্তুবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা। দ্বেষ অর্থ—দুঃখ ও দুঃখজনক বস্তুবিষয়ে ক্রোধ বা জিঘাংসাবৃত্তি। সাধারণতঃ অনুরাগে লোকের প্রবৃত্তি ঘটায়, আর দ্বেষে তাহার বিপরীতভাব—নিবৃত্তি জন্মায়। অভিনিবেশ অর্থ—মরণাদিত্রাস; অভিপ্রায় এই যে, প্রাণিমাত্রই জন্মজন্মান্তরে ভীষণ মৃত্যুযাতনা অনুভব করিয়াছে, বর্ত্তমানেও সেই সংস্কার দৃঢ়তরভাবে হৃদয়-পটে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে; এই কারণে প্রাণিমাত্রই তাদৃশ অবস্থার সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত থাকে। এই অবস্থাটী অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেরই সমান ও অপরিহার্য্য। এই পাঁচ প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিই সামান্যতঃ ক্লেশ-পদবাচ্য।

ক্লেশমাত্রই অপ্রিয় ও উচ্ছেদ্য; কিন্তু অবিদ্যার উচ্ছেদে যত্নপর না হইয়া যাহারা কেবল অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশের উচ্ছেদেই প্রয়াস পান, তাহারা সাময়িকভাবে কতকটা শান্তি পাইলেও পাইতে পারেন, এবং যোগপথেও কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইতে পারেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত শান্তি বা যোগাধিকার লাভ করা তাহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেন না, তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে,—

"অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ত-তনু-বিচ্ছিন্নোদারাণাম্॥" ২।৪॥

পূর্ব্বকথিত পাঁচপ্রকার ক্লেশই যথাসম্ভব—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার, এই চারি অবস্থার যে কোন অবস্থায় থাকিতে পারে। এক সময়ে উক্ত অবস্থা-চতুষ্টয় সম্ভবপর হয় না, কিন্তু

পর্য্যায়ক্রমে সকল অবস্থাই সকলের সম্বন্ধে সম্ভবপর হয়। রাগ (অনুরাগ) নামক ক্লেশটী শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের হৃদয়েই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। বিশেষ এই যে, শিশুর হৃদয়-গত রাগ প্রসুপ্ত অর্থাৎ অনুদ্বুদ্ধ, আর যুবকের হৃদয়ে উহা উদার—লব্ধবৃত্তি অবস্থায় থাকে। রাগান্ধ ব্যক্তিও যদি নিরন্তর রাগ-বিরোধী চিন্তা ও চেষ্টা করে, তবে তাহার হৃদয়গত সেই রাগবৃত্তি ক্রমশঃ তনুতা (ক্ষীণতা) প্রাপ্ত হয়। আবার সেই রাগান্ধ ব্যক্তিই যখন ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহার রাগ-বৃত্তি ক্রোধদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। আর যখন যে সকল বৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া উপযুক্ত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, সে সকল ক্লেশ-বৃত্তিকে উদার কহে। যেমন রাগযুক্ত ব্যক্তির হৃদয়ের অনুরাগ।

উক্ত অস্মিতাদি ক্লেশগুলি উল্লিখিত চতুর্বিধ অবস্থার যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, অবিদ্যাই উহাদের ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান; অবিদ্যার সদ্ভাবে উহাদের সদ্ভাব, আর অবিদ্যার অভাবে উহাদের অভাব সুনিশ্চিত; সুতরাং উহারা সকলেই অবিদ্যাপ্রসূত—অবিদ্যাত্মক। যোগী প্রথমে ক্রিয়াযোগের সাহায্যে উহাদের ক্ষীণদশা আনয়ন করেন, পরে প্রসংখ্যান বা ধ্যানরূপ অগ্নিদ্বারা উহাদিগকে দগ্ধপ্রায় করিয়া রাখেন; তখন অভীষ্ট সমাধিসাধনা তাঁহার পক্ষে সহজ ও সুগম হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে উক্ত ক্লেশরাশিই জীবগণের সর্ব্ববিধ অনর্থের নিদান। কেন না,—

" ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্মবেদনীয়ঃ।" ২।১২॥
" সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।" ২ ১৩॥

ক্লেশই বস্তুতঃ শুভাশুভ কর্ম্মাশয়ের—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মূলকারণ (১)। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ হইতেই ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আরব্ধ হইয়া থাকে, এবং ক্লেশ বিদ্যমান থাকিয়াই ঐ সকল কর্ম্মাশয়ের ফল—জন্ম, আয়ু ও ভোগ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। ঐ সকল ফলের মধ্যে কতকগুলি ইহজন্মে অনুভব-যোগ্য, আবার কতকগুলি ফল জন্মান্তরোপভোগ্য হইতে পারে; কিন্তু সমস্ত ফলেরই মূলকারণ সেই অবিদ্যাদি ক্লেশ (২)।

---

(১) এখানে বলা আবশ্যক যে, ক্লেশমাত্রেরই দুইটী অবস্থা, একটী স্থূল, অপরটী সূক্ষ্ম। স্থূল ক্লেশ বৃত্তিরূপী, আর সূক্ষ্ম ক্লেশ বাসনাস্বরূপ। তন্মধ্যে বৃত্ত্যাত্মক স্থূল ক্লেশগুলিকে প্রথমে ক্রিয়াযোগদ্বারা ক্ষীণ করিয়া শেষে প্রসংখ্যানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ (নির্বীজ) করিতে হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম বাসনারূপী ক্লেশ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অন্যপ্রকার। সে গুলির উচ্ছেদ করিবার কোন উপায় নাই। চিত্ত যত দিন থাকিবে, উহারাও ততদিন থাকিবেই। চিত্ত যখন আপনার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া স্বকারণে লয়প্রাপ্ত হইবে, তখনই উহাদের বিলয় হইবে। সূত্রকার এই কথাটী "তে, প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।" (২।১০) সূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। সূত্রস্থ 'প্রতিপ্রসব' কথার অর্থ লয়। অর্থাৎ চিত্তলয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের বিলয় হয়, তাহার পূর্ব্বে হয় না।

(২) অভিপ্রায় এই যে, যোগীর প্রযত্নগত তীব্রতার তারতম্যানুসারে কর্ম্মাশয়ের ফল ইহজন্মে বা পরজন্মেও অনুভূত হইতে পারে। তন্মধ্যে তীব্র সংবেগে মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধিদ্বারা ঈশ্বর, দেবতা ও মহানুভবগণের

অবিদ্যামূলক বলিয়াই কর্ম্মলব্ধ ফলমাত্রই দুঃখময় বা দুঃখবহুল। অজ্ঞানান্ধ লোকেরা ইহা বুঝিতে না পারিলেও, যাহারা বিবেকী—প্রকৃত ভাল মন্দ বা সুখ দুঃখ বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা জাগতিক সর্ব্ববিষয়েই দুঃখবাহুল্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। দুঃখের অব্যাহত অধিকার সার্ব্বত্রিক হইলেও ভোগরাজ্যে উহা আরও স্ফুটতরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কারণ, ভোগ যতই রমণীয় হউক না কেন, পরিণামে অর্থাৎ ভোগাবসানে দুঃখ সমুৎপাদন না করিয়া বিরত হয় না। তাহার পর, পরকে পীড়া না দিয়া, অথবা ভোগে বঞ্চিত না করিয়া কখনও কোনও ভোগ সম্ভবপর হয় না; সুতরাং পরসন্তাপজ ভোগে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ অনুরাগ হইতে, যে ভোগপ্রবৃত্তি জন্মে, সেই ভোগ হইতেও আবার তদনুরূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়; সেই সংস্কার জাগরিত হইয়া লোককে পুনরায় ভোগে নিযোজিত করে। কোন প্রকারে সেই ভোগে বাধা ঘটিলেই দুঃসহ দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়; এইরূপে জগতের সমস্ত বিষয়ই বিবেকীর নিকট দুঃখময় বলিয়া পরিগণিত হয়। অধিকন্তু, সমস্ত জগৎই যখন ত্রিগুণময় সুখ, দুঃখ ও মোহ যখন ত্রিগুণেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তখন জগতে

আরাধনায় বা অবজ্ঞায় যে পুণ্য-পাপময় কর্ম্মাশয় নিষ্পন্ন হয়, তাহার ফল ইহজন্মে—সদ্যঃ সদ্যঃ প্রকটিত হয়, যেমন নন্দীশ্বরের দেবত্ব এবং নহুষের অজগরত্ব প্রাপ্তি। আর যে সকল শুভাশুভ কর্ম্মাশয় তীব্র সংবেগে সম্পাদিত নহে, সে সকলের ফল পরজন্মে প্রকটিত হয়, সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রই ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

দুঃখসম্বন্ধরহিত কোন বস্তুই থাকা সম্ভব হয় না; কাজেই জগৎকে দুঃখময় বলা অসঙ্গত হয় নাই বা হইতে পারে না (১)। এই বিষম দুঃখ-বহ্নির তীব্র তাপে কাতর হইয়াই বিবেকী জন—কেবল বিবেকী কেন, জীবমাত্রই উহার আত্যন্তিক উপশম কামনা করিয়া থাকে।

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি যেমন জীবমাত্রেরই অবিসংবাদিত উদ্দেশ্য, তেমনি দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্দ্দেশ করাই আর্ষ শাস্ত্রের—বিশেষতঃ আস্তিক দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য। আলোচ্য যোগশাস্ত্রও সেই লক্ষ্যপথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সেই লক্ষ্য-পথ পরিশোধনের মানসে যোগদর্শন চিকিৎসাশাস্ত্রের ন্যায় সমস্ত শাস্ত্রার্থকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—এক 'হেয়', দ্বিতীয় হেয়হেতু, তৃতীয় হান ও চতুর্থ—হানের উপায়। তন্মধ্যে দুঃখ স্বভাবতই অপ্রিয়; সুতরাং সকলেরই বর্জ্জনীয়; এইজন্য 'হেয়' নামে অভিহিত। বিশেষ এই যে, অতীত দুঃখ নিজেই বিনষ্ট, আর উপস্থিত দুঃখ, যাহার ভোগ চলিতেছে, তাহারও নিবারণ করা সম্ভব হয় না; কাজেই বলিতে হইবে যে,—

"হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥" ২.১৬ ॥

---

(১) সর্ব্ববিষয়ের দুঃখময়ত্ব জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে স্বয়ং সূত্রকার বলিয়াছেন—"পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥" ২।১৫ ॥

ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"যথা ঊর্ণাতন্তুঃ অক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি, নান্যেষু গাত্রাবয়বেষু, এবম্ এতানি দুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্লিশ্নন্তি, নেতরং প্রতিপত্তারম্ ॥" ইতি।

যাহা অনাগত—এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, তাদৃশ দুঃখই লোকের পক্ষে হেয়; সুতরাং তদ্বিষয়েই সকলের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

কথিত দুঃখ যতই অপ্রিয় হউক না কেন, এবং তদুচ্ছেদের নিমিত্ত লোকে যতই যত্ন করুক না কেন, যতক্ষণ উহার মূল-কারণ জানিতে পারা না যায়, ততক্ষণ সমধিক ইচ্ছা, ঐকান্তিক আগ্রহ ও তীব্র যত্ন সত্ত্বেও অভিমত দুঃখ নিবৃত্তি কোন মতেই হয় না বা হইতে পারে না। এইজন্য দুঃখহানেচ্ছুর পক্ষে সর্ব্বাদৌ ঐ হেয় দুঃখের নিদান নিরূপণ করা আবশ্যক হয়। সেই আবশ্যকতা বুঝিয়া স্বয়ং সূত্রকার বলিয়াছেন—

"দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ॥" ২।১৭॥

দ্রষ্টা—পুরুষ ও দৃশ্য—বুদ্ধি এবং বুদ্ধিতে প্রতিফলিত বিষয়-সমূহ, এতদুভয়ের যে, সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী যে ভোগ্য-ভোক্তৃভাব, তাহাই পূর্ব্বোক্ত 'হেয়'-পদবাচ্য দুঃখের নিদান। অভিপ্রায় এই যে. নিত্য চৈতন্যরূপী পুরুষ প্রকাশস্বভাব হইয়াও যা'কে তা'কে দর্শন করে না, একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিগত বিষয় সমূহ ছাড়া অপর কোন বিষয়ই দেখিতে পায় না। এইজন্য বুদ্ধি ও তদারূঢ় বিষয়ই পুরুষের দৃশ্যমধ্যে পরিগণিত। প্রাক্তন কর্ম্মা-নুসারেই পুরুষ বুদ্ধি ও তদারূঢ় বিভিন্ন বিষয়কে আপনার প্রকাশশক্তিদ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া থাকে; তাহার ফলে উদাসীন পুরুষ হয় দ্রষ্টা (ভোক্তা), আর জড়স্বভাবা বুদ্ধি ও তাহার বৃত্তি-সমূহ হয় দৃশ্য। এই দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাবই ভোক্তৃভোগ্যভাব

নামে পরিচিত, এবং 'সংযোগ' নামে অভিহিত। উক্ত সংযোগই পুরুষের ভোক্তৃত্ব ও বুদ্ধিপ্রভৃতির ভোগ্যত্ব প্রকটিত করিয়া থাকে। এই জন্য স্বয়ং সূত্রকারও সংযোগকেই দৃশ্যগত স্বত্ব ও দ্রষ্টৃগত স্বামিত্ব বোধের হেতু বা উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উপরে সর্ব্বানর্থের নিদানভূত যে সংযোগের কথা বিবৃত করা হইল, সেই সংযোগ কোথা হইতে আইসে? নিত্য সর্ব্বগত আত্মার এই অভিনব স্ব-স্বামিভাবরূপ সংযোগের প্রকৃত কারণ কি? এতদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

"তস্য হেতুরবিদ্যা।" ২।২৪।

পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাই সেই সংযোগের হেতু বা প্রবর্ত্তক। জীবগণ অনাদি কাল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে যে অবিদ্যার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে, এবং যাহার প্রভাবে জীবগণ অনিত্য, অশুচি ও অনাত্ম বস্তুতে নিত্য শুচি ও আত্মবুদ্ধি পোষণ করিতেছে; সেই মহামহিমশালিনী অবিদ্যারই অনতিক্রমনীয় প্রভাবে অসঙ্গ চৈতন্যরূপী আত্মার সহিত অনাত্মা—দৃশ্য বস্তুর স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে; সেই সংযোগই আবার

---

(১) সূত্রকার বলিয়াছেন—

"স্ব-স্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ॥" ২।২৩॥

অর্থাৎ দৃশ্যের সহিত দ্রষ্টার সংযোগ হয় বলিয়াই চেতন পুরুষ দৃশ্য জগতের ভোক্তা হয়, আর দৃশ্য জগৎ পুরুষের ভোগ্য হয়। সংযোগ না হইলে বা না থাকিলে পুরুষের স্বামিত্ব, আর দৃশ্যের স্বত্ব (ভোগ্যত্ব) হয় না, এবং থাকে না।

সংসারাসক্ত জীবনিবহের সর্ব্ববিধ দুঃখভোগের প্রবর্ত্তক; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবগণের দুঃখ সংযোগপ্রসূত হইলেও প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যাই উহার মূলকারণ; অতএব যতক্ষণ অবিদ্যা বিধ্বস্ত না হয়, ততক্ষণ কাহার পক্ষেই এই দুঃখধারা সমুচ্ছেদ করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যোগী পুরুষকে সর্ব্বাদৌ অবিদ্যা বিধ্বংসক্ষম বিবেকজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কেন না, বিবেকজ্ঞানই অবিবেক-ধ্বংসের একমাত্র কারণ বা উপায়। স্বয়ং সূত্রকারও এই যুক্তিসিদ্ধ উপদেশ প্রদানচ্ছলে বলিয়াছেন—

"বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।" ২।২৬॥

বিপ্লব-সম্বন্ধ শূন্য বিবেকখ্যাতিই দুঃখহানের উপায়। বিপ্লব অর্থ—বিপর্য্যয় বা ভ্রান্তিজ্ঞান। অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য সেই প্রকার বিবেকজ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়, যাহাতে কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদাদির সম্বন্ধ বা সংস্পর্শ না থাকে। ভ্রান্তিসংকুল বিবেকজ্ঞান বস্তুতঃ বিবেকজ্ঞানই নহে; সুতরাং তাহা দ্বারা অবিদ্যাত্মক অবিবেকের উচ্ছেদ হয় না, বা হইতে পারে না (১)।

---

(১) সাংখ্যকার কপিল বলিয়াছেন—"নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ।" অর্থাৎ অবিদ্যানিবৃত্তির পক্ষে একটীমাত্র কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে; সেই কারণের দ্বারাই অবিদ্যার উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, অন্য উপায়ে নহে। অন্ধকারনিবৃত্তির জন্য যেরূপ আলোক একমাত্র নির্দ্দিষ্ট কারণ, তদ্রূপ অবিদ্যানিবৃত্তির জন্যও বিবেকজ্ঞানই একমাত্র নির্দ্দিষ্ট কারণ, ইত্যাদি।

আলোক সংস্পর্শমাত্র যেমন চিরনিহিত অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয়, তেমনি অভ্রান্ত বিশুদ্ধ বিবেকজ্ঞান সমুদিত হইবামাত্র জীবের চিরসঞ্চিত অবিদ্যা বা অবিবেকজ্ঞান বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সূত্রকার বলিতেছেন—

"তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং, তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্॥" ২।২৫॥

অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানোদয়ে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবাত্মক সংযোগের অবসান হয়; তাহার ফলে পূর্ব্বকথিত হেয় দুঃখের বিনাশ ঘটে; সেই দুঃখধ্বংসই যোগশাস্ত্রে 'হান'ব্যূহনামে অভিহিত হইয়াছে। এই যে, সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা হান, তাহাই চৈতন্যরূপী পুরুষের কৈবল্য (কেবলীভাব) বা মুক্তি। এবংবিধ অবস্থাতেই পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ও স্বস্থ হইয়া থাকে। তখন আর বুদ্ধিগত বিষয়াকার বৃত্তিরাশি প্রতিফলিত হইয়া নির্ম্মল নিষ্ক্রিয় পুরুষকে কলুষিতপ্রায় করিতে পারে না; তখন পুরুষের বৃত্তি-সারূপ্যের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া যায়, এবং এখানেই জীবের সমস্ত কর্ত্তব্যতা পরিসমাপ্ত হয়। তখন তাঁহার হৃদয়ে নিজের কৃতকৃত্যতাসূচক কেবল এইরূপ প্রতীতি হইতে থাকে যে, আমাকে যাহা ত্যাগ করিতে হইবে, সেই সমুদয় হেয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আর কিছুই জানিবার নাই। 'হেয়' দুঃখের সমুৎপাদক 'ক্লেশ'সমূহকে ক্ষয় করিয়াছি; উহাদের সম্বন্ধে ক্ষয় করিবার আর কিছুই নাই। নিরোধ-সমাধির সাহায্যে দুঃখহানিরূপ মুক্তিও প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এ সম্বন্ধেও আর কিছু প্রত্যক্ষ করিবার নাই। ইহা ছাড়া, আত্মা ও অনাত্মার

পার্থক্যোপলব্ধিরূপ যে বিবেকখ্যাতির সাহায্যে হেয়-দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করিতে হইবে, সেই বিবেকখ্যাতিকেও হৃদয়মধ্যে স্থিরপদ করিয়াছি। আরও তাঁহার মনে হয়,—এখন আমার বুদ্ধি চরিতার্থ হইয়াছে (কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছে)। বুদ্ধিগত সত্ত্বাদি গুণত্রয় পর্ব্বতশিখরচ্যুত পাষাণখণ্ডের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নিজ-নিজ কারণে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে ; উহাদের আর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নাই। এখন আমার আত্মা বৃত্তি-সম্বন্ধ রহিত হইয়া কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যজ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তখন এই সাত প্রকার প্রতীতি ছাড়া আর কোনও চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। যোগশাস্ত্র এতদবস্থার যোগীকে 'কুশল' নামে বিশেষিত করিয়াছেন।

এ কথা খুবই সত্য যে, যে লোক ঐহিক ও পারলৌকিক বিবিধ ভোগরাজ্য হইতে মনকে বিরত রাখিয়া তীব্র সাধনার সাহায্যে বিমল বিবেকজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বদুঃখের নিদান চিরসঞ্চিত অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইতে পারিয়াছেন—সম্পূর্ণরূপে কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তিনি যে, সত্য সত্যই কুশল (কর্ত্তব্য-নিপুণ), সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[আলোচনা]

এ পর্য্যন্ত যোগ, যোগলক্ষণ, যোগবিভাগ এবং যোগ-সিদ্ধির উপায়-পদ্ধতি সংক্ষেপে বিবৃত করা হইয়াছে ; এবং সেই প্রসঙ্গে চিত্তের বৃত্তিবিভাগ, প্রমাণাদির ভেদ ও অভ্যাস-বৈরাগ্য প্রভৃতির কথাও আবশ্যকমতে কথিত হইয়াছে। ইহার

পর রাজযোগে অনধিকারী লোকদিগের পক্ষে অবশ্য করণীয় ক্রিয়াযোগ, তদ্ভেদ ও তদনুষ্ঠানের উপযোগিতা প্রভৃতিও সাধারণভাবে দেখান হইয়াছে। অনন্তর যোগশাস্ত্রোক্ত হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়, এই চতুর্বিধ ব্যূহের সম্বন্ধেও যথাসম্ভব সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখজনক পদার্থমাত্রই জীবগণের প্রধানতঃ হেয়। অবিদ্যা বা বিপর্য্যয়জ্ঞান আবার সেই হেয় পদার্থগুলিকে জীবের সম্মুখে আনয়ন করে; এইজন্য অবিদ্যাই প্রকৃতপক্ষে হেয়ের হেতু। হেয় দুঃখের নিবারণ করিতে হইলে, অগ্রেই হেয়-হেতু অবিদ্যার উচ্ছেদ করা আবশ্যক হয়। বিদ্যা বা বিবেকজ্ঞান ব্যতীত অবিদ্যার উচ্ছেদ কখনই সম্ভবপর হয় না; এই কারণে বিবেকজ্ঞানই হেয়-হানের (দুঃখনিবৃত্তির) একমাত্র উপায়। সেই বিবেকজ্ঞান—আত্মা ও অনাত্মার (বুদ্ধির) পার্থক্যানুভূতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অবিদ্যার উচ্ছেদসাধন করে; এইজন্য বিবেকজ্ঞানকেই হানোপায় বলা হইয়া থাকে। এই হেয়-হানই (দুঃখনিবৃত্তিই) সর্ব্বজীবের একমাত্র লক্ষ্য; এবং যোগ-সাধনার চরম ফল। এবংবিধ অবস্থায় বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পতিত না হওয়ায় পুরুষ তখন আপনার স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; তজ্জন্য এই অবস্থার নাম হইতেছে—কৈবল্য। কৈবল্য আর মোক্ষ একই পদার্থ। এখানেই সেই পুরুষের প্রতি প্রকৃতির (বুদ্ধির) কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হয়; তখন উভয়েই উভয়ের সম্বন্ধ ভুলিয়া যাইয়া চিরদিনের জন্য শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করে।

[যোগাঙ্গ-সাধনা]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানবের মন স্বভাবতই মলদোষে দূষিত—অতি মলিন। সেই মলদোষ অপনীত না হইলে মনের বিশুদ্ধি অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বচ্ছতা কখনই আবির্ভূত হয় না। অবিশুদ্ধ মনে তত্ত্বদর্শন বা বিবেকখ্যাতি কখনই প্রকাশিত হয় না, ও হইতে পারে না; অথচ বিবেকখ্যাতি ব্যতীত দুঃখনিবৃত্তিরও আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এইজন্য যোগী পুরুষকে প্রথমেই চিত্তবিশোধনে যত্নপর হইতে হয়—যত্নসহকারে যোগাঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান করিতে হয়। কারণ,—

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরা বিবেকখ্যাতেঃ॥" ২।২৮॥

যোগাঙ্গের স্বরূপ ও সংখ্যা পরে বলা হইবে। চিত্তবিশোধনের জন্য নিরন্তর যোগাঙ্গানুষ্ঠান করিতে করিতে মনের সমস্ত মল অপনীত হয়, মন বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও প্রকাশময় হয়। তখন মানসিক জ্ঞানদীপ্তি এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত তাহার অনায়াস-সাধ্য হইয়া পড়ে। বিবেকখ্যাতি সমুৎপাদন করাই চিত্ত-বিশোধনের মুখ্য ফল; তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু হয়, সে সমস্তই উহার গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফলমাত্র (১)। যোগী পুরুষ

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, "আম্রে ফলার্থে রোপিতে চ্ছায়া-গন্ধাবনুৎপদ্যেতে" অর্থাৎ ফলের জন্য আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলেও, তাহার ছায়া ও গন্ধলাভ যেমন আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়, ঠিক তেমনই বিবেকখ্যাতির উদ্দেশ্যে চিত্তশোধন করিলেও অন্যান্য বিভূতিসকল উহার আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।

ঐ সকল আনুষঙ্গিক ফলে আসক্ত না হইয়া মুখ্য ফল বিবেকখ্যাতি লাভেই সমুৎসুক হইবেন। যোগাঙ্গ প্রধানতঃ কি কি, এবং কত প্রকার, তাহা বলা হইতেছে—

"যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি॥" ২।২৯॥

যোগাঙ্গ অর্থাৎ যোগসিদ্ধির বিশিষ্ট উপায় আটপ্রকার,— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। তন্মধ্যে যম অর্থ—বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া ও বৃত্তির সংকোচসাধন; অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যকে সুপথে পরিচালিত করা। উক্ত যম ধর্ম্মটী পাঁচভাগে বিভক্ত,— অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্য্যাভাব), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (পরের প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা)। হৃদয়ের মধ্যে অহিংসাবৃত্তি সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, কেবল যে, তাঁহারই হৃদয় হইতে হিংসাবৃত্তি চলিয়া যায়, তাহা নহে, পরন্তু,—

"অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ॥" ২।৩৫॥

(অহিংসাবৃত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে,) তাহার সন্নিহিত প্রাণীদিগের হৃদয় হইতেও বৈরবুদ্ধি চলিয়া যায়; তাহারাও কাহাকে হিংসা করে না (১)। সংযমের দ্বিতীয় স্তর—সত্য-

(১) তাৎপর্য্য—প্রাণিমাত্রই অল্পাধিক পরিমাণে হিংসাবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে, এবং হিংসামাত্রই হৃদয়ে রজঃ ও তমোগুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে; এই জন্য মনুষ্যমাত্রেরই হিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। কেহ কেহ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের সীমায় আবদ্ধ করিয়া

নিষ্ঠা। অসত্যই পাপের প্রধান কারণ। যেখানে পাপ, সেখানেই অসত্যের তাণ্ডবলীলা। পাপী কখনই অসত্যের আশ্রয় না লইয়া স্থির থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, সত্যবাদী কখনও পাপকার্য্য করিতে পারে না। সত্য কথা বলিলে পাপীর পাপ-কার্য্য অচল হইয়া পড়ে। এই কারণে, পাপপ্রবৃত্তি নিরোধের জন্য প্রথমেই সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু সত্যের ভান করিয়া অসত্য বলিলে, তাহাতে চিত্তশুদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই। এই কারণে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রকৃত সত্য ব্যবহার করিতে হয়,—কপট সত্য নহে।

স্তেয় অর্থ—চৌর্য্য। পরকীয় বস্তুতে উৎকট অভিলাষ না থাকিলে চৌর্য্যপ্রবৃত্তি জন্মে না। পক্ষান্তরে, চৌর্য্য দ্বারাও ঐরূপ অভিলাষ ও অসদ্বৃত্তি সমধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইজন্য চিত্তশুদ্ধিকামী পুরুষকে অস্তেয় ভাবনা করিতে হয়। চতুর্থ সংযম—ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের সাধারণ অর্থ—ইন্দ্রিয়সংযম, আর বিশেষার্থ—গুপ্তেন্দ্রিয়-সংযম বা বীর্য্যরক্ষা। বীর্য্যহীন লোক

অহিংসাব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন মৎস্যজীবীর পক্ষে মৎস্য ভিন্ন প্রাণীর হিংসা না করা। তীর্থক্ষেত্রে হিংসা না করা, তিথিবিশেষে বা সংক্রান্তি প্রভৃতি সময়ে হিংসা ত্যাগ করা, এবং কোন ব্রাহ্মণ বা শরণাগত ব্যক্তির জন্য কেবল হিংসা করা, তদ্ভিন্ন স্থলে হিংসা না করা। এ সকলও অহিংসা ব্রত সত্য, কিন্তু যে লোক কোন দেশে, কোন কালে বা কোন অবস্থায়ই হিংসা না করে, তাহার সেই অহিংসা 'মহাব্রত' নামে পরিচিত, এবং তাহাকেই 'অহিংসাপ্রতিষ্ঠা' বলা হয়। তাঁহারই নিকটস্থ প্রাণীর বৈরবুদ্ধি বিলোপ পায়।

সহজেই উৎসাহ-বর্জ্জিত হইয়া থাকে; সুতরাং সেরূপ লোকের দ্বারা ক্লেশসাধ্য যোগসাধনা কখনই সম্ভবপর হয় না, বা হইতে পারে না। অতঃপর সংযমের পঞ্চম বিভাগ হইতেছে—অপরিগ্রহ,—পরের প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা। ইহাদ্বারা মনের ভোগপিপাসা প্রশমিত হইয়া থাকে। যাহার ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার পরদ্রব্য গ্রহণ করিবার আবশ্যকতাও নাই, বা থাকে না। ভোগের জন্যই পরদ্রব্য গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। ভোগের ফল ইন্দ্রিয়গণের ভোগ-লালসা বর্দ্ধিত করা; যতই অধিক পরিমাণে বিষয়-ভোগ করা যায়; ভোগবিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের লালসাও ততই বৃদ্ধি পায়; তাহাতে বৈরাগ্যের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব বৈরাগ্যাভিলাষী ব্যক্তি ভ্রমেও পরদ্রব্য গ্রহণে মনোনিবেশ করিবে না। এই প্রকারে হিংসাদি বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিলে যোগীর যোগসাধনা সহজ ও সুগম হইয়া থাকে।

উল্লিখিত হিংসাদি কার্য্যগুলি সাধারণতঃ তিনভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ নিজে করা, দ্বিতীয়তঃ অপরকে দিয়া করান, তৃতীয়তঃ অপরের তথাবিধ কার্য্যে অনুমোদন করা। যেমন কোন লোক ধার্ম্মিকতার ভান করিয়া বাহ্য সাধুতা প্রদর্শন করত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাণিহিংসা করে না, মিথ্যাকথা বলে না, এবং পরের দ্রব্যও চুরি করে না সত্য; কিন্তু অপরকে ঐ সমুদয় কার্য্যে নিয়োজিত করে, অথবা পরকৃত ঐ সকল কার্য্যে অনুমোদন বা উৎসাহ-প্রদান করে। বুঝিতে হইবে যে, ঐ প্রকার কপটাচারে

তাহাদের চিত্তশুদ্ধি না করিয়া বরং পাপের পথই সমধিক প্রশস্ত করিয়া দেয়।

যোগশাস্ত্রে উক্ত সংযমের বিপরীত ক্রিয়াগুলিকে—হিংসা, অসত্য (মিথ্যা কথা বলা), স্তেয় (চৌর্য্য), বীর্য্যক্ষয় ও পরিগ্রহকে 'বিতর্ক' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই বিতর্ক স্বয়ংকৃতই হউক, অথবা অপরের দ্বারাই সম্পাদিত হউক, কিংবা অনুমোদিতই হউক, এ সকলের ফল—অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞান; এইজন্য যোগিজনের পক্ষে এ সকল অবশ্য বর্জ্জনীয়। চিরাভ্যস্ত এ সকল বৃত্তি ইচ্ছামাত্রেই পরিত্যাগ করা যায় না। এই জন্য মনে মনে ইহাদের অনিষ্টকারিতা সর্ব্বদা ভাবনা করিতে হয়। সেই দৃঢ়তর ভাবনার ফলে এ সকলের নিবৃত্তি সহজ ও সুখসাধ্য হয়। উল্লিখিত সংযম সম্পাদনের পর দ্বিতীয় যোগাঙ্গ 'নিয়মে'র অনুষ্ঠান করিতে হয়। নিয়ম কি? এবং কত প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—

"শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ॥" ২।৩২ ॥

শৌচ অর্থ বিশুদ্ধি। তাহা দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। তন্মধ্যে জল ও মৃত্তিকাদি দ্বারা প্রক্ষালন এবং পবিত্র আহার্য্য গ্রহণ প্রভৃতি বাহ্য শৌচ, আর চিত্তগত বাসনামল ক্ষালনের নাম আভ্যন্তর শৌচ। সন্তোষ অর্থ—অবলম্বিত সাধনে সিদ্ধিলাভ না করা পর্য্যন্ত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা, অর্থাৎ তাহা ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্টবোধে পরবর্ত্তী সাধন গ্রহণে আগ্রহ না করা। তপঃ অর্থ—শাস্ত্রের বিধান অনুসারে ক্লেশ সহ্য করা। শীতোষ্ণাদি

দ্বন্দ্বসহন, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি ব্রতানুষ্ঠান, এবং এই জাতীয় আরও অনেক আছে, যে সকল অনুষ্ঠান 'তপস্যা' মধ্যে গণ্য। স্বাধ্যায় অর্থ—মোক্ষপ্রতিপাদক অধ্যাত্মশাস্ত্রের পাঠ ও প্রণবাদি-জপ। ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থ—সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করা। উল্লিখিত যোগাঙ্গ সমূহের মধ্যে কতকগুলি বহিঃশুদ্ধির কারণ, আর কতকগুলি অন্তঃশুদ্ধির কারণ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্তঃশুদ্ধির জন্যই বহিঃশুদ্ধির আবশ্যক; এবং প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকখ্যাতি সম্পাদনেই অন্তঃশুদ্ধির সফলতা। যাহারা অন্তঃশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বহিঃশুদ্ধিতেই মনোনিবেশ করেন, অথবা বিবেকখ্যাতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল অন্তঃশুদ্ধি-সমুৎপাদনেই পরিশ্রম করেন, তাহাদের সে পরিশ্রমকে লক্ষ্যচ্যুত পণ্ড পরিশ্রমমাত্র বলিতে পারা যায়। অতএব যোগসাধককে সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, আমার অবলম্বিত বহিঃশুদ্ধি আমাকে কি পরিমাণে অন্তঃশুদ্ধির দিকে অগ্রসর করিতেছে; এবং অন্তঃশুদ্ধিইবা কি পরিমাণে বিবেকখ্যাতিলাভে আমার যোগ্যতা সম্পাদন করিতেছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া চলিলে সাধককে নিশ্চয়ই বিফল-মনোরথ হইতে হয়।

চিত্তমল নিরসনপূর্ব্বক বিবেকখ্যাতি সমুৎপাদন করাই সমস্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং উক্ত যম-নিয়মেরও তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য বা ফল; কিন্তু ফলের জন্য বৃক্ষ রোপণ করিলেও যেরূপ তাহার ছায়া ও গন্ধ আনুষঙ্গিক ফলরূপে অপ্রার্থিতভাবে উপস্থিত হয়, ঠিক তদ্রূপ যম-নিয়মানুষ্ঠানেরও

কতকগুলি আনুষঙ্গিক ফল আপনা হইতেই যোগীর নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রকৃত মুমুক্ষু যোগী সেই সকল আপাতরমণীয় ফলে মুগ্ধ হন না; যাহারা সে সকল আগন্তুক ফলের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করেন, তাহারা নিশ্চয়ই অবলম্বিত যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট হন, এবং লৌকিক প্রতিষ্ঠালাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। এইজন্য প্রকৃত মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে সে সকল ফলে প্রলুব্ধ বা বিমুগ্ধ হওয়া কখনও উচিত নহে (১)।

অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে আসনও একপ্রকার যোগাঙ্গ। যোগ-সাধনায় আসনের উপযোগিতা সামান্য নহে। আসন অর্থ

(১) যোগাঙ্গ যম-নিয়ম সাধনার কয়েকটী আনুষঙ্গিক ফল উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, পাঠকগণ তাহা হইতেই অন্যান্য ফলগুলিও বুঝিতে পারিবেন। যেমন—"অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।" (২।৩৫) অর্থাৎ অহিংসাবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত (স্থিরতর) হইলে, তাহার নিকট সকলের বৈরবুদ্ধি লোপ পায়। "সত্য-প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।" (২।৩৬)। অর্থাৎ সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, ক্রিয়া না করিয়াও ইচ্ছামাত্রে ক্রিয়া-ফল লাভ করা যায়। "অস্তেয়-প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।" (২।৩৭) অর্থাৎ অস্তেয়বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার নিকট সমস্ত রত্ন উপস্থিত হয়। "অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্ম-কথন্তা-সংবোধঃ॥" (২।৩৯) পরিগ্রহনিবৃত্তি স্থিরতর হইলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের বিবরণ জানিতে পারা যায়। "সন্তোষাদনুত্তম-সুখলাভঃ।" (২।৪২)। সন্তোষ নিষ্পন্ন হইলে অলৌকিক সুখলাভ হয়। এবং "স্বাধ্যায়াদিষ্ট-দেবতা-সম্প্রয়োগঃ।"(২।৪২) স্বাধ্যায় ভাবনার ফলে অভীষ্ট দেবতার প্রত্যক্ষ হয়, ইত্যাদি।

হস্তপদাদির সন্নিবেশবিশেষ। সেই আসন আয়ত্ত না হইলে, স্থিরভাবে বসিয়া মনঃস্থির করা কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। আসন কি ?—

"স্থির-সুখমাসনম্ ॥" ২।৪৬ ॥

আসন অনেক প্রকার—পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন ও স্বস্তিকাসন প্রভৃতি (১)। তন্মধ্যে যাহা স্থির এবং সুখকর হয়, তাহাই যোগসাধনার প্রকৃত অনুকূল আসন। অভিপ্রায় এই যে, যোগী পরিগণিত আসনের মধ্যে, যে আসনটী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই আসনটী তাহাকে অনায়াস-সাধ্য করিতে হইবে, এবং আসনবন্ধের পরও যাহাতে শরীরে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়, এরূপ অভ্যাস করিতে হইবে। তবেই সেই আসন তাহার পক্ষে হিতকর হইবে; নচেৎ আসন রচনা করিতে যদি সমধিক যত্ন করিতে হয়, এবং যত্নপূর্ব্বক আসন রচনা করিলেও যদি শরীরে উদ্বেগ বা কম্পাদি উপস্থিত হয়, তবে সেরূপ আসনে তাহার কোন ফলোদয় হয় না ও হইতে পারে না। আসন-রচনার নিয়ম ও ফল যোগশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে। এই আসনসিদ্ধির পরে চতুর্থ যোগাঙ্গ প্রাণায়ামে অধিকার জন্মে। প্রাণায়াম কি ? না—

"শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥" ২।৪৯ ॥

---

(১) উপরিলিখিত আসনগুলির রচনাপ্রণালী বিভিন্ন যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে; কিন্তু উপদেশ ব্যতীত কেবল বচনের সাহায্যে আসন রচনা করা প্রায়ই সম্ভবপর হয় না; এইজন্য সেই সকল প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা হইল না।

শ্বাস ও প্রশ্বাসের যে, গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ গতিরোধ, তাহার নাম প্রাণায়াম। বাহিরের বায়ুকে দেহমধ্যে আকর্ষণের নাম শ্বাস, আর আভ্যন্তরিণ বা কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুকে যে, বাহির করা, তাহার নাম প্রশ্বাস। প্রথমতঃ বাহিরের বায়ুকে অন্তরে আকর্ষণ (পূরক) করিবে, পরে অন্তরে আকৃষ্ট বায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া কুম্ভক করিবে; অবশেষে সেই নিরুদ্ধ বায়ুকে মাত্রাক্রমে বাহির করিবে, অর্থাৎ রেচক করিবে। এইরূপে প্রাণের ক্রিয়াকে সঙ্কোচিত করাই প্রাণায়ামের প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণ স্থির রাখিয়া প্রাণায়াম বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রাণায়ামের অভ্যাসে প্রথমতঃ প্রাণের চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। প্রাণের চাঞ্চল্য প্রশমিত হইলে মনের চাঞ্চল্যও নিবারিত হয়। তখন ইন্দ্রিয়-সংযম করা তাহার পক্ষে অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রণায়ামসিদ্ধির পর প্রত্যাহারের ব্যবস্থা। প্রত্যাহার কাহাকে বলে?—

"স্ববিষয়াসম্প্রমোযে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ॥"
২।৫৪॥

শব্দাদি বহির্ব্বিষয় হইতে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইয়া অন্তর্মুখ করিতে হয়; তখন বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-গণের আর কোন সম্পর্ক থাকে না; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তখন সম্পূর্ণরূপে চিত্তের অনুকরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ চিত্তনিরোধের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধব্যাপার হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের এবংবিধ অবস্থারই নাম প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ বশ্যতা-

সম্পাদনই প্রত্যাহারের প্রধান উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইলে পর 'ধারণা' নামক যোগাঙ্গানুষ্ঠানেও যোগী অধিকার প্রাপ্ত হন। ধারণার কথা পরে বলা হইবে।

[আলোচনা।]

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, বিবেকখ্যাতির জন্য চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন, এবং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠানের আবশ্যক। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট যম-নিয়মাদি সাধনগুলিই যোগাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং যোগসাধনার পক্ষে ঐ সকল সাধনের উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক; কিন্তু অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ ভেদে ঐসকল সাধনের মধ্যেও যথেষ্ট তারতম্য বা গৌণ-মুখ্যভাব রহিয়াছে। এই তারতম্য বিজ্ঞাপিত করিবার অভিপ্রায়েই যোগসূত্রকার দ্বিতীয় সাধনপাদে অন্তরঙ্গ সাধনের কথা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কেবল বহিরঙ্গ পাঁচটী মাত্র সাধনের পরিচয় ও ফলাদি নির্দ্দেশ করিয়াই দ্বিতীয় পাদ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন (১); এবং তৃতীয় পাদের

(১) সাধন সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক অন্তরঙ্গ, দ্বিতীয় বহিরঙ্গ। যে সকল সাধন সাক্ষাৎসম্বন্ধে কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল হয়, সেই সকল সাধনকে অন্তরঙ্গ, আর যে সকল সাধন পরম্পরাক্রমে কার্য্যসিদ্ধির আনুকূল্য করে, সেই সকল সাধনকে বহিরঙ্গ সাধন বলে। পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার যোগাঙ্গের মধ্যেও প্রথমোক্ত পাঁচটী অঙ্গ বহিরঙ্গ সাধন; কারণ, উহারা দেহেন্দ্রিয়াদিসংশোধন-ক্রমে চিত্তশুদ্ধির আনুকূল্য করিয়া থাকে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে করে না, কিন্তু ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তাহা করে; তজ্জন্য এই তিনটী অঙ্গ যোগের অন্তরঙ্গ সাধন। এই জন্যই দ্বিতীয় পাদে বহিরঙ্গ পাঁচটী যোগাঙ্গের কথা পরিসমাপ্ত করিয়া তৃতীয় পাদের প্রারম্ভেই অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ের স্বরূপ ও কার্য্যাদি পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথমেই অবশিষ্ট অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ের (ধারণা, ধ্যান ও সমাধির) অবতারণা করিয়া অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ের উৎকর্ষগৌরব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

[তৃতীয়—বিভূতিপাদ।]

চিত্তশুদ্ধির জন্য যে আটপ্রকার যোগাঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বহিরঙ্গ পাঁচটী সাধনের বিষয় দ্বিতীয় পাদে কথিত হইয়াছে, এখন অবশিষ্ট অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ের কথা বলিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমেই 'ধারণা' নামক যোগাঙ্গের লক্ষণ বলিতেছেন। ধারণা কি ?—

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥" ৩।১ ॥

চিত্তকে যে, অভিমত স্থানবিশেষে (শিব ও নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রভৃতিতে) বাঁধিয়া রাখা, তাহার নাম 'ধারণা'।

অভিপ্রায় এই যে, যোগের পরিসমাপ্তি হইতেছে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধে। একাগ্রতা ব্যতীত সেই নিরোধ সম্ভবপর হয় না; এইজন্য নিরোধের পূর্ব্বে একাগ্রতা অভ্যাস করা আবশ্যক হয়। স্বভাবচঞ্চল চিত্তে একাগ্রতা আনয়ন করা কখনই সম্ভব হয় না ও হইতে পারে না। এইহেতু চঞ্চল চিত্তের স্থিরতার জন্য অর্থাৎ একবিষয়ে অভিনিবেশ-যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে, মনকে বলপূর্ব্বক কোন একটী অভিমত বিষয়ে স্থাপন করিয়া রাখিতে হয়। মনকে এইরূপে দেশবিশেষে স্থাপন করিয়া রাখিতে পারাই 'ধারণা' কথার

প্রকৃত অর্থ (১)। মন যতক্ষণ একটী বিষয়ে স্থির থাকিতে অভ্যস্ত না হয়, ততক্ষণ 'ধারণা' সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে নাই। পক্ষান্তরে, ধারণা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী যোগাঙ্গ—ধ্যানাভ্যাসেও প্রবৃত্ত হইতে নাই; কেন না, ধারণায় অকৃতকার্য্য মন কখনই ধ্যানাভ্যাসে সমর্থ হয় না বা হইতে পারে না। ধারণারই পরিপাকাবস্থায় ধ্যানের আবির্ভাব হয়। ধ্যান কি?—

"তত্রপ্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্॥" ৩।২॥

যে বিষয়ে 'ধারণা' অভ্যাস করা হয়, সেই বিষয়েই যে, প্রত্যয়ৈকতানতা অর্থাৎ একাকার চিন্তাধারা, তাহার নাম ধ্যান (২)।

---

(১) ভাষ্যকার উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"নাভিচক্রে, হৃদয়-পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধজ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যেবমাদিষু দেশেষু. বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা"। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ নাভিচক্র, হৃৎপদ্ম, মস্তকস্থ জ্যোতিঃ, নাসিকার অগ্রভাগ ও জিহ্বার অগ্রভাগ এই সকল আভ্যন্তরিক স্থানে, কিংবা বহির্জ্জগতের কোন একটী বিষয়ে বৃত্তিসমুৎপাদনের দ্বারা যে, চিত্তের বন্ধ, তাহার নাম 'ধারণা'। উক্ত উভয়প্রকার বিষয়ের মধ্যে বাহ্য বিষয় অপেক্ষা আভ্যন্তর বিষয়ে 'ধারণা' অভ্যাস করা সমাধিসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়া থাকে।

(২) ধ্যান সম্বন্ধে কাহারো আপত্তি নাই, সকলেই সমভাবে উহার অস্তিত্ব ও উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। ধ্যান সাধারণতঃ সগুণ বস্তুবিষয়েই প্রযোজ্য; নির্গুণ বিষয়ে ধ্যান হয় না। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—ধ্যান যদিও মানসিক ব্যাপার—চিন্তাবিশেষ হউক, তথাপি উহা ক্রিয়াত্মক, শুদ্ধ জ্ঞান নহে। ক্রিয়াত্মক বলিয়াই উহা সম্পূর্ণরূপে

প্রথমতঃ বিভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বলপূর্ব্বক কোন একটী বিষয়ে স্থাপন করিতে হয়, কিয়ৎক্ষণের জন্য সেই বিষয়ে চিত্তকে স্থির করিয়া রাখিতে হয় ('ধারণা' করিতে হয়), পরে কথঞ্চিৎ স্থিরতাপ্রাপ্ত সেই চিত্তদ্বারা 'ধারণা'র বিষয়কেই নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়। অবশ্য, এ চিন্তা (ধ্যান) দীর্ঘকালব্যাপী হইতে পারে না; কিন্তু তথাপি যতক্ষণ এই চিন্তা চলিবে, ততক্ষণ অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা মনোমধ্যে স্থান পাইবে না। এইজন্য রামানুজস্বামী অবিচ্ছিন্নভাবে পতনশীল তৈলধারার সহিত ধ্যানের তুলনা করিয়াছেন (১)। উক্ত ধ্যানই সম্যক্‌রূপে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইলে সমাধিরূপে পরিণত হয়। বস্তুতঃ

কর্ত্তার অধীন—ধ্যানকর্ত্তা আপনার ইচ্ছানুসারে একপ্রকার বস্তুকেও অন্য-প্রকারে চিন্তা (ধ্যান) করিতে পারেন; কিন্তু বিশুদ্ধজ্ঞান কখনই কর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করে না; উহা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞেয় বস্তুর অধীন-ভাবে আত্মলাভ করিয়া থাকে, ইহাই জ্ঞানে ও ধ্যানে পার্থক্য। সম্মুখে যে বস্তু যেরূপ থাকে, কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে সেই বস্তুতে সেইরূপ জ্ঞান হওয়াই স্বাভাবিক, এবং হইয়াও থাকে সেই প্রকার।

(১) ধ্যানের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন—"ধ্যানং নাম তৈলধারাবদ্ অবিচ্ছিন্নপ্রবৃত্তঃ প্রত্যয়-প্রবাহঃ।" (শ্রীভাষ্য ১ম সূত্র) অর্থাৎ তৈলের ধারা পতনের সময় যেরূপ অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত হয়, তদ্রূপ ধ্যেয় বিষয়ে যে, অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তাপ্রবৃত্তি, তাহার নাম ধ্যান। কপিল বলিয়াছেন—"ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।" অর্থাৎ ধ্যেয়াতিরিক্ত বিষয় হইতে যে, মনের নিবৃত্তি, তাহার নাম ধ্যান। ইহা দ্বারাও অবিচ্ছিন্নভাবে এক বিষয়ে প্রবৃত্ত চিন্তাবৃত্তিই যে, ধ্যানের স্বরূপ, সে কথা সমর্থিত হইল।

ধ্যান-সিদ্ধ চিত্তে সমাধি লাভ করা অতি সহজসাধ্য হইয়া থাকে; এইজন্য ধ্যানের পরই সমাধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্রকারও এইরূপ অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥" ৩।৩ ॥

অর্থাৎ সেই ধ্যানই যখন অভ্যাসবশে যেন আপনার অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া কেবল ধ্যেয় বিষয়াকারে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন 'সমাধি' পদবাচ্য হয়। অভিপ্রায় এই যে, ধ্যানের স্থলে ধ্যেয়-বিষয় ও তৎসম্পর্কিত ধ্যান বা চিন্তা উভয়ই স্বপ্রধানভাবে প্রকটিত থাকে; কিন্তু সমাধিসময়ে ধ্যানের আর পৃথক্ অস্তিত্ব প্রতীতিগোচর হয় না; চিত্ত যেন তখন আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া বিষয়াকারেই প্রকাশ পাইতে থাকে, অর্থাৎ তখন আর চিত্তের চিন্তাবৃত্তি আছে বলিয়া কর্ত্তার মনে হয় না। সূত্রস্থ 'স্বরূপশূন্যমিব' কথাটার তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিলেই উক্ত সমাধির প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইতে পারে।

এখানে যে, সমাধির লক্ষণ বলা হইল, এবং পূর্ব্বে যে, সমাধির উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সমাধি হইতেছে ফল, আর শেষোক্ত সমাধি হইতেছে তাহার সাধন। চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদক এই সাধনরূপী সমাধি দ্বারা চিত্তের বৃত্তি-নিরোধাত্মক সেই প্রথমোক্ত সমাধিযোগ সম্পাদন করিতে হয়। এইপ্রকার কার্য্য-কারণভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সূত্রকার ধ্যানের পরিণতিভূত সমাধিকে যোগাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

উক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যথাসম্ভব একই বিষয়ে হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ যে বিষয় অবলম্বনে প্রথমে ধারণা করা হয়, সেই বিষয়েই যথাক্রমে ধ্যান ও সমাধি সম্পাদন করিতে হয়। তাহা হইলেই অভীষ্ট যোগসিদ্ধি সহজ ও সুগম হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার একবিষয়াবলম্বী উক্ত সাধনত্রয়কে একটী বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন,—

"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" ॥ ৩।৪ ॥

অর্থাৎ একই বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই সাধনত্রয়কে 'সংযম' নামে অভিহিত করা হয় (১)। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিভিন্ন অবস্থায় বিনিয়োগেই ইহার সাফল্য বা সম্পূর্ণ উপযোগিতা; এই জন্য বলিয়াছেন—

"তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ" ॥ ৩।৬ ॥

অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আলম্বনরূপে স্থূল সূক্ষ্মাদিক্রমে যে সকল ভূমি বা অবস্থাবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে, পরপর সেই সকল ভূমিতে উক্ত সংযমের বিনিয়োগ করিতে হয়, অর্থাৎ অবলম্বিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থাগুলি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইয়াছে—বুঝিয়া

(১) উক্ত সাধনত্রয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে, অর্থাৎ এক বিষয়ে ধ্যান, অন্য বিষয়ে ধারণা, অপর বিষয়ে সমাধির অনুশীলন করিলে কেবল যে, "সংযম" সংজ্ঞালাভেই বঞ্চিত হইবে, তাহা নহে, পরন্তু যোগ-সিদ্ধির পক্ষে অনুকূলও হইবে না। যোগশাস্ত্রে "সংযম" বলিলে একবিষয়ে বিনিযুক্ত এই তিনটীকেই বুঝিতে হইবে। যেমন, "পরিণামত্রয়সংযমাৎ অতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥" (৩।১৬) ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী অবস্থাসমূহে সংযমের বিনিয়োগ করিতে হয়, কিন্তু পূর্ব্ব অবস্থা আয়ত্ত না করিয়াই যাহারা আবেগবশে পরবর্ত্তী অবস্থাসমূহে সংযম করিতে প্রয়াসী হন, তাহাদের সে প্রয়াস কখনই সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না; এইজন্য যোগীকে খুব সাবধানভাবে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থা গ্রহণ করিতে হয় (১)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে এই শেষোক্ত যোগাঙ্গত্রয় (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) যোগের অন্তরঙ্গ সাধন, আর প্রথমোক্ত পাঁচপ্রকার যোগাঙ্গ বহিরঙ্গ সাধন; এ ব্যবস্থা কেবল সম্প্রজ্ঞাতসমাধি বা সবীজ সমাধির পক্ষেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজ সমাধির পক্ষে এই শেষোক্ত সাধনত্রয়ও বহিরঙ্গ সাধন মধ্যে পরিগণনীয়; কারণ, উক্ত সাধনত্রয়ের নিবৃত্তি বা অভাবদশায়ই যথার্থ নির্বীজ সমাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে; কাজেই ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে নির্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ (ব্যবহিত) সাধন বলিতে হয় (২)।

---

(১) কোন ভূমির পর কোন ভূমি গ্রহণ করিতে বা না করিতে হইবে, এ বিষয়ে প্রধানতঃ যোগই আচার্য্যের কার্য্য (উপদেশ) করিয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে,—

"যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যঃ যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে।
যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্॥" (ভাষ্যধৃত বচন)।

এখানে, অবলম্বিত যোগকেই অবলম্বনীয় যোগপথের প্রদর্শক বলা হইয়াছে।

(২) "তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য" (৩৮) সূত্রে এ কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যবহার-জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিই দর্শন-শ্রবণাদি দ্বারা বিভিন্ন বিষয় অনুভব করিয়া থাকে ; এবং প্রত্যেক অনুভবেই চিত্তমধ্যে এক একটী নূতন সংস্কার সমুৎপন্ন করিয়া থাকে। অনুভব বিনষ্ট হইয়া গেলেও সেই সংস্কারগুলি থাকিয়া যায় ; এবং তাহারা প্রতিনিয়ত অনুরূপ স্মৃতি সমুৎপাদন করিয়া মনের বিক্ষেপ বা চঞ্চলভাব অধিকপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই জন্য যোগীকে ঐ সকল ব্যুত্থানজ সংস্কারের ক্ষয়সাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্নপর হইতে হয় ; এবং সম্পূর্ণরূপে নিরোধসংস্কারের সমধিক উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়।

অভিপ্রায় এই যে, ব্যুত্থানকালীন ব্যবহারিক জ্ঞান হইতে যেমন সংস্কার জন্মে, সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিকালীন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইতেও তেমনই সংস্কার জন্মে। এই উভয়বিধ সংস্কারই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ ব্যুত্থান-সংস্কারসমূহ নিরোধজ সংস্কাররাশিকে, আবার নিরোধজ সংস্কার-রাশিও ঐ সকল ব্যুত্থানজ সংস্কারকে পরাভূত করিতে সতত চেষ্টা করে। তন্মধ্যে যে পক্ষ প্রবল হয়, সেই পক্ষেরই সর্ব্বতোভাবে জয় হইয়া থাকে। যোগীর নিরোধজ সংস্কার যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করে, ব্যুত্থানজ সংস্কাররাশির সেই পরিমাণে অভিভব বা অবনতি ঘটিয়া থাকে ; সুতরাং তদবস্থায় ব্যুত্থানজ সংস্কারসমূহ বিদ্যমান থাকিয়াও চিত্তবৃত্তি-নিরোধের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাইতে সমর্থ হয় না। তাহার ফলে, তখন যোগীর চিত্তে প্রজ্ঞালোক (জ্ঞানজ্যোতিঃ) অতিমাত্র প্রকটিত

হইয়া বিক্ষেপ দোষ বিনষ্ট করে, এবং নিরোধের পথ নিষ্কণ্টক করে। যোগশাস্ত্রে এই অবস্থাকে 'নিরোধ-পরিণাম' বলা হয় (১)।

সূত্রোপদিষ্ট 'নিরোধ-পরিণাম' প্রভৃতি পরিণামে অথবা সূত্রলিখিত কতিপয় বিষয়ে চিত্তসংযম করিলে যোগিগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নানাপ্রকার লৌকিক ও অলৌকিক বিভূতি ও শক্তি লাভ করিতে পারেন; এবং দেবতাগণের নিকট হইতেও বহুবিধ লোভনীয় উপহার পাইতে পারেন; কিন্তু মোক্ষার্থী যোগীরা সে দিকে দৃক্‌পাত করিবেন না; কারণ, সে সমুদয় বিভূতি ব্যবহার-জগতে খুব প্রলোভনীয় হইলেও, প্রকৃত সমাধির পক্ষে প্রবল অন্তরায়। ঐ সকল বিভূতিতে বিমুগ্ধ যোগীরা কঠোর ক্লেশলভ্য সমাধিপথে আর অগ্রসর হইতে পারেন না; কেবল লোক-প্রতিষ্ঠালাভেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। সেই জন্য সূত্রকার উপদেশ দিয়াছেন—

"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ॥" ৩।৩৭॥

"স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গ-স্ময়াকরণং পুনরনিষ্ট-প্রসঙ্গাৎ॥" ৩।৫১॥

অর্থাৎ সংযমলব্ধ ঐ সকল বিভূতিলাভ ব্যবহার-জগতে সিদ্ধি

---

(১) সূত্রকার বলিয়াছেন—"ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ, নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।" (৩।৯)।

সূত্রকার এই প্রসঙ্গে 'সমাধি-পরিণাম' ও 'একাগ্রতা-পরিণাম' প্রভৃতি আরও কয়েকটী পরিণামের কথা বলিয়াছেন। তৃতীয় পাদের ১১—১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য। পরিণাম কাহাকে বলে, এবং কিরূপে সংঘটিত হয়; সে সমস্ত কথাও ঐ সকল সূত্রে বর্ণিত আছে।

নামে পরিচিত হইলেও প্রকৃত সমাধির পক্ষে বিষম উপসর্গ বা অন্তরায় বুঝিতে হইবে, এবং স্বর্গাদি লোকের অধিপতিগণ আসিয়া সেই সকল স্থানে ভোগের জন্য আহ্বান করিলেও যোগী সে সকল ভোগবিষয়ে অনুরাগী হইবে না, এবং ঐ সকল লোকাধিপতির আহ্বানে আপনার যোগসাধনার গুরুত্ব মনে করিয়া বিস্মিতও হইবেন না; কারণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যোগঃ ক্ষরতি বিস্ময়াৎ।" অর্থাৎ অবলম্বিত যোগ-মহিমায় আশ্চর্য্যবোধ করিলেই গর্ব্ব আসিয়া যোগীর যোগশক্তিকে ক্ষয় করিয়া দেয়। অতএব কোন যোগীই বিভূতিলাভে আকৃষ্ট হইবেন না, এবং নিজের অলৌকিক প্রভাব দর্শনেও বিস্মিত হইবেন না (১)। এই সমুদয় বিষয় লইয়াই তৃতীয়—বিভূতিপাদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

---

(১) যোগশাস্ত্রে ঐ সকল যোগবিভূতি নির্দ্দেশের অভিপ্রায় এই যে, যোগানুষ্ঠান অত্যন্ত ক্লেশকব এবং উহার ফলসিদ্ধিও সুদীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ। অতএব যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তির কিয়ৎকাল পরে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এতদিন যোগানুষ্ঠান করিলাম; এখনওত সিদ্ধিলাভেব কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না; অতএব শাস্ত্রে যে, যোগফলের উপদেশ আছে, তাহা সত্য কি না? বাস্তবিকই যোগানুষ্ঠানে মুক্তিলাভ হয় কি না? এবং যোগের সফলতা সম্বন্ধে প্রমাণই বা কি আছে? ইত্যাদি। সেই সমুদয় সম্ভাব্যমান সংশয় দূরীকরণের জন্য—যোগের সফলতা প্রত্যক্ষ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে যোগশাস্ত্রে ঐ সকল বিভূতিব কথা ও তাহার উপায়-পথ উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি কাহারো যোগফলে সংশয় হয়, সেই লোক যোগোক্ত সংযমানুষ্ঠান দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ জাতীয় নানাবিধ বিভূতি দর্শনে নিশ্চয়ই যোগফলে বিশ্বস্ত ও দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিবে, এবং যোগের প্রকৃত

[চতুর্থ—কৈবল্যপাদ।]

প্রথম পাদে প্রধানতঃ সমাধি ও সমাধিভেদ, দ্বিতীয় পাদে সমাধিসিদ্ধির উপায় বা সাধনসমূহ, তৃতীয় পাদে সিদ্ধির বিষয়—বিভূতি প্রভৃতি যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে; অতঃপর (চতুর্থ পাদে) সমাধির চরম ফল কৈবল্যের স্বরূপ নিরূপিত হইবে। কিন্তু বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ-পরিচয় এবং প্রসংখ্যান-সাধনের চরম অবস্থা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় না বলিলে মুক্তির (কৈবল্যের) প্রকৃত তত্ত্ব বুঝান সম্ভবপর হয় না; এইজন্য অগ্রে সাধারণভাবে সিদ্ধির স্বরূপগত ও উৎপত্তিগত প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।

সাধনমাত্রেরই উদ্দেশ্য—সিদ্ধিলাভ। সিদ্ধিলাভের উপায় একপ্রকার নহে; সুতরাং সাধনের প্রভেদানুসারে সিদ্ধির আকারও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে প্রকার সিদ্ধিলাভ হইলে যোগীর চিত্ত কৈবল্যলাভের যোগ্যতা বা অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য সূত্রকার সর্ব্বপ্রথমে পাঁচপ্রকার সিদ্ধির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"জন্মৌষধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ" ॥ ৪।১ ॥

অর্থাৎ জন্মসিদ্ধি, ওষধিসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি ও সমাধি-

---

ফল মুক্তিলাভের জন্য কঠোর ক্লেশকেও আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে বরণ করিতে পারিবে। এই অভিপ্রায়েই যোগশাস্ত্রে বিভূতির উল্লেখ, কিন্তু উহাতে লোককে আসক্ত বা অনুরক্ত করিবার জন্য নহে।

সিদ্ধিভেদে সিদ্ধি পাঁচ প্রকার (১)। তন্মধ্যে একমাত্র সমাধিজ সিদ্ধি ভিন্ন যত প্রকার সিদ্ধি আছে, সে সকল সিদ্ধি লোকপ্রতিষ্ঠার সাধক হইলেও, অভীষ্ট যোগসিদ্ধির অনুকূল হয় না; বরং প্রতিকূলভাব প্রাপ্ত হয়; এই কারণে যোগীর অন্যান্য সিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিতে নাই। উক্ত সিদ্ধির প্রভেদানুসারে সিদ্ধ চিত্তও পাঁচপ্রকার। তন্মধ্যে—

"ধ্যানজমনাশয়ম্" ॥ ৪।৬ ॥

একমাত্র ধ্যানজ অর্থাৎ সমাধিসংস্কারসম্পন্ন চিত্তই অনাশয় হয়। আশয় অর্থ স্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার (ধর্ম্মাধর্ম্ম) এবং অবিদ্যাদি ক্লেশ-জনিত সংস্কার। সমাধিসম্পন্ন চিত্তে ঐ উভয়প্রকার সংস্কারের কোন সংস্কারই (বাসনাই) থাকে না।

অভিপ্রায় এই যে, চিত্ত যতকাল রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী থাকে, ততকালই লোকের ফলভোগে আসক্তি থাকে, এবং অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির জন্য বিভিন্নপ্রকার সকাম কর্ম্মেও প্রবৃত্তি জন্মে। সেই সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার যথাসম্ভব পাপ-পুণ্যলাভ অপরিহার্য্য হইয়া থাকে; কিন্তু সমাধিসম্পন্ন যোগীর সে ভয় থাকে না; তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে রাগদ্বেষ রহিত; সুতরাং ফলের প্রত্যাশায় তাহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে পারে না; তাহার

(১) একজন্মে কৃত সাধনার ফল যদি পরজন্মে জন্মমাত্রই প্রকাশ পায়, তবে তাহাকে জন্মসিদ্ধি বলে। রসায়নাদি পানে যে, সিদ্ধি, তাহাকে ওষধিসিদ্ধি বলে। মন্ত্রবলে যে, আকাশগমনাদির শক্তিলাভ, তাহাকে মন্ত্রসিদ্ধি বলে। তপস্যা দ্বারা সংকল্পসিদ্ধি হয়, যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই সম্পন্ন হয়। সমাধিসিদ্ধি—চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতি।

পর, প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত যে সমুদয় কর্ম্ম পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে উপার্জ্জিত হইয়াছিল, সেই সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ-প্রায় হওয়ায় তাহারাও আর ভোগবিষয়ে প্রেরণা জন্মায় না; কাজেই তাদৃশ যোগীর চিত্তে কোন প্রকার বাসনা স্থানপ্রাপ্ত হয় না; এইজন্যই তাহার চিত্ত 'অনাশয়' (বাসনাশূন্য); কিন্তু যাহাদের চিত্ত তাদৃশ নহে, তাহাদের চিত্ত ঐহিক ও জন্মান্তর-সঞ্চিত বাসনাজালে বেষ্টিত থাকে। সেই সমুদয় বাসনার প্রেরণায় চিত্ত স্বতই শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হয়, এবং তদনুসারে যথাসম্ভব পুণ্য ও পাপ সঞ্চয় করিয়া তদুপযুক্ত ভোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়,—পরবর্ত্তী যে কোন জন্মে সেই কর্ম্ম-ফল ভোগের উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হয়; এবং দেহপ্রাপ্তিমাত্র তদুপ-যোগী ভোগবাসনাসমূহ তাহার হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয়। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্" ॥ ৪।৮ ॥

অর্থাৎ যে সকল বাসনা (প্রাক্তন সংস্কার) অভিব্যক্ত হইলে উপস্থিত কর্ম্মবিপাক অর্থাৎ কর্ম্মারব্ধ জন্ম আয়ুঃ প্রভৃতি সাফল্য লাভ করিতে পারে, কেবল সেই সকল বাসনারই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; অপর বাসনা সকল তখন অভিভূত অবস্থায় থাকে (১),

(১) অভিপ্রায় এই যে, যখন মানুষ মরিয়া পরজন্মে পশু হইল, অথবা পশু মরিয়া মানুষ হইল, তখন সে অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের সংস্কার লাভ করে কি না? যদি তাহা লাভ করিত, তবে নিশ্চয়ই পশুর মানুষো-চিত প্রবৃত্তি এবং মানুষেরও পশু প্রবৃত্তি প্রকটিত হইত; কিন্তু কখনও তাহা হয় না। যে যখন যেরূপ দেহপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে তদনুরূপ কার্য্যেই

কিন্তু বিনষ্ট হয় না। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই বাসনার উচ্ছেদ হইতে পারে।

সমাধিসম্পন্ন যোগী কখন কখন আপনার অবস্থা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তিনি যদি বুঝেন যে, আমার সাধনা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে. এবং প্রারব্ধ ভোগ শেষ করিতেও যথেষ্ট বিলম্ব আছে; অথচ এতটা কাল-বিলম্ব করা সহনীয় নহে; তাহা হইলে তিনি স্বল্পকালে সেই সমুদয় কর্ত্তব্য শেষ করিবার অভিপ্রায়ে কায়ব্যূহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন (১)। যতগুলি শরীর হইলে অল্প সময়ের

প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়; সুতরাং বলিতে হইবে যে, অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের সংস্কারই যে, পরজন্মে অভিব্যক্ত হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই; পরন্তু ইতঃপূর্ব্বে যে কোন কালে ও যে কোন জন্মে অনুরূপ দেহলব্ধ সংস্কারেরই অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, জীবগণ অনাদি কাল হইতে জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে পতিত হইয়া প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সেই সমুদয় দেহে তাহারা যে সমুদয় ব্যবহার করিয়াছে, সে সমুদয়ের সংস্কারও মনোমধ্যে নিহিত আছে; যখনই আপনার কার্য্য সাধনের উপযোগী যেরূপ দেহ উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে সেই সমুদয় সংস্কার জাগরিত হইয়া অনুরূপ কার্য্যপদ্ধতি স্মরণ করাইয়া দেয়। মনে করুন,—একজন বহুকাল পূর্ব্বে কোন এক অবিজ্ঞাত দেশে মনুষ্যদেহ পাইয়া উপযুক্ত বিষয় ভোগ করিয়াছিল। মধ্যে বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন প্রকার ভোগ ও ভোগ-সংস্কার অর্জ্জন করিয়া পুনবায় যখন মনুষ্যদেহ লাভ করিল, তখন তাহার বহু পূর্ব্বকালীন মনুষ্যদেহকৃত সংস্কারগুলিই কেবল অভিব্যক্ত হইবে, অন্য সংস্কারগুলি নিরুদ্ধ থাকিবে।

(১) বিষ্ণুপুরাণে কায়ব্যূহের বিষয় এইভাবে বর্ণিত আছে—

"আত্মনো বৈ শরীরাণি বহূনি ভরতর্ষভ।
যোগী কুর্য্যাদ্বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্মহীং চরেৎ॥
প্রাপ্নুয়াদ্ বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ।
সংহরেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব" ইত্যাদি॥

মধ্যে তাহার অবশিষ্ট সাধনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে, এবং প্রবন্ধভাগও পরিসমাপ্ত হইতে পারে, তিনি স্বীয় যোগশক্তি প্রভাবে ততগুলি শরীর নির্ম্মাণ করেন, এবং প্রত্যেক শরীরের জন্য স্বতন্ত্রভাবে এক একটী চিত্তের সৃষ্টি করেন। ঐ সকল চিত্ত তাঁহার অস্মিতা বা অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে উপাদান গ্রহণ করে এবং মূলীভূত সেই প্রধান চিত্তেরই অনুগতভাবে কার্য্য করিয়া থাকে (১)।

যোগী পুরুষ আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে পর ঐ সমুদয় দেহ ও চিত্তকে উপসংহৃত করিয়া প্রকৃতপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাহার ফলে যোগীর হৃদয়ে আত্মার সম্বন্ধে বিশেষ বিজ্ঞান উপস্থিত হয়, অর্থাৎ আত্মা যে, বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। তখন—

"বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনানিবৃত্তিঃ॥" ৪।২৫॥

সেই বিশেষদর্শী যোগীর আত্মভাব ভাবনা অর্থাৎ 'আমি কে? আমি পূর্ব্বে কি ছিলাম, কেমন ছিলাম" ইত্যাদি চিন্তা সকল চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এবং—

"তদা বিবেক-নিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্॥" ৪।২৬॥

তখন যোগীর চিত্ত স্বতই বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্যাভিমুখে ধাবিত হয়, এবং পূর্ব্বে, যে বিবেকখ্যাতিলাভের জন্য এত প্রয়াস

---

(১) সূত্রকার বলিয়াছেন—
"নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ" ॥ ৪।৪॥
"প্রবৃত্তিভেদে প্রযোজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্॥" ৪।৫॥

পাইতে হইয়াছিল, এবং এত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তখন সেই বিবেকখ্যাতির লোভনীয়তাও চলিয়া যায়, এবং বিবেকখ্যাতি হইতেও লাভযোগ্য কিছু দেখিতে পায় না; সুতরাং তাহাতেও তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তাঁহার চিত্তে তখন 'ধর্ম্মমেঘ' নামক এক উৎকৃষ্ট সমাধির অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় (১)। সেই সমাধি কেবল নিরবচ্ছিন্ন তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ ধর্ম্ম-মেঘই বর্ষণ (প্রসব) করিতে থাকে; বিক্ষেপ আসিয়া আর হৃদয়কে চঞ্চল করিতে পারে না। অধিকন্তু—

"ততঃ ক্লেশ-কর্ম্মনিবৃত্তিঃ।" ৪।৩০॥

সেই ধর্ম্মমেঘ সমাধির প্রভাবে সমস্ত ক্লেশ (অবিদ্যা ও অস্মিতা প্রভৃতি) এবং সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মজনিত পুণ্য ও পাপ সমূলে বিধ্বস্ত হয়। তখন তাহার অবিদ্যাদি ক্লেশের ভয় ও পাপ পুণ্য ভোগের ত্রাস একেবারে চলিয়া যায়; তাঁহার জীবন্মুক্তি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।

"তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পং ভবতি॥" ৪।৩১॥

তখন তাঁহার জ্ঞান সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা-আবরণ রহিত হইয়া

---

(১) "প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ॥ ৪।২৯॥

প্রসংখ্যান অর্থ—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-সাক্ষাৎকার। অকুসীদ অর্থ—লাভপ্রার্থী নয়। যে যোগী লাভের আশায় বিবেকখ্যাতিকেও আদর করে না, তাহার বিবেকখ্যাতির চরম উৎকর্ষ সিদ্ধ হওয়ায় নিরন্তর আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, এই অবস্থার নাম 'ধর্ম্মমেঘ' সমাধি।

অনন্তে পরিণত হয়; এবং জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞেয় বস্তু অল্প হয়; সুতরাং তখন তাঁহার অবিজ্ঞাত কিছু কোথাও থাকে না। তদবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃতির যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল (ভোগ ও অপবর্গ সাধনের ভার ছিল), তাহা সম্পূর্ণ হওয়ায়, প্রকৃতি তখন অবসর গ্রহণে উদ্যত হয়। তখন—

"পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি॥ ৪।৩৪॥

পুরুষের প্রতি সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য-পরিশূন্য গুণত্রয়ের অর্থাৎ গুণপরিণাম বুদ্ধি প্রভৃতির যে, প্রতিপ্রসব অর্থাৎ স্বীয় কারণে বিলয়, অথবা চিতিশক্তির যে, স্বরূপে অবস্থান—বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রমণের অভাব, তাহার নাম কৈবল্য বা মুক্তি।

অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক পুরুষের জন্য ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির দ্বিবিধ কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে,—এক ভোগ, অপর মুক্তি। বন্ধাবস্থায় পুরুষের ভোগ-সম্পাদনের জন্য বৈচিত্র্যময় নানাবিধ আকারে পরিণত হয়, এবং মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষকে তাহাদের কর্ম্মানুযায়ী বিবিধ ভোগ প্রদান করে (১)। সেই

---

(১) পুরুষার্থ অর্থ—আত্মার প্রয়োজন—ভোগ ও মোক্ষ। পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনে যদিও প্রকৃতিই বাধ্য; তথাপি প্রকৃতি দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ উভয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না; প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিদ্বারাই প্রধানতঃ ঐ উভয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; এইজন্য সূত্রস্থ 'গুণানাং' পদে গুণপরিণাম বুদ্ধি প্রভৃতিই বুঝিতে হইবে। উহাদের 'প্রতিপ্রসব' অর্থ—কার্য্যাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক কারণাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া।

প্রকৃতিই আবার ভোগ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নিরাবিল শান্তিময় মুক্তি-সুধার পবিত্র রসাস্বাদদানে প্রযত্ন করে। নিরন্তর এইরূপ প্রযত্নের ফলে যাহার বুদ্ধিগত রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হয়, এবং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহার ভাগ্যে যথোক্ত যোগসাধনার ফলে নির্ম্মল বিবেক-বিজ্ঞান সমুদিত হয়, অজ্ঞান মোহ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। তখন সেই বিবেকবহ্নির সংস্পর্শে তাহার চিরসঞ্চিত কর্ম্মরাশি দগ্ধবীজের ন্যায় অসার হইয়া সুখ-দুঃখময় ফলোৎপাদনে অসমর্থ হয়; পুরুষ তখন আপনার স্বরূপে অবস্থান করিতে থাকে। পুরুষের প্রতি করণীয় উভয়বিধ কার্য্য (ভোগ ও মোক্ষ) পরিনিষ্পন্ন হওয়ায় প্রকৃতি তখন কৃতকৃত্যতা লাভ করে; এবং প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি প্রভৃতি তখন চরিতার্থ হইয়া নিজ নিজ উপাদান কারণে বিলয় প্রাপ্ত হয় (১); সুতরাং তখন আর কোন প্রকার দুঃখভোগের

(১) পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের জন্য প্রকৃতি যেমন এক একটী স্থূল শরীর নির্ম্মাণ করে, ঠিক তেমনই এক একটী সূক্ষ্ম শরীরও সৃষ্টি করে। ভোগ-মোক্ষ সূক্ষ্ম শরীরেই হয়, স্থূল শরীর কেবল তাহার আশ্রয় মাত্র। স্থূল শরীর প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরটী সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হইয়া মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে। সূক্ষ্ম শরীরের অবয়ব সতেরটী—একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র। ইহার মধ্যে বুদ্ধিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে। বুদ্ধির কর্ত্তব্যানুরোধেই সূক্ষ্ম শরীর অক্ষুন্ন থাকে। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্পাদন দ্বারা বুদ্ধি যখন বিশ্রাম লাভ করিবার অধিকার পায়, তখন সূক্ষ্ম শরীরের অপরাপর অংশও বিরতব্যাপার হইয়া পড়ে; এই কারণেই তত্ত্বদর্শীর স্থূল শরীরের পতন হইলে পর সমস্তটা সূক্ষ্ম শরীরই নিজ নিজ উপাদানে লয় পায়, আর ফিরিয়া আইসে না।

সম্ভাবনা না থাকায় ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ কৈবল্যলাভ পুরুষের সিদ্ধ হয়; এইজন্য গুণত্রয়ের প্রতি-প্রসবকে 'কৈবল্য' নাম দেওয়া অসঙ্গত হয় নাই। এ মতে বন্ধ মোক্ষ উভয়ই প্রকৃতির ধর্ম্ম। পুরুষের প্রতি কর্ত্তব্যতায় আবদ্ধ থাকাই ফলতঃ প্রকৃতির বন্ধ, আর সেই কর্ত্তব্যতার সমাপ্তিই তাহার মোক্ষ। পুরুষ যেমন ছিল, তেমনই আছে, তেমন ভাবেই চিরকাল থাকিবে; বন্ধ-মোক্ষের সহিত তাহার বাস্তব সম্বন্ধ কোন কালেই ছিল না, নাই এবং হইবেও না (১)। যাহারা এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া পুরুষেরই বন্ধ-মোক্ষ বলিতে চাহেন, তাহাদের জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—"স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেঃ"।

অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব—সাক্ষাৎকারের পর বুদ্ধির আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে না; তখন বুদ্ধিতে বৃত্তি-উদ্ভবেরও কোন প্রয়োজন থাকে না; সুতরাং বৃত্তিসম্পাতের ফলে যে পুরুষের বৃত্তিসারূপ্য (বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ ভ্রান্তি) ছিল, তৎকালে তাহাও আর থাকে না; কাজেই চিতিশক্তি পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরুষের এই যে, বৃত্তি-সারূপ্যের নিবৃত্তিতে আপনার স্বাভাবিক চৈতন্যরূপে প্রকাশ, তাহার নাম কৈবল্য। কৈবল্য শব্দের সাহজিক অর্থ হইতেছে—কেবলভাব অর্থাৎ অপর কাহারো সঙ্গে অবিমিশ্রিত ভাব। এই কৈবল্য সংঘটন করানই যোগ-সাধনার

---

(১) ভাগবত পুরাণে কথিত আছে—"বন্ধো মোক্ষ ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ। গুণস্য মায়ামূলত্বাৎ ন মে বন্ধো ন মোক্ষণম্॥"

চরম উদ্দেশ্য। মহামুনি পতঞ্জলি সেই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া যোগ, যোগবিভাগ, যোগসাধনের অষ্টবিধ অঙ্গ এবং আনুষঙ্গিক ফলরূপে যোগ-বিভূতি প্রভৃতি গৌণ ও মুখ্য বিষয় সমূহ প্রতিপাদনের ব্যপদেশে এই উপাদেয় যোগদর্শন প্রণয়ন করিয়া মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিবর্গের পবিত্র হৃদয়ে আপনার উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং জগতে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

[উপসংহার।]

মহামুনি পতঞ্জলি-প্রণীত পাতঞ্জল দর্শন সর্ব্ববাদিসম্মত অতি উপাদেয় গ্রন্থ। অন্যান্য দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু যোগদর্শনের প্রধান বিষয় যোগ সম্বন্ধে অতি বড় নাস্তিকেরও বিসংবাদ আছে বলিয়া মনে হয় না।

যোগদর্শন সাধারণতঃ সেশ্বর সাংখ্য নামে পরিচিত; কারণ, কপিলকৃত সাংখ্যে ঈশ্বর অসিদ্ধ বা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন; কিন্তু পতঞ্জলির যোগদর্শনে তিনি অতি গৌরবময় উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন। বোধ হয়, এই হেতুতেই সাংখ্যদর্শন সেশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ লইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, পাতঞ্জল দর্শন কেন যে, সাংখ্যশাস্ত্রের অংশ বা ভাগ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার অবিসংবাদিত সদুত্তর পাওয়া বড় কঠিন। সূত্রকার পতঞ্জলি গ্রন্থমধ্যে কোথাও আপনার গ্রন্থকে 'সাংখ্য' নামে নির্দ্দেশ করেন নাই; কেবল সাংখ্যসম্মত পদার্থগুলি তিনি আবশ্যকমত স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং সাংখ্যসম্মত তত্ত্বগুলিই

তাঁহার অভিমত পদার্থ কি না, তাহা নিঃসংশয়চিত্তে বলিতে পারা যায় না। যোগতত্ত্ব নিরূপণ করাই পতঞ্জলির আন্তরিক অভিলাষ; সেই অভিলষিত তত্ত্ব নিরূপণের পক্ষে যখন যাহা সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তখন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। এই কারণেই তিনি, সাংখ্যসিদ্ধান্তের নিতান্ত প্রতিকূল হইলেও ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রকার যোগতত্ত্ব-প্রজ্ঞাপনের অনুকূল বলিয়াই যে, তিনি সাংখ্যসম্মত তত্ত্বগুলিও যথাযথভাবে গ্রহণ করেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ তিনি তত্ত্ব-সংকলনের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। পদার্থসংকলন অভিমত হইলে তাহাও তাঁহার কর্ত্তব্যমধ্যে অবশ্যই স্থান পাইত, অথচ তাহা কোথাও স্থান পায় নাই। পক্ষান্তরে, সাংখ্যসম্মত ত্রিবিধ প্রমাণের পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সে সকলের কিঞ্চিৎ পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। এই সকল কারণে স্বতই সংশয় হয় যে, পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্যশাস্ত্রেরই একটা পৃথক্ বিভাগ? অথবা স্বতন্ত্র একটা শাস্ত্রবিশেষ।

সাংখ্যের ন্যায় পাতঞ্জলের মতেও পুরুষ বহু এবং অখণ্ড অনন্ত ও নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষমাত্রই সুখ-দুঃখাদির সম্বন্ধবর্জিত নিত্য মুক্ত; কেবল বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সহিত অবিবেক বশতঃ বন্ধন ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। আত্মা ও অনাত্মার বিবেকসাক্ষাৎকারে সেই ভ্রান্তির অবসান হয়। উক্ত বিবেকসাক্ষাৎকারের জন্য যোগের প্রয়োজন; যোগ অর্থই চিত্তবৃত্তির নিরোধ। সেই নিরোধ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই পুরুষের আর বৃত্তি-সম্পাত ঘটে না,

কাজেই তখন পুরুষের বৃত্তি-সারূপ্যকৃত ভ্রান্তি বা অবিবেকও আর থাকে না।

এই প্রসঙ্গে চিত্তের পাঁচ প্রকার বৃত্তি ও তাহার ক্লিষ্টাক্লিষ্ট বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—যোগাভিলাষী পুরুষ অক্লিষ্ট বৃত্তিগুলি রক্ষা করিয়া ক্লিষ্ট বৃত্তিগুলির নিরোধে সতত যত্নপর হইবেন। এই নিরোধেরই নামান্তর যোগ। যোগ দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্পের অপর নাম সবীজ যোগ, আর নির্ব্বিকল্পের অপর নাম নির্ব্বীজ যোগ। সবিকল্প যোগে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা, এই তিনেরই প্রতীতি অব্যাহত থাকে, আর নির্ব্বিকল্প যোগে উক্তপ্রকার বিভেদের প্রতীতি থাকে না; তখন একমাত্র ধ্যেয় বস্তুর আকারই প্রতি-ভাসমান হইতে থাকে। সোহাগা যেমন সুবর্ণের মল বিদূরিত করিয়া আপনিও বিলয়প্রাপ্ত হয়, এবং অগ্নি যেরূপ অবলম্বিত কাষ্ঠখণ্ড দগ্ধ করিয়া নিজেও নির্ব্বাণ লাভ করে, ঠিক তদ্রূপ সমাধি-সময়ে অন্তঃকরণে প্রাদুর্ভূত যথোক্ত বৃত্তিনিচয় নিখিল চিত্তমল বিধ্বস্ত করিয়া এবং অবিবেক নিরস্ত করিয়া অন্তঃকরণের সহিত নিজেরাও বিলীন হইয়া যায়।

উপরি উক্ত চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায় অনেক প্রকার। প্রথমতঃ অভ্যাস, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই বৃত্তিনিরোধের প্রকৃষ্ট উপায়। অভ্যাস অর্থ—একই ধ্যেয় বস্তুর পুনঃ পুনঃ অনুধ্যান। বৈরাগ্য অর্থ—ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়-ভোগে অস্পৃহা। ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থ—ঈশ্বরে নির্ভরশীলতা—সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল

তাঁহাতে সমর্পণ করা। যাহারা এবংবিধ উপায় গ্রহণে অসমর্থ—নিতান্ত অসংযত-চিত্ত, তাহারা প্রথমে ক্রিয়াযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ক্রিয়াযোগের সাহায্যে এবং যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুশীলনে চিত্ত সুস্থির করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানযোগের দিকে অগ্রসর হইবে।

যোগের প্রকৃত ফল কৈবল্যলাভ দীর্ঘকালব্যাপী নিরতিশয় আয়াসসাধ্য; সুতরাং যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তির মনে সহজেই যোগ-ফলের অবশ্যম্ভাবিতাবিষয়ে সংশয় সমুত্থিত হইতে পারে। সেই সংশয় দূরীকরণার্থ এবং যোগফলে দৃঢ়তর বিশ্বাস সমুৎপাদনার্থ কতকগুলি বিভূতির অর্থাৎ যোগের আপাতলভ্য ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তি সেই সকল যোগ-ফল (বিভূতি) দর্শনে প্রকৃত যোগফলেও বিশ্বাসবান্ হইতে পারিবেন। সূত্রকার বিভূতি নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই যোগীকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, ঐ সকল ফল ব্যবহারক্ষেত্রে লোভনীয় সিদ্ধিরূপে পরিগণনীয় হইলেও, বস্তুতঃ সমাধির পক্ষে বিষম বিঘ্নকর; অতএব যোগী কখনও সে সকল ফলে আসক্ত হইবেন না, এবং আপনার যোগমহিমায়ও, বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না; কারণ, তাহাতে যোগীর যোগশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যোগী এইজাতীয় বহুবিধ প্রলোভনে পতিত হইয়াও যদি বিচলিত না হন, চিত্তবৃত্তিনিরোধে অবহিত থাকিতে পারেন, তাহা হইলেই, যোগফল—কৈবল্যলাভ তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হয়। ইহ জন্মেই হউক, আর জন্মান্তরেই হউক, তাঁহার মুক্তিলাভ

ধ্রুব—সুনিশ্চিত (১)। ইহাকেই বলে সর্ব্বদুঃখের অবসানভূমি ও পরমানন্দঘন নিত্য নিরাময় পরমা শান্তি।

মহামতি বাচস্পতিমিশ্র টীকাশেষে একটীমাত্র শ্লোকে সমস্ত যোগদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে সন্নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে সেই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া যোগদর্শনের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি—

"নিদানং তাপানামুদিতমথ তাপাশ্চ কথিতাঃ,
সহাঙ্গৈরষ্টাভির্ব্বিহিতমিহ যোগদ্বয়মপি।
কৃতো মুক্তেরধ্বা গুণ-পুরুষভেদঃ স্ফুটতরঃ,
বিবিক্তং কৈবল্যং পরিগলিততাপা চিতিরসৌ॥"

অর্থাৎ এই পাতঞ্জল দর্শনে ত্রিবিধ তাপ, ত্রিতাপের (ত্রিবিধ দুঃখের) মূল কারণ—প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ, আটপ্রকার যোগাঙ্গ, দ্বিবিধ যোগ (সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি), প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকরূপ মুক্তি-পথ এবং ত্রিতাপবিরহিত শুদ্ধ চিৎস্বরূপ কৈবল্য বা মুক্তি, এ সমস্ত বিষয় অতি বিস্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রধানতঃ এই কয়েকটী বিষয় লইয়াই আলোচ্য যোগদর্শন পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর আমরা জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

---

(১) যোগী অবস্থাবিশেষে উপস্থিত হইলে দেবতাগণ তাহার বৈরাগ্য পরীক্ষার্থ অনেকপ্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করেন। ইহাকে 'স্থান্যুপনিমন্ত্রণ' বলে। সূত্রকার বলিয়াছেন—"স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গ-স্ময়াকরণং পুনরনিষ্ট-প্রসঙ্গাৎ।" যোগী সেই সকল প্রলোভনে আসক্ত হইবেন না, এবং যোগ-প্রভাব দেখিয়াও বিস্মিত হইবেন না। তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।

মীমাংসাদর্শন।

[ভূমিকা]

দর্শনপর্য্যায়ে জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শন পঞ্চম স্থানে অধিষ্ঠিত, এবং পূর্ব্বমীমাংসা নামে পরিচিত। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপে বিভক্ত বেদশাস্ত্রের পূর্ব্বভাগ—যাহা সংহিতা ও কর্ম্মকাণ্ডরূপে পরিচিত, তদবলম্বনে বিরচিত বলিয়া ইহা পূর্ব্বমীমাংসা নামে অভিহিত (১)। মহর্ষি বেদব্যাস বেদবিভাগ সম্পূর্ণ করিয়া যে কয়েকজন শিষ্যকে বেদবিদ্যা দান করিয়াছিলেন, মহামুনি জৈমিনি তাহাদের অন্যতম। বেদব্যাসের আদেশানুসারে জৈমিনি মুনি বেদের কর্ম্মকাণ্ড সংহিতা-ভাগের তাৎপর্য্য নির্ণয়ার্থ মীমাংসাদর্শন রচনা করেন। এই দর্শনে প্রধানতঃ বেদার্থ নিরূপণের ব্যবস্থা ও তদুপযোগী নানাবিধ নিয়ম-পদ্ধতি সংকলিত ও বিচারিত হইয়াছে।

আস্তিক-দর্শনের মধ্যে আলোচ্য মীমাংসাদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সমধিক জটিল। জটিলতার কারণ দুইটী—প্রথম কারণ—ইহা সম্পূর্ণরূপে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত; কর্ম্মকাণ্ডই ইহার ভিত্তি; সেই কর্ম্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে ইহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা কাহারো পক্ষেই সহজ হয় না। দ্বিতীয়

---

(১) মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয় ভাগের সম্মিলিত নাম বেদ। মন্ত্রভাগ সাধারণতঃ সংহিতা ও কর্ম্মকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ, আর ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ উপনিষদ্ ও আরণ্যক প্রভৃতি নানাভাগে বিভক্ত।

কারণ, ইহার বিচার-প্রণালীগত বৈশিষ্ট্য। ন্যায়াদি দর্শনগুলি অত্যন্ত জটিল হইলেও, উহাদের বিচারপদ্ধতি কতিপয় লৌকিক নিয়মে নিবদ্ধ থাকায় প্রতিভাবান্ মেধাবী পুরুষের পক্ষে নিতান্ত দুর্গ্রহ নহে; কিন্তু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ও যেমন গভীর ও অ-লোকপ্রসিদ্ধ, বিচারের নিয়মপ্রণালীও আবার তেমনই বিস্তৃত; কাজেই ইহার সর্ব্বাংশ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা মেধাবী লোকের পক্ষেও অনায়াসসাধ্য বা অল্পসময়সম্পাদ্য হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এদেশে একসময় এরূপ বিশাল জটিল শাস্ত্রেরও যথেষ্ট প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল।

দেখা যায়, বৌদ্ধবিপ্লবের শেষ সময়েই ইহার অত্যধিক অভ্যুদয় হইয়াছিল। ঘাতের পর প্রতিঘাত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ যখন বিদ্যা, বুদ্ধি ও সহায়সম্পদে বলীয়ান্ হইয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের বিপক্ষে নিজ নিজ শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এবং বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারপূর্ব্বক সনাতন নিয়ম-সেতু বিধ্বস্তপ্রায় করিয়াছিলেন, সেই অতি ভীষণ বিঘ্নসঙ্কুল সময়ে ভগবদিচ্ছায় কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহার প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং বিবিধ যুক্তিতর্ক-সংবলিত অতি উপাদেয় বহুতর বিচার-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মীমাংসা শাস্ত্রের সমধিক পুষ্টি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভট্ট কুমারিল, প্রভাকর, আপোদেব, লৌগাক্ষি ভাস্কর, মাধবাচার্য্য ও পার্থসারথি প্রভৃতি কৃতিগণের পবিত্র নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা প্রত্যেকেই মীমাংসাদর্শন বা তাহার

তাৎপর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অত্যুৎকৃষ্ট বহুতর ব্যাখ্যা ও 'প্রকরণ'(১) গ্রন্থ রচনা করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, এবং মীমাংসা শাস্ত্রের সমধিক প্রচার ও প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন।

উক্ত মীমাংসাদর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ই অনেকগুলি পাদের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, এবং প্রত্যেক পাদই আবার বহুতর সূত্রে সংগ্রথিত। কোন অধ্যায়েই চারের কম ও আটের অধিক পাদ-সংখ্যা নাই, এবং কোন পাদেই কুড়ির কম ও অষ্টাশীর অধিক সূত্র-সংখ্যা নাই। এইভাবে দুই হাজার, সাত শত, চুয়াল্লিশটী সূত্রে পরিচ্ছিন্ন ষাট্ পাদে মীমাংসাদর্শনের দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এত অধিক অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা অপর কোন দর্শনেই দৃষ্ট হয় না। এত বড় বিশাল গ্রন্থের প্রত্যেক পাদগত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক প্রদর্শন করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং পাঠকবর্গেরও সুখবোধ্য হইবে না; এই কারণে আমরা এখানে কেবল অধ্যায়গত স্থূল বিষয়গুলিই যথাসম্ভব অল্পকথায় প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। আশা করি, উৎসাহশীল, অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ আবশ্যক হইলে, মূল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন।

মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মের লক্ষণ ও প্রকারভেদ এবং বিধিবাক্যাদির প্রামাণ্য নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়

---

(১) প্রকরণের লক্ষণ—"শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ॥"

অধ্যায়ে বিধিবোধিত কর্ম্ম ও আহার বিভাগ প্রভৃতি বিচারিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে, বিহিত যাগাদি কর্ম্মের শেষ-শেষিভাব (অঙ্গাঙ্গিভাব) আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে যাগের ও পুরুষের (যজমানের) উপকারার্থ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মগুলির স্বরূপাদি নিরূপিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, অনুষ্ঠানার্থ বিহিত যাগাদি বিষয়গুলির অনুষ্ঠানক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্মফলভোক্তার (আত্মার) স্বরূপ ও অধিকারাদি বিষয় বিবেচিত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে. প্রকৃতিযাগে উপদিষ্ট অঙ্গসমূহের বিকৃতিযাগে সামান্যতঃ অতিদেশাদির কথা নিরূপিত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ অতিদেশের কথা বর্ণিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগাঙ্গ মন্ত্র ও কর্ম্মসংস্কার প্রভৃতির অতিদেশপ্রসঙ্গে, দেবতাভেদের স্থলে ঊহের (অধ্যাহারের) নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে বিকৃতি-যাগে প্রকৃতি-যাগাঙ্গ বিশেষ বিশেষ পদার্থের অতিদেশে বাধা প্রদর্শিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে, অনেকগুলি প্রধান কর্ম্মের বিধায়ক বাক্যে বহুতর অঙ্গের বিধি থাকিলে, সেই সকল অঙ্গের একবারমাত্র অনুষ্ঠানেই প্রধান কর্ম্মগুলির ফলনিষ্পত্তি-সাধক তন্ত্রতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে, স্থানবিশেষে একটীমাত্র প্রধান কর্ম্ম-সম্পর্কিত অঙ্গবিশেষের অনুষ্ঠানেই অপর সমস্ত প্রধান কর্ম্মেরও ফলসিদ্ধি নিরূপিত হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আরও অনেক বিষয় অনুক্ত রহিল, সে সমুদয় বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে হৃদয়বান্ পাঠকবর্গ নিজেরাই মূল গ্রন্থে অনুসন্ধান করিবেন।

মীমাংসাদর্শনের উপর মহামতি শবরস্বামী একখানা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যাগ্রন্থ ভাষ্যনামে পরিচিত, এবং সুধীসমাজে বিশেষ প্রামাণিকরূপে সমাদৃত। অদ্যাপি উহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যথারীতি চলিতেছে; তবে কর্ম্ম-কাণ্ডের ও অধ্যাপকমণ্ডলীর দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রচারও কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার পর ভট্ট কুমারিল মীমাংসাদর্শনের উপর অপর দুইখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তৎকৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থদ্বয়ের নাম বার্ত্তিক (১) ও টুপ্‌টীকা। বার্ত্তিক ব্যাখ্যা অতিশয় বৃহৎ ও সারবান্। বার্ত্তিক দুইভাগে বিভক্ত— এক তন্ত্রবার্ত্তিক, অপর শ্লোকবার্ত্তিক। উভয় ভাগই বিবিধ বিচার-বিতর্কে পরিপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত ও বিচারসহ। উল্লিখিত ভাষ্য ও বার্ত্তিক গ্রন্থই মীমাংসাদর্শনের মর্ম্মগ্রহণোপযোগী প্রশস্ত

---

(১) ভাষ্য ও বার্ত্তিক একপ্রকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ভাষ্যের লক্ষণ এইরূপ—

"সূত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

অর্থাৎ ব্যাখ্যাকার প্রথমে সূত্রের কথা ধরিয়া ব্যাখ্যা করিবেন, এবং ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এমন শব্দ ব্যবহার করিবেন যে, তাহাও সূত্রেরই মত স্বল্পাক্ষর হইবে। শেষে সেই নিজের কথাটীরও ব্যাখ্যা করিবেন। তাহা হইলে সেই ব্যাখ্যার নাম হইবে 'ভাষ্য'। বার্ত্তিকের পরিচয় এইরূপ—

"উক্তানুক্ত-দুরুক্তার্থব্যক্তকারি তু বার্ত্তিকম্॥"

অর্থাৎ মূলে যে সকল বিষয় উক্ত আছে, অথবা যে সকল আবশ্যক বিষয়ও বলা হয় নাই, কিংবা যে সকল বিষয় বলা হইয়া থাকিলেও ঠিকমত বলা হয় নাই, সেই সকল বিষয় যে ব্যাখ্যাতে পরিস্ফুট করা হয়, তাহার নাম বার্ত্তিক।

পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতদুভয়ের সাহায্য না পাইলে সূত্রগুলির রহস্য-রত্ন বোধ হয়, চিরকালই নিবিড় তিমিরজালে প্রচ্ছন্ন থাকিত।

এস্থলে মহামতি মাধবাচার্য্যকৃত ন্যায়মালাবিস্তারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশাল মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ধারণাপথে রক্ষা করা অনেকের পক্ষেই সমধিক ক্লেশ-কর। সেই ক্লেশ-লাঘবের উদ্দেশ্যে মহামতি মাধবাচার্য্য প্রত্যেক অধিকরণের বিষয়গুলি (পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও তাহার বিচার), শ্লোকে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন (১)। প্রায় সর্ব্বত্রই দুইটীমাত্র শ্লোকে সমস্ত বিষয় সংগ্রথিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকে পূর্ব্বপক্ষ বা আপত্তি ও তদনুকূল যুক্তি,, আর দ্বিতীয় শ্লোকে সিদ্ধান্ত ও তদনুকূল যুক্তিসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। মীমাংসা-দর্শনের উপর মাধবাচার্য্যের যে, কি পরিমাণ অধিকার ছিল, তাহা তাঁহার 'ন্যায়মালা বিস্তার' গ্রন্থে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার পর মীমাংসাশাস্ত্রে পারদর্শী মহামতি পার্থসারথি মিশ্র মীমাংসাদর্শন অবলম্বনে দুইখানা পরম উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সে দুই গ্রন্থের নাম—শাস্ত্রদীপিকা, ও ন্যায়রত্ন-মালা। তন্মধ্যে শাস্ত্রদীপিকা বড়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বিদ্বৎসমাজে

---

(১) 'অধিকরণ' কথাটী মীমাংসাশাস্ত্রের বিশেষ পরিভাষা। এক একটি বিচার্য্য বিষয় লইয়া পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষরূপে যতগুলি সূত্র রচিত হইয়াছে, সেই সূত্র-সমষ্টিকে একটী 'অধিকরণ' বলে। অধিকরণের বিষয় পাঁচটী—(১) বিচার্য্য বিষয়। (২) সংশয়। (৩) পূর্ব্বপক্ষ। (৪) উত্তর বা সিদ্ধান্তপক্ষ। (৫) নির্ণয় বা সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদন।

সুপরিচিত ও প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সমাদৃত। ঐ গ্রন্থও মীমাংসা-দর্শনের অলঙ্কাররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া মহামতি আপোদেবকৃত 'ন্যায়প্রকাশ' (আপোদেবী), লৌগাক্ষি-ভাস্কর রচিত 'অর্থসংগ্রহ', কৃষ্ণযজ্ব-প্রণীত 'মীমাংসাপরিভাষা' এবং তদতিরিক্ত আরও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ এই মীমাংসা-দর্শন অবলম্বনে আত্মলাভ করিয়াছে। ঐ সকল প্রকরণ গ্রন্থে মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ অপেক্ষাকৃত সহজভাবে ও সরল ভাষায় বিবৃত করা হইয়াছে। ঐ সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিলে সাধারণভাবে মীমাংসাদর্শনের উদ্দেশ্য, বিচার্য্য বিষয় ও বিচারপ্রণালী প্রায় সমস্তই জানিতে পারা যায়। এই কারণে উল্লিখিত প্রকরণগ্রন্থগুলি বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করিয়াছে (১)।

---

(১) এতদতিরিক্ত আরও যে সকল অভিজ্ঞ পাণ্ডিত বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মীমাংসাশাস্ত্রের পুষ্টি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাদের ও তৎকৃত গ্রন্থসমূহের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। অভিজ্ঞ পাঠকগণ ইহা হইতেই উহার প্রচার-বাহুল্য বুঝিতে পারিবেন।

বুক্কণমহারাজামাত্যকৃত জৈমিনীয় ন্যায়মালা। রামেশ্বরসূরিকৃত জৈমিনিসূত্রবৃত্তি। বল্লভাচার্য্যবিরচিত তত্ত্বপ্রদীপ ও তন্ত্রবার্ত্তিক। ধর্ম্মোত্তরা-চার্য্যকৃত ন্যায়বিন্দুটীকা। সোমেশ্বরভট্টপ্রণীত ন্যায়সুধা। শ্রীখণ্ডদেবকৃত পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন। শালিকনাথকৃত প্রকরণপঞ্চিকা ও ভট্টচিন্তামণি। জানকীনাথভট্টরচিত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী। নারায়ণতীর্থ-মুনিবিরচিত ভট্ট-দীপিকা ও মান-মেয়োদয়। শ্রীশঙ্করভট্টকৃত মীমাংসা-সারসংগ্রহ। অপ্পয়-দীক্ষিতপ্রণীত বিধিরসায়ন। উৎপলাচার্য্যকৃত স্পন্দদীপিকা। কৃষ্ণাচার্য্য-বিরচিত বিবাদসুধাকর। বাসুদেবদীক্ষিতবিরচিত অধ্বরমীমাংসা ইত্যাদি। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এখনও অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বমীমাংসামতে ঈশ্বরের কোন স্থান বা উপযোগিতা নাই। কর্ম্মজন্য অপূর্ব্বই জীবগণকে কর্ম্মানুযায়ী শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে; তজ্জন্য আর ঈশ্বরের কোন আবশ্যক হয় না; সুতরাং তাঁহার মতে নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে কোন প্রয়োজন নাই ও থাকিতে পারে না। মন্ত্রই দেবতার স্বরূপ; মন্ত্রাতিরিক্ত শরীরধারী দেবতার অস্তিত্বেও কোন প্রমাণ বা প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, এবং সেরূপ শরীর থাকা সম্ভবও হয় না (১)।

মীমাংসাদর্শনের মতে বর্ণ ও বর্ণময় শব্দমাত্রই নিত্য; প্রত্যেক বর্ণই উৎপত্তি-বিনাশবিহীন, কণ্ঠতালুপ্রভৃতি স্থান-বিশেষের সংযোগ-বিয়োগানুসারে উহাদের অভিব্যক্তি ও অনভি-ব্যক্তি ঘটিয়া থাকে মাত্র; এবং তন্নিবন্ধনই নিত্য শব্দেও লোকের অনিত্যতাভ্রান্তি (উৎপত্তি-বিনাশ ভ্রান্তি) উপস্থিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ বর্ণমাত্রই উৎপত্তি-বিনাশবিহীন নিত্য। এবিষয়ে আমরা

(১) প্রবাদ আছে যে, জৈমিনিমুনি মীমাংসাদর্শনেব এই দ্বাদশ অধ্যায় ছাড়া আরও চারি অধ্যায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই চারি অধ্যায়ের নাম সংকর্ষণ কাণ্ড। তাহাতে নাকি তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত সে গ্রন্থ লোক-লোচনের গোচর হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই; আর জানা যাইবে কি না, তাহাও অন্তর্যামী ভিন্ন কেহ বলিতে পারেন না। মীমাংসকগণ বলেন—দেবতা-গণের স্থূল শরীর থাকিলে, যজ্ঞাদি কার্য্যে আহ্বানের পর আগত দেবতা-মূর্ত্তি লোকের প্রত্যক্ষগোচর হইত, কিন্তু তাহা কোথাও হয় না; অধিকন্তু আবাহনের ফলে আগত ঐরাবত-গজারূঢ় ইন্দ্রদেব ক্ষুদ্রঘটে অধিষ্ঠিত হইলে নিশ্চয়ই সে ঘট চূর্ণীকৃত হইত। অতএব দেবতার শরীর থাকা সম্ভবপর হয় না।

ফেলোশিপ-প্রবন্ধের প্রথম ভাগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি; এখানে তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

বর্ণময় শব্দ যেমন নিত্য; বর্ণময় শব্দসমষ্টিরূপ বেদও তেমনই নিত্য এবং অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত। বেদ কোনও পুরুষবিশেষের বুদ্ধি-পরিকল্পিত নহে, এবং ঈশ্বরকৃতও নহে; কেন না, মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বরের প্রভাব বা মহিমা অস্বীকৃত হইয়াছে। জীবের সুখ-দুঃখ-প্রবর্ত্তক শুভাশুভ কর্ম্মরাশিই তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টামাত্র, রচয়িতা নহেন। "ঋষি-দর্শনাৎ" অর্থাৎ যিনি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষিনামে উক্ত হইয়াছেন। কাজেই বেদকে অপৌরুষেয় বলিতে হয়।

বেদ অপৌরুষেয় বলিয়াই ভ্রম-প্রমাদপ্রভৃতি পুরুষ-সুলভ দোষে অসংস্পৃষ্ট; সুতরাং স্বতঃ প্রমাণ; উহার প্রামাণ্য নির্দ্ধারণের জন্য আর প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না।

সেই স্বতঃপ্রমাণ বেদই জীবগণের হিতপ্রাপ্তি ও অহিতপরিহারের উপায় উপদেশ করিয়াছেন। সেই হিতাহিত-প্রাপ্তি-পরিহারোপযোগী ক্রিয়াপ্রতিপাদানই সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে সকল বাক্যে তাদৃশ কোন ক্রিয়ার উপদেশ নাই—কেবল বস্তু-মাত্রের নির্দ্দেশ আছে, সে সকল বাক্য নিরর্থক। তাঁহারা বলেন—

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্, তস্মাদনিত্যমুচ্যতে" ॥১।২।১॥

অর্থাৎ ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই বেদের উদ্দেশ্য; অতএব অক্রিয়ার্থক বাক্যসমূহ অনর্থক অর্থাৎ শব্দার্থে তাৎপর্য্যবিহীন।

এই কারণে সেই সকল বাক্যকে অনিত্য বলা হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে "সোঽরোদীৎ" [দেবগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া] সেই অগ্নি রোদন করিয়াছিলেন। এবং "অগ্নিঃ হিমস্য ভেষজম্" অগ্নি হইতেছে হিমের ঔষধ অর্থাৎ শীতনিবারক, ইত্যাদি বাক্য-রাশি লোকের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির উপদেশক নয় বলিয়া অপ্রমাণ। যদি এইজাতীয় বাক্যসমূহেরও আনর্থক্য নিবারণ ও সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলেও,—

"তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ" ॥ ১।১।২৫ ॥
"বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" ॥ ১।২।৭ ॥

এই কারণেই প্রসিদ্ধ বা বিদ্যমান বস্তুর বোধক অক্রিয়ার্থক পদগুলিকে ক্রিয়াবোধক পদসমূহের সঙ্গে মিলিত করিয়া পাঠ করিতে হয়; কেন না, ঐ উদ্দেশ্যেই সেই সকল (ভূতার্থবোধক) বাক্যের উল্লেখ। পর সূত্রে একথা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—ভূতার্থবাদী (অক্রিয়াবোধক) বাক্যগুলি বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল বিধিরই প্রশংসা বুঝাইয়া থাকে। ঐরূপ প্রশংসার্থেই ঐ সকল বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

উল্লিখিত নিয়মানুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক উপনিষদ্ শাস্ত্রে যে, "সত্যং জ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি ব্রহ্মোপদেশপর বাক্য আছে, সে সমস্ত বাক্যই নিরর্থক; পক্ষান্তরে, কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়াবিধির সহিত কিংবা উপনিষদ্গত উপাসনাবিধির সহিত মিলিত হইয়া

সার্থক হইলেও হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা বা ব্রহ্ম ভূত বস্তু, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ; সুতরাং নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য; কাজেই তদ্বোধক শব্দসমূহ কখনই অজ্ঞাত-জ্ঞাপক নহে, প্রসিদ্ধার্থের অনুবাদক মাত্র; এইজন্য ঐ সকল বাক্য প্রমাণরূপে সার্থক হইতে পারে না। উহাদের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলেই ক্রিয়া-সম্বন্ধ ঘটাইতে হইবে; সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডে বিহিত যাগাদিক্রিয়ার জন্য যে অধিকারী—আত্মার উল্লেখ আছে, উপনিষদুক্ত বাক্যসমূহ সেই আত্মারই দেহাদি-ব্যতিরিক্তভাব ও নিত্য-স্বরূপতাপ্রভৃতি নিরূপণ করিয়াছে। আর যদি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়াবিধির অপেক্ষিত কর্ত্তার কথা জ্ঞানকাণ্ডে (উপনিষদে) থাকা অসঙ্গতই মনে হয়, তাহা হইলেও ক্রিয়াসম্বন্ধের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; কারণ, উপনিষদের মধ্যে যে, "আত্মা ইত্যেবোপাসীত" "ব্রহ্মোপাসীত" ইত্যাদি উপাসনাক্রিয়ার বিধি দৃষ্ট হয়, সেই সকল উপাসনায় কর্ম্মস্বরূপে অপেক্ষিত আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা বিধিসম্বন্ধবর্জ্জিত হইতেছে না। এইভাবেই উপনিষদ্‌শাস্ত্রের পরম রহস্য ব্রহ্মোপদেশক বাক্য-সমূহেরও সার্থকতা রক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে। অতএব কেবলই বস্তুমাত্রবোধক অ-ক্রিয়াপর বাক্যসমূহের স্বতন্ত্র-ভাবে সার্থকতা স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

মীমাংসামাত্রই সংশয়-সাপেক্ষ। যেখানে সংশয়, সেই খানেই মীমাংসার প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে যেখানে সংশয় নাই, সেখানে মীমাংসারও আবশ্যক নাই। আলোচ্য মীমাংসাদর্শনের

নামকরণ হইতেই বুঝা যায় যে, কর্ম্মকাণ্ডে সম্ভাব্যমান সংশয় নিরাসার্থই ইহার আবির্ভাব। কোথায় কোন শব্দের কিরূপ অর্থ করিতে হইবে, কোন বাক্যের কিরূপ তাৎপর্য্য কল্পনা করিতে হইবে, অথবা কোথায় কোন মন্ত্রের বা কোন দ্রব্যের কি প্রকারে বিনিয়োগ করিতে হইবে, ইত্যাদি সংশয়সঙ্কুল বিষয়ে সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিবার অনুকূল নিয়ম-প্রণালীসমূহ এগ্রন্থে অতি উত্তমরূপে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার উদাহরণরূপে নিম্নলিখিত সূত্রটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে—

"শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং পারদৌর্ব্বল্যম্
অর্থবিপ্রকর্ষাৎ" ॥ ৩।৩ ১৪ ॥

কোথাও মন্ত্রাদির বিনিয়োগ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, যথাসম্ভব শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—এই ষড়্বিধ হেতুদ্বারা বিনিয়োগ নির্ণয় করিতে হয় (১)। সন্দিগ্ধস্থলে বিনিয়োগ স্থির করিবার পক্ষে উপরি উক্ত শ্রুতি-লিঙ্গাদি হেতু-

(১) শ্রুত অর্থ—দ্বিতীয়াদি কারক-বিভক্তিযুক্ত পদ, ফল কথা—"নিরপেক্ষো রবঃ শ্রুতিঃ" অর্থাৎ যাহার অর্থ প্রতীতির জন্য অপরকে অপেক্ষা করিতে হয় না, সেইরূপ শব্দই 'শ্রুতি' নামে অভিহিত। 'লিঙ্গ' অর্থ—বিশেষার্থবোধনে সামর্থ্য। 'বাক্য' অর্থ—পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট পদ-সমষ্টি। 'প্রকরণ' অর্থ—প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ। 'স্থান' অর্থ—নির্দ্দেশের ক্রম অর্থাৎ পারম্পর্য্য। 'সমাখ্যা' অর্থ নাম বা যোগার্থ অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়লব্ধ অর্থ। এই ছয়টীই মন্ত্রাদির বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক অর্থাৎ কোথায় কাহার কিরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া দেয়। তন্মধ্যে কোথাও যদি একাধিক হেতুর সম্ভাবনা ঘটে, এবং তাহাতে যদি নির্ণয়ে বাধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উপরি লিখিত হেতুগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হেতুদ্বারাই বিনিয়োগ স্থির করিতে হয়।

গুলিই প্রধান সহায়-সত্য; কিন্তু কোনস্থলে যদি একাধিক হেতু বিদ্যমান থাকে, এবং উহারা প্রত্যেকেই যদি বিচার্য্য বিষয়টীকে বিভিন্নপথে আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে বিনিয়োগ নিরূপণের কোন উপায় আছে কি? হাঁ আছে; তাদৃশ স্থলে সম্ভাবিত হেতুগুলির বলাবল বিচারই একতর পক্ষনির্ণয়ের উপায়। উক্ত ষড়্বিধ হেতুর মধ্যে প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী হেতুটী পরবর্ত্তী হেতু অপেক্ষা বলবান্। যেমন, 'সমাখ্যা' অপেক্ষা 'স্থান' বলবান্; স্থান অপেক্ষা প্রকরণ বলবান্; প্রকরণ হইতে বাক্য বলবান্; বাক্য অপেক্ষা 'লিঙ্গ' এবং লিঙ্গ অপেক্ষাও 'শ্রুতির' বলবত্তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সুতরাং শ্রুতির বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক অপর সমস্ত হেতুই দুর্ব্বলতা নিবন্ধন উপেক্ষণীয়। অতএব কোনস্থানে যদি বিনিয়োগ-বোধক সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্য বর্ত্তমান থাকে, আর তদ্বিরুদ্ধে যদি লিঙ্গ ও বাক্য প্রভৃতি হেতু বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, অপরাপর হেতুগুলিকে বাধা দিয়া শ্রুতি নিজেই মন্ত্রাদির বিনিয়োগ ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ দ্বিতীয় হেতু 'লিঙ্গ'ও আবার তৃতীয় হেতু বাক্যকে বাধা দিবে। অন্যান্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এইরূপ বাধ্য-বাধকভাব বা বলাবলের কারণ এই যে, সমাখ্যা অনুসারে অর্থ নির্ণয় করিতে যত সময় লাগে, তাহার পূর্ব্বেই 'স্থান'রূপ হেতুদ্বারা অর্থ নির্ণয় হইয়া যায়। আবার স্থানের দ্বারা অর্থ নির্ণয় করিতে যতটা বিলম্ব ঘটে, তদপেক্ষা অল্প সময়ে 'প্রকরণ' দ্বারা অর্থ নির্ণয় হইতে পারে, প্রকরণ অপেক্ষাও অল্প সময়ে 'বাক্য' অনুসারে অর্থ নির্ণয় হইতে পারে। বাক্য

অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে 'লিঙ্গ' অর্থাৎ কথিত সমর্থক হেতুদ্বারা প্রকৃতার্থ নির্ণয় হইয়া থাকে। লিঙ্গ অপেক্ষাও অল্প সময়ে 'শ্রুতি' দ্বারা অর্থ নির্ণয় করা সহজ হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, যেখানে শ্রুতি দ্বারা অর্থ নির্ণয় সম্ভবপর হয় না, সেখানেই অর্থ-নির্ণায়ক লিঙ্গের কার্য্যকারিতা। এইরূপ লিঙ্গের অভাবে বাক্য, বাক্যের অভাবে প্রকরণ, প্রকরণের অভাবে স্থান, এবং স্থানের অভাবে সমাখ্যা বা যোগার্থ দ্বারা সন্দিগ্ধ মন্ত্রাদির বিনিয়োগ প্রভৃতি স্থির করিতে হয় (১)।

আলোচ্য মীমাংসা-শাস্ত্র উপরিউক্ত নিয়মানুসারেই সমস্ত সন্দিগ্ধ বিষয়ে মীমাংসা সংস্থাপন করিয়া থাকে। মীমাংসাশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী স্মৃতিসংহিতাগুলিও উক্ত নিয়মকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, এবং সর্ব্বত্র এই নিয়মানুসারেই আপনাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছে। উপরি লিখিত নিয়মের বিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণযোগ্য হয় না। এ ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে, এবং সুদূর ভবিষ্যতেও যুক্তিযুক্ত এই ব্যবস্থার অন্যথা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

মীমাংসক-মতে কর্ম্মাধিকারী আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—নিত্য চৈতন্যবান্ ও অনেক—দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক আত্মাই স্বকৃত কর্ম্মানুসারে উত্তমাধম ফল-

(১) মীমাংসকগণ একটীমাত্র শ্লোকে শ্রুতি লিঙ্গাদি কথার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্লোকটী এই :—

"শ্রুতির্দ্বিতীয়া ক্ষমতা চ লিঙ্গং বাক্যং পদান্যেব তু সংহতানি।
সা প্রক্রিয়া যা কথমিত্যপেক্ষা স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা॥" ইতি

বিশেষ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; এবং সেই ভোগের অনুরোধেই বিভিন্নপ্রকার দেবাসুরাদি শরীর পরিগ্রহ করে; এই কারণেই প্রবল সুখাভিলাষ সত্ত্বেও সংসারী জীবগণের পক্ষে কর্ম্মানুরূপ দুঃখভোগ অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। এইরূপে দীর্ঘ-কাল দুঃখধারা ভোগ করিতে করিতে জীবগণ যখন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, তখন স্বতই ঐহিক ভোগসুখে বীতরাগ হয় এবং দুঃখ-সম্পর্করহিত নিরাময় সুখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু মানব নিজে তাহার প্রকৃত পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। মীমাংসাদর্শনের নিকট তাহারা সে পথের শুভ সমাচার প্রাপ্ত হয়, মীমাংসাশাস্ত্রই বলিয়া দেয় যে, হে মোহমুগ্ধ মানবগণ, তোমরা যাহা পাইতে চাও, যাহার জন্য এত ব্যাকুল, তোমাদের অভিলষিত সেই অক্ষয় সুখ 'স্বর্গ' নামে পরিচিত,—

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎ সুখং স্বঃ-পদাস্পদম্॥"

অর্থাৎ যাহা কোন সময়ই দুঃখমিশ্রিত হয় নাই, ভবিষ্যতেও দুঃখাক্রান্ত হইবে না, এবং সকলেরই প্রার্থনালব্ধ, এমন দুঃখ-বিরোধী সুখবিশেষের নাম স্বর্গ। জগতে ইন্দ্রিয়ের অগোচর (অতীন্দ্রিয়) কোন সুখ নাই, থাকিতেও পারে না। স্বর্গসুখই সুখের সার—পরমোৎকৃষ্ট। তাদৃশ স্বর্গসুখলাভই জীবের চরম লক্ষ্য মোক্ষ নামে পরিচিত। এতদপেক্ষা অধিকতর প্রার্থনীয় বিষয় জগতে নাই, এবং থাকাও সম্ভব নহে। সেই স্বর্গসুখ-লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে—বেদবিহিত কর্ম্ম। "স্বর্গ-

কামোঽশ্বমেধেন যজেত” স্বর্গাভিলাষী লোক অশ্বমেধ যাগ করিবে। এবং “অক্ষয্যং হবৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি” অর্থাৎ যে ব্যক্তি চাতুর্মাস্য যাগ করেন, তাহার অক্ষয় পুণ্য (পুণ্যফল—সুখ) হইয়া থাকে, ইত্যাদি বেদ-বচন হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্ম-কর্ম্মই তাদৃশ স্বর্গসুখপ্রাপ্তির এক মাত্র উপায়। সেই উপায়ভূত ধর্ম্মের স্বরূপ ও অনুষ্ঠানাদিক্রম নিরূপণের নিমিত্ত মহামুনি জৈমিনি এই বিশাল মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন।

[বিষয়]

মহামুনি জৈমিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই আপনার সেই আন্তরিক অভিপ্রায় বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিতেছেন—

“অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা” ॥ ১।১।১ ॥

‘অথ’ অর্থ—অনন্তর। ‘অতঃ’ অর্থ—এইহেতু। ‘ধর্ম্ম’ অর্থ—পরে যাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইবে। ‘জিজ্ঞাসা’ অর্থ—জানিতে ইচ্ছা, অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা। সম্মিলিত অর্থ এই যে, বেদাধ্যয়নের অনন্তর এইহেতু (যেহেতু বেদে ধর্ম্মের মহিমা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই হেতু) ধর্ম্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে, অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার জন্য বিচার করিবে।

অভিপ্রায় এই যে, মানব উপনয়নের পরই বেদাধ্যয়ন করিবে; কারণ, বেদ সেই প্রকারই আদেশ করিয়াছেন (১)।

(১) বেদ নিজেই আদেশ করিয়াছেন যে, “তং উপনয়ীত, বেদমধ্যাপয়ীত” অর্থাৎ সেই বালককে উপনীত করিবে, এবং তাহাকে বেদ

বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত ব্যক্তি বেদের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের মহিমা ও অভীষ্টার্থ-সাধন-যোগ্যতা জানিতে পারে; কাজেই বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন গৃহাশ্রমে প্রবেশ করেন, তখন তাহার হৃদয়ে আপনা হইতেই ধর্ম্মতত্ত্ব—ধর্ম্ম কি, তাহার লক্ষণ বা পরিচয় কিরূপ, কোনগুলি ধর্ম্মের প্রকৃত সাধন, আর কোনগুলি সাধনা-ভাস (অপ্রকৃত সাধন), এবং কিপ্রকার লোক সেই ধর্ম্মসাধনার অধিকারী, ইত্যাদি বিষয়সমূহ জানিবার জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া থাকে; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বা তদ্বিষয়ক বিচার তাহার পক্ষে অবশ্য-করণীয় কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হয়। এইজন্য সূত্রকার বেদাধ্যয়নের অনন্তর ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অবশ্যম্ভাবিত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে যে, আলোচ্য ধর্ম্মপদার্থ স্বরূপতঃ প্রসিদ্ধ, কি অপ্রসিদ্ধ? যদি প্রসিদ্ধ হয়, তবে ত উহা জ্ঞাতই আছে; তদ্বিষয়ে আর জিজ্ঞাসার আবশ্যকই হয় না; কেন না, বিজ্ঞাত বিষয়ে প্রশ্ন করা ঠিক কাক-দন্ত-পরীক্ষার ন্যায় অসার ও নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, ধর্ম্মতত্ত্ব যদি আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিতান্ত অসৎ বা অপ্রসিদ্ধই হয়, তাহা হইলেও তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা আসিতে পারে না; কারণ, অপ্রসিদ্ধ বা অলীক বিষয়ে উন্মত্ত ভিন্ন কেহ প্রশ্ন করে না এবং করিতেও পারে না। অতএব ধর্ম্মতত্ত্ব প্রসিদ্ধই

অধ্যয়ন করাইবে, এবং "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বেদ অধ্যয়ন করিবে। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিয়াছেন—"উপনীয় দদদ্বেদ আচার্য্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" অর্থাৎ উপনয়ন দিয়া যিনি বেদ শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য, ইত্যাদি।

হউক, আর অপ্রসিদ্ধই হউক, কোন মতেই তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। এতদুত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, ধর্ম্মতত্ত্ব কখনই আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিতান্ত অলীক বা অপ্রসিদ্ধ নহে; বরং জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। জগতে এমন কোনও দেশ বা জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা ধারণা না আছে; কাজেই ধর্ম্মকে একান্ত অপ্রসিদ্ধ বলিতে পারা যায় না। তথাপি বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ধর্ম্মপদার্থ নামতঃ সুপ্রসিদ্ধ হইলেও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। জগতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসকল ধর্ম্মের ছবি বিভিন্ন আকারে অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। অতএব সুপ্রসিদ্ধ হইলেও, ধর্ম্মের স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান থাকায় সহজেই উহার স্বরূপ-সম্বন্ধে সংশয় সমুপস্থিত হইয়া থাকে। সংশয় থাকিলেই মীমাংসার প্রয়োজন হয়। এই জন্য জৈমিনি মুনি জিজ্ঞাসা-সূত্রের পরই ধর্ম্মের স্বরূপ-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, ধর্ম্ম কি? না,—

"চোদনালক্ষণোঽর্থঃ—ধর্ম্মঃ" ॥ ১।১।২ ॥

'চোদনা' অর্থ—ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য। যেমন 'কর' 'করিবে' ইত্যাদি (১)। 'লক্ষণ' অর্থ—চিহ্ন, জ্ঞাপক বা পরিচায়ক।

---

(১) ক্রিয়া বিষয়ে প্রবৃত্তিবোধক 'কর, করিবে' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায়, 'করিও না, করিতে নাই' ইত্যাদি নিবর্ত্তক বাক্যও 'চোদনা' শব্দে গ্রহণ করিতে হইবে। বিধি ও নিষেধরূপে পরিচিত প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক উভয়-প্রকার বাক্যই সূত্রস্থ 'চোদনা' শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

'অর্থ' অর্থ—পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয়। তাদৃশ (ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক) বাক্যদ্বারা যে বিষয়টী বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম।

তাৎপর্য্য এই যে, জগতে যাহা কোন প্রমাণগম্য নহে, তাহার অস্তিত্বও স্বীকারযোগ্য নহে। কোন একটী বিষয় যতক্ষণ কোনও প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ সে বিষয়ের সদ্ভাব-সম্বন্ধে কেহই সংশয়শূন্য হইতে পারে না, এবং কেহ তাহা গ্রহণ করিতেও সম্মত হয় না; এই জন্য, কোনও অবিজ্ঞাত বিষয় বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে, অগ্রেই প্রমাণানুসন্ধান করা আবশ্যক হয়; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বনিরূপণেও সেরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করা অর্থাৎ ধর্ম্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপ-বিজ্ঞানবিষয়ে প্রমাণানুসন্ধান করা অসঙ্গত বা অনুপযোগী নহে।

সূত্রকার জৈমিনির মতে আলোচ্য ধর্ম্মতত্ত্ব একমাত্র শব্দ-প্রমাণগম্য। শব্দাতিরিক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি প্রভৃতি অপর যে সকল প্রমাণ বিভিন্ন দার্শনিকের মতে প্রসিদ্ধ আছে, সে সকল প্রমাণ বিষয়ান্তরে সমর্থ হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে প্রমিতি বা যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদনে, সমর্থ হয় না। কারণ, যে সকল উপকরণ বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সমূহ কার্য্যকারী হয়, ধর্ম্মে সে সকল উপকরণের অত্যন্ত অভাব। ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া ধর্ম্ম বস্তুটী প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না; এবং উপযুক্ত হেতু বিদ্যমান না থাকায় অনুমানেরও বিষয় হয় না। অনুমানের অবিষয় বলিয়াই অবশিষ্ট উপমানাদি প্রমাণেরও

বিষয়ীভূত হয় না (১); কিন্তু প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের অবিষয় বলিয়াই যে, উহা অপ্রামাণিক বা অসৎকল্প, একথা বলিতে পারা যায় না। কেন না, শব্দ-প্রমাণ (বেদ) দ্বারা উহার স্বরূপ ও সদ্ভাব প্রমাণিত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, অপৌরুষেয় বেদ 'কুর্য্যাৎ' 'কর্ত্তব্যম্' ইত্যাদি প্রকারে যাহার কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন, এবং যাহার অনুষ্ঠানে কোন প্রকার লৌকিক ফল পরিদৃষ্ট হয় না, তাহাই ধর্ম্ম, আর যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই অধর্ম্ম (২)। ইহাই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সর্ব্বসম্মত সাধারণ লক্ষণ (৩)।

---

(১) অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে ধর্ম্মের অস্তিত্বমাত্র সম্ভাবিত হইতে পারে; কিন্তু উহার স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না। শব্দই উহার স্বরূপ-নিরূপণের একমাত্র প্রমাণ। শব্দই ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া দিতে পারে। গঙ্গাস্নান যে ধর্ম্মজনক পুণ্য কর্ম্ম, ইহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি দ্বারা জানিতে পারা যায় না; শব্দ (শাস্ত্র) হইতেই জানিতে পারা যায়। শাস্ত্র বলিয়াছে বলিয়াই জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গাস্নানে পুণ্য হয়।

(২) মীমাংসকগণ ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক বিধিবাক্য বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—

"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।
এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥"

অর্থাৎ বিধিবাক্য চিনিবার উপায় এই পাঁচটী—কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত, কর্ত্তব্যং, ভবেৎ ও স্যাৎ। ইহা ছাড়াও বিধির পরিচায়ক অনেক বাক্য আছে।

(৩) ভাগবত বলিয়াছেন—"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" ইত্যাদি। বেদে বৃষ্টির জন্য 'কারীর' যাগের এবং পুত্রপ্রাপ্তির জন্য 'পুত্রেষ্টি' নামক যাগের বিধান দৃষ্ট হয় সত্য, বস্তুতঃ লৌকিক ফলসাধক সেই সকল কার্য্য ফল-লাভের উপায়মাত্র, প্রকৃত ধর্ম্ম-পদবাচ্য নহে। শব্দের নিত্যতা ও বেদের অপৌরুষেয়তাবিষয়ে বক্তব্য সমস্ত কথা প্রথম খণ্ডে উক্ত হইয়াছে।

সূত্রকারও এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—"চোদনা-লক্ষণঃ অর্থঃ—ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ নিয়োগবোধক 'কুরু' 'কুর্য্যাৎ' ইত্যাদি প্রবর্ত্তক বাক্যদ্বারাই ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে ঐ প্রকার বেদবাক্য বিদ্যমান আছে, তাহাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণীয়। ঐজাতীয় বেদবাক্য ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। বেদশব্দই এবিষয়ে নিরঙ্কুশ প্রমাণ।

[বিধি ও তাহার বিভাগ।]

ক্রিয়াবিষয়ে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবোধক বাক্যকে বিধি বলে। প্রবর্ত্তক বাক্য যেরূপ লোককে হিতসাধনে প্রবর্ত্তিত করে, নিবর্ত্তক বাক্যও সেইরূপই লোককে অনিষ্টসাধন ক্রিয়াপথ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, এইজন্য নিষেধক বাক্যগুলিও 'নিষেধ-বিধি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফল কথা, আরোগ্যকামী ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ পথ্য-সেবন ও অপথ্য-বর্জ্জন উভয়ই আবশ্যক, সেইরূপ শ্রেয়স্কামী পুরুষের পক্ষেও সৎকার্য্য গ্রহণ ও অসৎ কার্য্য পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক। আবশ্যক বলিয়াই বেদশাস্ত্র পুরুষের হিতসাধন ও অহিত পরিবর্জ্জনের জন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই উপদেশ করিয়াছেন। এবংবিধ উপদেশেই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও সার্থকতা, তদতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়ের উপদেশ-সকল উহারই আনুষঙ্গিক—প্রসঙ্গাগতমাত্র; সুতরাং সে সকল উপদেশক বাক্যের সার্থকতা ও সফলতা সম্পূর্ণরূপে বিধিবাক্যের সহিত

একবাক্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এখন বিধি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

বেদের ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—বিধি, অর্থবাদ ও তদুভয়বিলক্ষণ। তন্মধ্যে বিধির স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া আচার্য্যগণ বিভিন্নপ্রকার মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। বার্ত্তিককার মহামতি কুমারিল ভট্টের মতানুযায়ীরা বলেন—বিধি অর্থ শাব্দী ভাবনা—শব্দনিষ্ঠ একপ্রকার শক্তি; যাহার প্রেরণাবশে মানবগণ অদৃষ্টোৎপাদক ধর্ম্ম-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাদৃশ ব্যাপারবিশেষ। প্রভাকরের মতানুযায়ী আর এক শ্রেণীর মীমাংসকগণ বলেন—'কুরু' (কর) ইত্যাদিপ্রকার নিয়োগই যথার্থ বিধি। তার্কিকগণ আবার এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া বলেন যে, বিধি অর্থ—ইষ্ট-সাধনতা। "অশ্বমেধেন যজেত", এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকে বুঝিয়া থাকে যে, এই অশ্বমেধ যজ্ঞ আমার অভীষ্ট স্বর্গ-সুখপ্রাপ্তির সাধন বা উপায়। এইরূপ জ্ঞান হয় বলিয়াই লোকে ঐ অশ্বমেধ যাগে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যে কার্য্যে ঐ প্রকার ইষ্টসাধনতা-বোধ না হয়, সে কার্য্যে কেহই প্রবৃত্ত হয় না ইত্যাদি। যাহা হউক. বিধি সম্বন্ধে এবংবিধ আরও যথেষ্ট বিপ্রতিপত্তি বিদ্যমান আছে সত্য, কিন্তু—"অজ্ঞাত-জ্ঞাপকো বিধিঃ" এ সিদ্ধান্তে কাহারো আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিধির স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও উহার বিভাগ বিষয়ে মতভেদ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকলের মতেই বিধি

সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত—এক উৎপত্তিবিধি, দ্বিতীয় অধিকারবিধি, তৃতীয় বিনিয়োগবিধি, চতুর্থ প্রয়োগবিধি (১)। তন্মধ্যে যে বিধি কেবলই কর্ম্ম ও কর্ম্মাঙ্গ দেবতার স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন করে, তাহার নাম উৎপত্তিবিধি। যেমন "আগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালো ভবতি।" এবাক্যে 'আগ্নেয়' (অগ্নিদৈবতক) যাগের স্বরূপটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ইহা উৎপত্তিবিধিরূপে পরিগণিত হইল। আর যে বিধি কেবল ইষ্টসিদ্ধির উপায়ভূত (করণ) যাগাদি কর্ম্মের ইতিকর্ত্তব্যতা (পূর্ব্বাপর করণীয় ব্যাপার সমূহ) ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মফল প্রাপ্তির সাধক অধিকার সম্বন্ধ প্রতিপাদন করে, সেই বিধিকে অধিকারবিধি বলে। যেমন—"দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত", অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ 'দর্শ-পূর্ণমাস' নামক যাগ করিবে। এখানে কেবল যাগেরই কথা বলা হয় নাই, পরন্তু দর্শে (অমাবস্থায়) ও পূর্ণিমায় করণীয় ইতি-কর্ত্তব্যতার কথা বলা হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে যাগ-লভ্য স্বর্গ-ফলেরও কথা বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা জ্ঞাপন করা হইল যে, যে লোক স্বর্গলাভে ইচ্ছুক, সেই লোকই উক্ত 'দর্শ-পূর্ণমাস' যাগের অধিকারী। এইরূপে কর্ম্মাধিকার প্রতিপাদন করে বলিয়া উল্লিখিত বিধিকে 'অধিকারবিধি' বলা হয়। যজ্ঞাদি কার্য্যে যেমন অধিকারি-বিজ্ঞান আবশ্যক, তেমনই যজ্ঞাঙ্গ উপচার-

(১) নিয়মবিধি, অপূর্ব্ববিধি ও পরিসংখ্যাবিধি প্রভৃতি বিধিভেদগুলিও উক্ত বিভাগেরই অন্তর্গত; সুতরাং সেগুলির পৃথক্ গণনা অনাবশ্যক। পরে আমরা এবিষয়ের আলোচনা করিব।

দ্রব্যাদির সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও নিতান্ত আবশ্যক। কোন্ যজ্ঞে কোন্ দ্রব্যদ্বারা কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে কি প্রকারে আহুতি প্রদান করিতে হয়, তাহা জানা না থাকিলে যজ্ঞ-সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় না; এইজন্য বিনিয়োগবিধিরও আবশ্যক হয়। যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যাদি-প্রতিপাদক বিধির নাম বিনিয়োগবিধি। যেমন, "ব্রীহিভির্যজেত", ব্রীহি (হৈমন্তিক ধান্য) দ্বারা যাগ করিবে। এবং "সমিধো যজতি" অর্থাৎ—দর্শ-পূর্ণমাসযাগের অঙ্গস্বরূপ 'সমিধ্' নামক যাগ করিবে ইত্যাদি। ইহার পরেও, যাগাদির অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও পারম্পর্য্যাদিক্রম প্রভৃতি জানিবার আবশ্যক হয়, যতক্ষণ এ সমস্ত বিষয় জানিতে পারা না যায়, ততক্ষণ কোন কর্ম্মই যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, এই কারণে 'প্রয়োগবিধি'র নিরূপণ করা আবশ্যক হয়। প্রয়োগবিধি কিরূপ? যে বিধিদ্বারা অঙ্গাঙ্গিভাবাপন্ন কর্ম্ম ও তদুপযোগী দ্রব্যাদির পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রতিপাদিত হয়, সেই বিধির নাম প্রয়োগবিধি। যেমন—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যবাগূং পচতি" অর্থাৎ অগ্রে যবাগূ (যাউ) পাক করিবে, পশ্চাৎ অগ্নিহোত্র হোম করিবে। এখানে পূর্ব্বপশ্চাৎ-কর্ত্তব্য যবাগূপাক ও অগ্নিহোত্র-হোম, উভয়ই তুল্যরূপে বিহিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা প্রয়োগ-বিধির উদাহরণস্থল (১)।

---

(১) এই বিধি সম্বন্ধে মীমাংসক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন—স্বয়ং শ্রুতিই যাগাদির প্রয়োগ-ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং উহা শ্রৌত, আবার অন্য সম্প্রদায় বলেন—না—যাগাদির প্রয়োগ-

[নিয়ম ও পরিসংখ্যা বিধি।]

বিধির আরও দুইটী প্রকারভেদ আছে। একটীর নাম নিয়মবিধি, অপরটীর নাম পরিসংখ্যাবিধি। বস্তুতঃ এ দুইটীর স্বতন্ত্রতা না থাকিলেও সর্ব্বত্র পৃথক্ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়; সুতরাং তদুভয়েরও স্বরূপ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। যেখানে কর্ত্তার স্বাভাবিক অনুরাগবশে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা আছে; অথচ সে কার্য্য করা বা না করা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, সেখানে প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা অর্থাৎ কার্য্যবিশেষের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা স্থাপন করাই নিয়মবিধির বিষয়;—"নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।" যেমন, "ঋতৌ ভার্য্যাম্ উপেয়াৎ।" ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত হইবে। এস্থলে দেখিতে হইবে যে, মানুষ স্বাভাবিক অনুরাগের বশে স্বতই ভার্য্যাতে উপগত হইয়া থাকে, তাহার জন্য আর শাস্ত্রোপদেশ আবশ্যক হয় না; কিন্তু ঋতুকালে উপগত হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণরূপে তাহার ইচ্ছাধীন—সে ইচ্ছা করিলে উপগত হইতেও পারে, না হইতেও পারে; এইরূপ পাক্ষিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা স্থলে শাস্ত্রবিধির দ্বারা ঐ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া দিলেন—'উপেয়াদেব' ঋতুকালে অবশ্যই উপগত হইবে। আর একটী উদাহরণ এই যে, "শ্রাদ্ধশেষং ভুঞ্জীত" অর্থাৎ

ব্যবস্থা সাক্ষাৎ শ্রুতিবিহিত নহে, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বিধি-শ্রুতি কল্পনা করিয়া লইতে হয়; সুতরাং উহা কল্প্য অর্থাৎ কল্পনা করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু উহা স্থলবিশেষে শ্রৌতও হইতে পারে, আবার স্থলবিশেষে কল্প্যও হইতে পারে।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের অবশিষ্ট অংশ ভোজন করিবে। এস্থলেও বুঝিতে হইবে যে, লোকের ভোজনে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক অনুরাগসিদ্ধ, তজ্জন্য শাস্ত্রোপদেশ অনাবশ্যক। কিন্তু শ্রাদ্ধশেষ-ভোজনে লোকের প্রবৃত্তি হইতেও পারে, পক্ষান্তরে না হইতেও পারে, কারণ, প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি, উভয়ই ইচ্ছাধীন। এমত অবস্থায় বিধিশাস্ত্র লোক-প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"ভুঞ্জীতৈব" শ্রাদ্ধশেষ অবশ্যই ভোজন করিবে। এই-জাতীয় স্থানগুলি নিয়মবিধির বিষয়। পরিসংখ্যার স্বরূপ ও প্রয়োজন ইহা হইতে অন্য প্রকার। যে বিষয়ে লোকের স্বাভাবিক অনুরাগ আছে, এবং অনুরাগবশে উচ্ছৃঙ্খলভাবে যথেচ্ছ প্রবৃত্তির সম্ভাবনাও রহিয়াছে, সে বিষয়ে যথেচ্ছ প্রবৃত্তির সংকোচ সাধন করাই পরিসংখ্যার প্রয়োজন। যেমন—"পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত" অর্থাৎ পঞ্চনখবিশিষ্ট পাঁচটীমাত্র প্রাণীকে ভোজন করিবে। ভোজন বিষয়ে লোকের অনুরাগ স্বভাবসিদ্ধ। সেই অনুরাগের বশে যে কোন প্রাণীর মাংস-ভক্ষণে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারিত—পঞ্চনখবিশিষ্ট এবং তদ্ভিন্ন প্রাণীরও মাংস-ভক্ষণে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা ছিল, সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির সংকোচ সাধনের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র আদেশ করিলেন—"পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত" অর্থাৎ যদি মাংস ভক্ষণ করিতেই হয়, তবে পঞ্চনখবিশিষ্ট পাঁচটীমাত্র প্রাণীর মাংসই ভক্ষণ করিবে; অন্য প্রাণীর নহে। আর একটী উদাহরণ এই—"প্রোক্ষিতং ভুঞ্জীত" প্রোক্ষিত অর্থাৎ মন্ত্রসংস্কৃত মাংস ভক্ষণ করিবে। এস্থলেও প্রোক্ষিত ও অপ্রোক্ষিত উভয়বিধ

মাংস-ভক্ষণেরই সম্ভাবনা ছিল, তন্মধ্যে অপ্রোক্ষিত মাংস-ভক্ষণের নিবৃত্তিব্যপদেশে শাস্ত্র বলিলেন যে, যদি মাংস-ভক্ষণ কর, তবে প্রোক্ষিত মাংসই ভক্ষণ করিবে, অপ্রোক্ষিত ভক্ষণ করিবে না। উক্ত উভয় উদাহরণেই ভক্ষণের অনুজ্ঞায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, পরন্তু তদ্ভিন্ন ভক্ষণের নিবৃত্তিতে তাৎপর্য্য।

এখানে বলা আবশ্যক যে, নিয়ম ও পরিসংখ্যা, ইহার কোনটীই যথার্থ বিধি নহে। কারণ, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাপিত করাই বিধির মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু নিয়ম বা পরিসংখ্যা কখনও অবিজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাপিত করে না, পরন্তু লোকে যাহা জানে, এবং আন্তরিক অনুরাগের প্রেরণাবশে যাহা করে বা করিতে পারে, তাদৃশ বিষয়েই উহারা অনিয়মিত প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করে, এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে সংকোচিত করে মাত্র; কাজেই নিয়ম ও পরিসংখ্যা, কোনটীই বিধিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। তথাপি, প্রবৃত্তির পরিপন্থী নিবর্ত্তক বাক্য যেভাবে নিষেধ-বিধি নামে পরিচিত হয়, প্রবৃত্তির নিয়ামক ও সংকোচ-সাধক বাক্যগুলিও সেই ভাবেই নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১)।

---

(১) মীমাংসকগণ বলেন—

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥"

অর্থাৎ অন্য কোন প্রমাণে অপ্রাপ্ত বিষয়ে (অজ্ঞাতজ্ঞাপক) হয়— বিধি। পাক্ষিক প্রাপ্ত বিষয়ে হয় নিয়ম। অভিপ্রেত বিষয়ে এবং তদ্ভিন্ন বিষয়েও প্রাপ্তির সম্ভাবনাস্থলে হয় পরিসংখ্যা।

ইহা ছাড়া আরও কয়েক প্রকার বিধির বিভাগ আছে—যেমন, অঙ্গবিধি, গুণবিধি ও বিশিষ্টবিধি প্রভৃতি। তন্মধ্যে, যাহা দ্বারা কোন একটী প্রধান কর্ম্মের উপকারার্থ অঙ্গবিশেষের বিধান করা হয়, তাহার নাম অঙ্গবিধি। যেমন দর্শ-পূর্ণমাসযাগে সমিধাদি যাগের বিধি—"সমিধো যজতি" ইত্যাদি। অঙ্গ সাধারণতঃ দুই প্রকার। এক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রধানের উপকারক বা স্বরূপনির্ব্বাহক, অপর পরম্পরাসম্বন্ধে প্রধানের উপকারক। যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব। অশ্বটী অঙ্গ হইলেও, যজ্ঞের স্বরূপ-নির্ব্বাহক; কারণ, অশ্বের অভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। আর যজ্ঞে ব্রীহিপ্রোক্ষণাদি কার্য্যগুলি যজ্ঞের অঙ্গ হইলেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যজ্ঞোপকারক নহে, পরন্তু যজ্ঞজনিত প্রধান অপূর্ব্বের সঙ্গে মিলিত হইয়া যজ্ঞফলের উৎকর্ষ সম্পাদক হয় মাত্র।

যেখানে যজ্ঞের উপকরণরূপে বিহিত বস্তুতে কোন প্রকার গুণবিশেষের মাত্র বিধান করা হয়, সেখানে হয় গুণবিধি। যেমন যজ্ঞে আহুতি প্রদানের জন্য একপ্রকার পাত্র বিহিত আছে। তাহার নাম 'জুহু'। জুহু পাত্রটী সাধারণতঃ কাষ্ঠময়ই হইয়া থাকে, সেস্থলে গুণবিধি হইল—"যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি, ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি" অর্থাৎ যে যজমানের সেই হোমপাত্র জুহূটী পত্রনির্ম্মিত হয়, সে কখনও পাপ কথা শ্রবণ করে না। এস্থলে জুহূর পর্ণময়ত্ব গুণ বিহিত হওয়ায় ইহা 'গুণবিধি' নামে অভিহিত হইল।

যেখানে যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যাদি-সহকারে যজ্ঞের বিধান করা হয়, সেখানকার বিধিকে 'বিশিষ্ট বিধি' বলা হয়। যেমন "সোমেন যজেত স্বর্গকামঃ" অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ সোমযাগ করিবেন। এস্থলে যেমন যজ্ঞের বিধান হইল, সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞোপকরণ সোমেরও বিধান করা হইল। এইজাতীয় অঙ্গসহকৃত বিধিকে বিশিষ্ট বিধি কহে।

[অঙ্গ ও প্রধান কর্ম্ম।]

বিধিবোধিত কর্ম্ম প্রধানতঃ দ্বিবিধ—প্রধান কর্ম্ম ও অঙ্গ কর্ম্ম। যাহা অন্যের প্রকরণে পঠিত নহে, এবং যাহার অনুষ্ঠানে ফলবিশেষ অভিহিত আছে, তাহা প্রধান কর্ম্ম। আর যাহা অন্যের প্রকরণে পঠিত, এবং যাহার অনুষ্ঠানে স্বতন্ত্রভাবে কোনরূপ ফলবিশেষের উল্লেখ নাই, তাহা অঙ্গ কর্ম্ম—"ফলবৎ-সন্নিধাবফলং তদঙ্গম্।" [৩।২।৫] ফলবিশিষ্ট কর্ম্মবিধির সন্নিধানে পঠিত ফল-রহিত কর্ম্ম সাধারণতঃ সেই সন্নিহিত সফল কর্ম্মেরই অঙ্গরূপে পরিগণিত। যেমন, 'দর্শ-পূর্ণমাস' নামে একটী যাগ বিহিত আছে, সেই প্রকরণে, সমিধাদি যাগও বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দর্শ-পূর্ণমাস যাগটী অন্যের প্রকরণে পঠিত নহে, স্বপ্রকরণস্থ, এবং উহার অনুষ্ঠানে স্বর্গ ফলেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু সমিধাদি যাগগুলি প্রথমতঃ স্বপ্রকরণস্থ নহে—দর্শ-পূর্ণমাস যাগের প্রকরণস্থিত, অধিকন্তু উহাদের অনুষ্ঠানে কোনপ্রকার ফলশ্রুতিও উপস্থিত নাই; সুতরাং ঐ যাগগুলি সন্নিহিত দর্শ-পূর্ণমাস যাগেরই অঙ্গ, কিন্তু স্বপ্রধান কর্ম্মান্তর নহে।

[উৎপত্তিবিধির প্রভেদ।]

পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তিবিধি সম্বন্ধে আর একটী বক্তব্য বিষয় এই যে, প্রমাণান্তরে বা প্রকারান্তরে অপ্রাপ্ত বা অবিজ্ঞাত বিষয়কে বিজ্ঞাপিত করাই সাধারণতঃ উৎপত্তিবিধির স্বভাব বা কার্য্য। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এইরূপ বিধি না থাকিলে কেহ জানিত না যে, 'অগ্নিহোত্র' হোমদ্বারা স্বর্গলাভ করিতে পারা যায়। উল্লিখিত বিধি হইতেই লোকে অগ্নিহোত্র কর্ম্ম ও তাহার স্বর্গ-সাধনতা জানিতে পারে; সুতরাং উক্ত বিধিটী কর্ম্মমাত্র-বিধায়ক উৎপত্তিবিধিরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু যেখানে প্রকারান্তরপ্রাপ্ত কর্ম্ম সম্বন্ধেও কোনরূপ বিধি দৃষ্ট হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে, ঐ বিধিটী কর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞাপন করিতেছে না, কিন্তু ঐ কর্ম্ম সম্বন্ধে কোনপ্রকার গুণের (কর্ম্মোপযোগী দ্রব্যাদির) বিধানমাত্র করিতেছে, (কারণ, ঐ কর্ম্ম প্রকারান্তরেই প্রাপ্ত আছে)। যেমন অগ্নিহোত্রনামক যাগের প্রকরণে—"দধ্না জুহুয়াৎ" স্থলে হোমের বিধি। অগ্নিহোত্র যাগেই হোমের বিধি পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং এখানে তাহার উপদেশ অজ্ঞাত-জ্ঞাপক—বিধি হইতে পারে না; কাজেই পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত কেবল দধিরূপ গুণমাত্রের বিধান করা হইয়াছে। এইজাতীয় বিধিকে গুণবিধি বলা হয়, আর যেখানে কর্ম্ম ও তাহার গুণ—উভয়ই অপ্রাপ্ত থাকে, সেখানকার বিধি, কর্ম্ম ও গুণ—উভয়ই প্রতিপাদন করে বলিয়া বিশিষ্টবিধি নামে কথিত হয়। যেমন, "সোমেন যজেত"। এস্থলে যাগও অপ্রাপ্ত, এবং তদুপকরণ সোম দ্রব্যও অপ্রাপ্ত;

এইজন্য উক্ত বিধি সোমবিশিষ্ট যাগের বিধান করিতেছে, বুঝিতে হইবে। ফলিতার্থ এই যে, অবিজ্ঞাত কর্ম্মমাত্রের প্রতিপাদক হইবে সামান্যতঃ 'উৎপত্তিবিধি,' আর বিজ্ঞাত কর্ম্মের গুণমাত্র-বোধক হইবে 'গুণবিধি', এবং গুণ ও কর্ম্ম উভয়ই অবিজ্ঞাত থাকিলে, তদুভয়ের প্রতিপাদক বিধি হইবে বিশিষ্টবিধি। এ নিয়ম বিধিকাণ্ডের সর্ব্বত্র আদৃত ও অনুসৃত হইয়া থাকে।

লোক-ব্যবহারে যেরূপ একজন আর একজনকে আদেশাদি দ্বারা বিভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়, এবং আদেশবাক্য শ্রবণের পর শ্রোতাও বুঝিতে পারে যে, এ ব্যক্তি আমাকে অমুক কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে। অপৌরুষেয় বেদে যদিও সেরূপ আদেশ-কারী কোন লোক নাই সত্য, তথাপি আদেশকের অভাব ঘটে নাই, 'লিঙ্' প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়গুলিই সে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। ঐ সকল বিধিপ্রত্যয়ই লোকদিগকে হিতাহিত প্রাপ্তি-পরিহারের জন্য আদেশ করিয়া থাকে। লোক সকলও ঐরূপ বিধিশ্রবণে বুঝিয়া থাকে যে; বেদ আমাদিগকে স্বর্গাদিফলোৎপাদনার্থ অমুক কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছেন। এই যে, নিয়োজন-ব্যাপার, ইহাকেই মীমাংসাশাস্ত্রে 'ভাবনা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহারও আবার 'শাব্দী' ও 'আর্থী' ভেদে দুইটী বিভাগ আছে। তাহার ব্যাখ্যা পরে বলিব। সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে 'ভাবনা' অর্থ—উৎপাদনা। এই উৎপাদনার কথা শ্রবণ-মাত্রেই শ্রোতার তিনটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়—"কিম্? কেন? ও কথম্?" অর্থাৎ কি ভাবনা করিতে হইবে? কিসের

দ্বারা ভাবনা করিতে হইবে? এবং কি প্রকারে করিতে হইবে? এইরূপে সাধ্য, সাধন ও তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে (পূর্ব্বাপর করণীয় অনুষ্ঠান প্রণালী সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। সেই জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য বিধির সঙ্গে ঐ তিনটী বিষয়ও উপদিষ্ট হয়। যেমন "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত।" এস্থলে স্বর্গ হইতেছে—সাধ্য (কিম্), অশ্বমেধ যাগ হইতেছে তাহার সাধন বা উপায় (কেন), আর ঐ প্রকরণে অভিহিত কর্ত্তব্য-প্রণালী হইতেছে ইতিকর্ত্তব্যতা (কথম্)। বিধির প্রশংসাপর অর্থবাদ বাক্য হইতেও অনেক স্থলে 'ইতিকর্ত্তব্যতা' অবগত হওয়া যায়।

এস্থলে আর একটী বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, যেখানে 'ভাবনা'র বিষয়ীভূত সাধ্য বিষয়ের (ফলের) স্পষ্ট উল্লেখ না থাকে, সেখানে সাধারণতঃ—

"স স্বর্গঃ স্যাৎ, সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ॥" ৪।৩।১৫॥

এই সূত্রানুসারে স্বর্গকেই সাধ্য ফলরূপে গ্রহণ করিতে হয়। কেন না, ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে স্বর্গসুখ সকলেরই প্রিয়। এইরূপে সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতা পরিজ্ঞানের পর অধিকারী পুরুষ বিধিনির্দ্দিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

[মন্ত্র]

বেদবিহিত যাগাদি কর্ম্মের স্বরূপ দ্বিবিধ—দ্রব্য ও দেবতা। এই দ্রব্য ও দেবতা লইয়াই যাগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত উভয় অংশের মধ্যে দ্রব্যরাশি হয় যাগনির্ব্বাহক সাধন, আর দেবতা হয় তাহার উদ্দেশ্য। কর্ম্মোপযুক্ত মন্ত্রসমূহ সেই যাগ-

সম্পর্কিত দ্রব্যাদি-বিষয়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। অভিপ্রায় এই যে, যে দেবতার উদ্দেশ্যে যে দ্রব্য যেভাবে সমর্পণ করিতে হইবে, মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল বিষয় সহজেই ঋত্বিকের হৃদয়ে জাগরিত (স্মরণের বিষয়) হয়। "মন্ত্রৈরেব হি স্মর্ত্তব্যম্" এই আদেশানুসারে মন্ত্রভিন্ন অন্য উপায়ে সে সকল বিষয়ের স্মরণ করা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং যাগোপযোগী দ্রব্যাদি-স্মরণের জন্য মন্ত্রেরই সাহায্য লইতে হয়; এইজন্যই মন্ত্রসমূহকে স্মারক বলা হইয়া থাকে। মীমাংসকমতে এই স্মৃতিসম্পাদকরূপেই মন্ত্রসমূহ কর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ; এবং কর্ম্ম-সম্বদ্ধ বলিয়াই উহারাও কোনরূপে নিজের সার্থকতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ ॥ ১।২।২৫ ॥

অর্থাৎ অক্রিয়াপর সিদ্ধার্থ-বোধক বাক্যসমূহও ক্রিয়াবিধায়ক বাক্যের সহিত মিলিত হইয়া সার্থকতা লাভ করে; নচেৎ সমস্ত মন্ত্রই অনর্থক ও অপ্রমাণরূপে উপেক্ষণীয় হইতে পারে।

প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রের স্বরূপ ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কাহারো মতে মন্ত্র সকল দৃষ্টার্থক—কর্ত্তব্য কর্ম্মোপযোগী পদার্থরাশি স্মরণ করাইয়া দেওয়াই উহাদের কার্য্য বা উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন অদৃষ্ট সমুৎপাদন বা অলৌকিক ফল-সম্পাদন করা উহাদের উদ্দেশ্য নহে। এইমতে অশরীর দেবতার মন্ত্রময়ত্ব কথা সঙ্গত হয় না। কেন না, মন্ত্র ও দেবতা এক হইলে—মন্ত্র-সমূহ দ্বারা যজ্ঞীয় দেবতার স্মরণ করা কখনই সম্ভবপর হইতে

পারে না, অধিকন্তু বেদোক্ত মন্ত্রগুলি কেবলই স্মরণকার্য্যে পর্য্যবসিত হইলে অলৌকিক মন্ত্রশক্তি স্বীকার করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন বা অবসর থাকে না। পক্ষান্তরে, যাহারা মন্ত্রের চেতনাশক্তি ও অলৌলিকার্থ সাধনসামর্থ্য স্বীকার করেন, তাহাদের মতে মন্ত্রের মহিমা এবং 'মন্ত্রৈরেব স্মর্ত্তব্যম্' এ কথারও সার্থকতা রক্ষিত হইতে পারে, এবং পূর্ব্বপ্রদর্শিত আপত্তিও খণ্ডিত হইতে পারে। এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসার ভার সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরই ন্যস্ত রহিল। অতঃপর অর্থবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

[অর্থবাদ]

আমরা বিধির কথা বলিতে বলিতে প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রের সম্বন্ধেও কয়েকটী কথা বলিলাম। পূর্ব্বনির্দ্দেশক্রমে এখন অর্থবাদের কথা বলা আবশ্যক; অতএব তাহাই বলা হইতেছে। অর্থবাদ কি?—

প্রাশস্ত্য-নিন্দান্যতরপরবাক্যম্ অর্থবাদঃ॥" (অর্থসংগ্রহ ৬৫)।

প্রশংসা ও নিন্দা, এতদন্যতর-বোধনে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট বাক্যের নাম—'অর্থবাদ'। বিধিস্থলে বিধেয় বিষয়ের প্রশংসা দ্বারা, আর নিষেধের স্থলে নিষেধ্য বিষয়ের নিন্দা দ্বারা যে বাক্য সার্থকতা লাভ করে, যথাশ্রুত বাক্যার্থে তাৎপর্য্য পোষণ করে না, সেই সকল বাক্যই অর্থবাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য, তদ্বিপরীত বাক্যমাত্রই নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক; সুতরাং অপ্রমাণ। তদনুসারে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির অনুপদেশক "বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি, এবং "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদি বাক্যগুলি

নিরর্থক—অপ্রমাণরূপে উপেক্ষিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় স্বয়ং সূত্রকার বলিয়াছেন—ঐ সকল বাক্য সাক্ষাৎ ক্রিয়া-প্রতিপাদক না হইলেও নিরর্থক নহে; পরন্তু—

"বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ ॥" (১।২।৭)

বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া অর্থাৎ বিধিবোধিত কর্ম্মের সহিত কোনরূপ তাৎপর্য্য-সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া বিধিরই স্তাবক-রূপে সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। এখানে স্তুতি অর্থে প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, লোকদিগকে শুভ-কার্য্যে প্রবৃত্ত ও অশুভ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই বেদশাস্ত্র বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু ঐ বিধি ও নিষেধের এতটা প্রভাব নাই যে, রাজাজ্ঞার ন্যায় বলপূর্ব্বক লোক-দিগকে নিজের আদেশপালনে বাধ্য করিতে পারে। এজন্য বিধি-শক্তি পদে পদে প্রতিহত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। সেই অবসাদ অপনয়নপূর্ব্বক বিধিশক্তির বল-বৃদ্ধির জন্য 'অর্থবাদ' বাক্যের আবশ্যক হয়। অর্থবাদ বাক্যগুলি বিধেয় কর্ম্মের প্রশংসা বা উৎকর্ষ কীর্ত্তন দ্বারা বিধির, আর নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিন্দা দ্বারা নিষেধের শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া তদ্বিষয়ে লোকদিগের শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা সমুৎপাদন করে; এইজন্য 'অর্থবাদ' বাক্যকে বিধি-নিষেধের সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। উক্ত 'অর্থবাদ' বাক্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। তন্মধ্যে—

"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাবর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ ॥"

যেখানে প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ কথা উক্ত হয়, সেখানে হয় 'গুণবাদ।' যেমন "আদিত্যো যূপঃ।" (যূপকাষ্ঠটী আদিত্য।) যূপকাষ্ঠকে যে, আদিত্য বলা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ; সুতরাং যূপ স্বরূপতঃ আদিত্য না হইলেও, উহাকে আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল—প্রকাশসম্পন্ন বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে, এইরূপে যূপের গুণোৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদক অর্থবাদ বাক্যকে বলা হয় 'অনুবাদ।' যেমন—"অগ্নিঃ হিমস্য ভেষজম্" (অগ্নি হইতেছে হিমের ঔষধ)। অগ্নি যে হিমের নিবারক (ঔষধ), তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; কাজেই তদ্বোধক উক্ত বাক্যকে অনুবাদ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আর যে বাক্যে, প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ নহে এবং প্রমাণান্তর-সিদ্ধও নহে, এমন বিষয় প্রতিপাদিত হয়, সেই বাক্য হয়—ভূতার্থবাদ। যেমন—"ইন্দ্রঃ বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ" (ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদ্দেশ্যে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন)। এ কথা কোন প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, অথবা প্রমাণান্তরসিদ্ধ কথার পুনরাবৃত্তিও নহে; সুতরাং ইহা 'ভূতার্থবাদ' নামে পরিগণনীয়।

মীমাংসা-পরিভাষার মতে অর্থবাদের বিভাগ অন্যপ্রকার। সে মতে অর্থবাদ চারিভাগে বিভক্ত—নিন্দা, প্রশংসা, পরকৃতি ও পুরাকল্প। তন্মধ্যে "অশ্রুজং হি রজতং যো বর্হিষি দদাতি, পুরাস্য সংবৎসরাদ্ রুদন্তি," অর্থাৎ অগ্নির অশ্রুজাত রজতকে যিনি অগ্নির উদ্দেশ্যে দান করেন, সংবৎসরের মধ্যে তাহার গৃহে রোদন উপস্থিত হয়। ইহা "বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" এই রজতদান নিষেধের
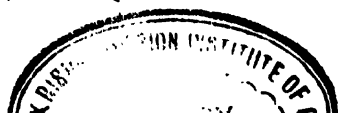
নিন্দার্থবাদ। "শোভতে হাস্য মুখং, য এবং বেদ" যিনি এইরূপ জানেন, তাহার মুখ সুশোভিত হয়। ইহা প্রশংসার্থবাদ। কর্ম্মে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে যেখানে কর্ম্মটীকে কোন মহাত্মার অনুষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়, সেই অর্থবাদ পরকৃতি নামে অভিহিত হয়। যেমন "অগ্নির্বৈ অকাময়ত।" অগ্নি কামনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই যাগটী অগ্নিকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; সুতরাং এই যাগ খুব প্রশস্ত। আর যে অর্থবাদে কেবল অপর বক্তার উপদিষ্ট কার্য্যাদি মাত্র প্রতিপাদিত হয়, তাহার নাম 'পুরাকল্প'। যেমন "তমশপৎ ধিয়া ধিয়া" তাহাকে মনে মনে অভিসম্পাৎ করিয়াছিল। এখানকার অর্থবাদে অপর বক্তার অভিসম্পাতের কথামাত্র বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা 'পুরাকল্প' মধ্যে গণনীয়।

ন্যায়প্রকাশকার আপোদেব কিন্তু এরূপ বিভাগে পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি অর্থবাদের সহজতঃ দুই প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, এক বিধিশেষ, অপর নিষেধশেষ। যেখানে বিধেয় বিষয়ের প্রশংসার জন্য অর্থবাদ কল্পিত হয়, সেখানকার অর্থবাদকে বলে বিধিশেষ; যেমন "বায়ব্যং শ্বেতং (ছাগলং) আলভেত" এই বিধির বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া বায়ুদেবের প্রশংসাপর "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি বাক্য হইতেছে 'বিধিশেষ' নামক অর্থবাদ। আর নিষেধকে লক্ষ্য করিয়া নিষেধের নিন্দাপ্রকাশক বাক্যকে বলে 'নিষেধশেষ'। যেমন—"বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" এই নিষেধের দ্বারা যজ্ঞে প্রতিষিদ্ধ অগ্নি দক্ষিণার নিন্দার্থ কল্পিত

"সোঽরোদীৎ" ইত্যাদি বাক্য হইতেছে 'নিষেধশেষ' অর্থবাদ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পরিকল্পিত অপরাপর অর্থবাদগুলিকে উক্ত দ্বিবিধ অর্থবাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

[বেদান্ত]

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, বেদের ব্রাহ্মণভাগ ত্রিধা বিভক্ত —বিধি, অর্থবাদ ও উভয়-বিলক্ষণ। উভয়-বিলক্ষণ অর্থ—যাহা বিধিস্বরূপও নহে, এবং স্বার্থে প্রামাণ্যবিহীন (অপ্রমাণ) অর্থবাদও নহে, এমন একটী ভাগ। সেই উভয়-বিলক্ষণ ভাগটীর নাম বেদান্ত, উপনিষদ্ ও আরণ্যক প্রভৃতি।

উপনিষদে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়েরই কথা আছে। উভয়ের কথা থাকিলেও ব্রহ্ম-নিরূপণেই উহার মুখ্য তাৎপর্য্য, কর্ম্মপ্রসঙ্গ উহার আনুষঙ্গিক—গৌণ বিষয়মাত্র। ইহা বেদান্তাচার্য্যগণের অভিমত সিদ্ধান্ত। কিন্তু মীমাংসকগণ এ সিদ্ধান্তে সম্মতিদান করেন না। তাঁহারা বলেন,—কর্ম্ম-প্রতিপাদনই যখন বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তখন উপনিষদের উদ্দেশ্যও কখনই অন্য প্রকার হইতে পারে না; হইলে উপনিষদের প্রামাণ্যই রক্ষা পাইতে পারে না। অতএব উপনিষদ্ও কর্ম্ম-কাণ্ডোক্ত বিধেয় কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত হইয়াই যখন প্রামাণ্য লাভ করে. তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হউক, অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও কর্ম্মপ্রতিপাদনেই বেদান্তের (উপনিষদের) তাৎপর্য্য কল্পনা করিতে হইবে। পূর্ব্বেই এ বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখানে আর বিস্তৃতি বিধানের আবশ্যকতা নাই।

এখানে বলা আবশ্যক যে, উপরে যে তিনপ্রকার বিভাগ

প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্প্রদায়বিশেষের অনুমোদিত কেবল ব্রাহ্মণভাগের বিভাগমাত্র; কিন্তু ঐ বিভাগ সমস্ত বেদসম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। আচার্য্যগণ বেদের বিভাগ পাঁচপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ। উক্ত বিভাগের অন্তর্গত বিধি, মন্ত্র, নিষেধ ও অর্থবাদের কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; সুতরাং সে সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'নামধেয়ের' কথা পূর্ব্বে বলা হয় নাই. এখন কেবল তৎসম্বন্ধে যাহা বলা আবশ্যক, তাহাই বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

'নামধেয়' অর্থ—নাম। ব্যবহারের সৌকর্য্য-সম্পাদনই নামধেয়ের উদ্দেশ্য। নামধেয়ের সাহায্যেই অনুষ্ঠেয় যাগাদি কর্ম্মের প্রকাশ ও যথাযথ স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সুবিধা হয়। নচেৎ সেই সকল কর্ম্মবাচক শব্দের যৌগিকার্থ ধরিয়া বিকৃতার্থ গ্রহণ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হইত। উদাহরণ—যেমন "উদ্ভিদা যজেত" ইত্যাদি। 'উদ্ভিদ্' শব্দটী একটী যাগের নামধেয়। এইরূপ নামধেয় না থাকিলে. লোকে সহজেই মনে করিতে পারিত যে, যে যাগে বৃক্ষ লতা প্রভৃতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ কোন একটী যাগ। তাহা হইলে, 'উদ্ভিদা' পদে উদ্ভিদ্-সাপেক্ষ বহু যাগই ধরা যাইত, তাহার ফলে শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ (যাগবিশেষ) পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্রকৃতার্থ গ্রহণ করায় অনুষ্ঠাতৃবর্গ নিশ্চয়ই ইষ্টলাভে বঞ্চিত থাকিত। সেই প্রমাদ নিরসনের জন্য নামধেয়ের ব্যবস্থা। এইরূপ "চিত্রয়া যজেত"

বাক্যে 'চিত্রা' পদটী যাগবিশেষের নামধেয়। 'চিত্রা' পদটী 'নামধেয়' না হইলে, 'চিত্রা' শব্দের সহজতঃ অনেক যাগের অঙ্গ-সংবলিত একটী মিশ্র যাগমাত্র, এরূপ অর্থই লোকে বুঝিত। তাহা হইলে শ্রুতির অভিপ্রায় যে, নিশ্চয়ই পরাহত হইত, একথা না বলিলেও চলে। কাজেই উক্ত নামধেয় স্বয়ং বিধি বা ক্রিয়াপর না হইয়াও বিধেয়ের স্বরূপনিরূপণ দ্বারা নিশ্চয়ই বিধির উপকার সম্পাদন করে, এবং এইরূপেই নিজে সার্থকতাও লাভ করে।

[আলোচনা]

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, মীমাংসাদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জটিল। ইহার সকল বিষয় বিশ্লেষণপূর্ব্বক আলোচনা করা অতি বৃহৎ ব্যাপার। সেরূপ আলোচনার উপযুক্ত স্থান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। সেইজন্য প্রবন্ধমধ্যে উহার কতকগুলি দার্শনিক বিষয়ের স্থূল মর্ম্মমাত্র সন্নিবেশিত করিয়াই বক্তব্য পরিসমাপ্ত করিতে হইল। এখন উপসংহারে আরও কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য দর্শনের ন্যায় আলোচ্য মীমাংসা-দর্শনেরও চরম লক্ষ্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য—জীবের মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স। কিন্তু সে মুক্তি বৈশেষিকোক্ত আত্মগত বিশেষগুণের উচ্ছেদ, বা সাংখ্যসম্মত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, অথবা অদ্বৈতবাদ-কল্পিত জীব-ব্রহ্মের-একত্বপ্রাপ্তিও নহে, পরন্তু পরমানন্দঘন স্বর্গসুখ-প্রাপ্তি। ইহাতেই জীবের চিরবিশ্রাম ও পরম শান্তি। জীবের

সম্বন্ধে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শান্তির স্থান আর নাই, থাকাও সম্ভবপর নয়। উক্ত স্বর্গসুখপ্রাপ্তির উপায়—ষট্-পদার্থ বা ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নহে; পুরুষ-প্রকৃতির বা আত্মা-অনাত্মার বিবেক সাক্ষাৎকারও নহে; অথবা জীব-ব্রহ্মের অভেদ-সাক্ষাৎকারও নহে; তাহার একমাত্র উপায় হইতেছে বেদবিহিত কর্ম্ম। অধিকারী পুরুষ যথাযথভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাহা হইতে যে, একপ্রকার 'অপূর্ব্ব' (অদৃষ্ট) উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে অভীষ্ট স্বর্গসুখ অনুষ্ঠাতার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়। উল্লিখিত ধর্ম্মবিষয়ে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। তদ্ভিন্ন কোন প্রমাণই ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ হয় না। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষং স্যাৎ।" ১।৩।১॥

শব্দই অর্থাৎ বেদই ধর্ম্মের মূল—স্বরূপনির্দ্দেশক। যাহা বেদ-বোধিত নহে, তাহা দেশবিশেষে বা সম্প্রদায়বিশেষে ধর্ম্মনামে পরিচিত হইলেও ধার্ম্মিকগণের আদরণীয় নহে (১)।

ধর্ম্ম অর্থ—যাগাদি ক্রিয়া। তাদৃশ ক্রিয়া প্রতিপাদনেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। মানবকে শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত ও অশুভ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই বেদের আবির্ভাব। যাহা ক্রিয়া-বিধায়ক নয়, কিংবা ক্রিয়াবিধির সহিত কোনরূপেও সংস্পৃষ্ট নয়,

(১) যেমন বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে—"চৈত্যং বন্দেত" অর্থাৎ বৌদ্ধবিহার দর্শন করিলেই প্রণাম করিবে। চৈত্যবন্দনা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ধর্ম্মরূপে পরিচিত থাকিলেও, উহা আমাদের নিকট ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য নহে ইত্যাদি।

এরূপ বেদভাগ যদি থাকে, (বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ বেদভাগ নাই), তবে তাহা কখনই প্রমাণরূপে পরিগণিত হইবে না।

ধর্ম্মবিষয়ে বেদ যেমন প্রমাণ, বেদানুগত স্মৃতিশাস্ত্রও ঠিক তেমনই প্রমাণ, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র যদি কোথাও বেদবিরুদ্ধ কোন বিষয়ে বিধি-নিষেধের উপদেশ করেন, তাহা হইলে সেই সমুদয় বিধি ও নিষেধ সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয় বুঝিতে হইবে। স্বয়ং সূত্রকার বলিয়াছেন—

"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্॥" ১।৪।৩॥

অর্থাৎ বেদবাক্যের সহিত বিরোধ না ঘটিলেই স্মৃতিবাক্য প্রমাণরূপে আদরণীয়, কিন্তু বিরোধ ঘটিলে সর্ব্বথা উপেক্ষণীয়। অতএব ধর্ম্মবিষয়ে বেদ যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ, তদ্বিরুদ্ধার্থবাদী কোন শাস্ত্রই প্রমাণ নহে; বেদবাক্য অনুসারেই ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইবে। আর যেখানে বেদবাক্যেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, সেরূপ স্থলে সূত্রকার বলিতেছেন—

"সন্দিগ্ধেষু বাক্যশেষাৎ॥" ১।৪।২৯॥

সন্দিগ্ধ স্থলে তৎসংসৃষ্ট পরবর্ত্তী বাক্যের সাহায্যে প্রকৃতার্থ নিরূপণ করিতে হইবে। কোথাও যদি একইবিষয়ে একাধিক বাক্য বিদ্যমান থাকে, অথচ পৃথক্ পৃথক্ভাবে অর্থ করিলেও, বাক্যগুলির আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত না হয়, অপরের সঙ্গে মিলিত না হইলে বাক্যার্থই পূর্ণতা লাভ না করে, সেই সকল বাক্যের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

"অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্বিভাগে স্যাৎ॥" ২।১।৪৬॥

অর্থাৎ সেরূপস্থলে একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া বাক্যগুলির

অঙ্গাঙ্গিভাবে একার্থে পর্য্যবসান করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই সকল বাক্যের মধ্যে একটীকে প্রধান করিয়া অপর সকলকে তাহারই উপকারে বিনিযোজিত করিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত বাক্যেরই আকাঙ্ক্ষা পরিসমাপ্ত হইতে পারে এবং সার্থকতাও অক্ষুন্ন থাকিতে পারে। আর যেখানে দেখা যায় যে, প্রত্যেক বাক্যেরই অর্থ ও প্রয়োজন প্রভৃতি সমস্তই স্বতন্ত্র, পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার আকাঙ্ক্ষা নাই, সেরূপ স্থলকে লক্ষ্য করিয়া সূত্রকার বাক্যভেদের ব্যবস্থা দিয়াছেন,—

"সমেষু বাক্যভেদঃ স্যাৎ।" ১।৪।২৯ ॥

অতএব একার্থে বা এক প্রয়োজনে বিনিযুক্ত বাক্যসমূহের মধ্যে যথাসম্ভব অঙ্গাঙ্গিভাবে একবাক্যতার ব্যবস্থা করিতে হয়। বিধেয় কর্ম্মসমূহের মধ্যে কোনটী অঙ্গ, আর কোনটী অঙ্গী বা প্রধান, তাহা জানিবার বা নিরূপণ করিবার সহজ উপায় এই যে,—

"ফলবৎ-সন্নিধাবফলং তদঙ্গম্।"

অর্থাৎ যে কর্ম্মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফলোল্লেখ আছে, তাহার সন্নিহিত কর্ম্মে যদি কোনপ্রকার ফলের উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, যাহার অনুষ্ঠানে কোন ফল-সম্বন্ধের কথা নাই, সেই কর্ম্মটী অঙ্গ, আর তৎসন্নিহিত সফল কর্ম্মটী অঙ্গী। অঙ্গ কর্ম্মগুলি সাধারণতঃ প্রধানভূত অঙ্গী কর্ম্মেরই ফলগত উৎকর্ষমাত্র সম্পাদন করে, কিন্তু নিজের স্বতন্ত্রভাবে কোন ফল জন্মায় না।

বিহিত কর্ম্মমাত্রই সফল; বিফল কর্ম্মের বিধি নাই, থাকাও সম্ভব হয় না। এই জন্যই অঙ্গ কর্ম্মগুলির সফলতা রক্ষার জন্য

ফলপ্রদ প্রধান কর্ম্মগুলির সহিত সংযোজিত করিতে হয়। কিন্তু কোথাও যদি প্রধান কর্ম্মেও ফল-সম্বন্ধ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলেও, ঐ কর্ম্মকে বিফল মনে করিতে হইবে না; উহারও নিশ্চয়ই সফলতা কল্পনা করিতে হইবে। সূত্রকার বলিতেছেন—

"স স্বর্গঃ স্যাৎ, সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ" ॥ ৪।৩।১৫ ॥

অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মে প্রত্যক্ষতঃ ফলোল্লেখ না থাকিলেও সামান্যতঃ স্বর্গফল কল্পনা করিতে হয়; কারণ, স্বর্গফল সকলের পক্ষেই লোভনীয়; সুতরাং সকলেরই সমানভাবে প্রার্থনীয়। এই কারণেই "বিশ্বজিতা যজেত।" 'বিশ্বজিৎ' নামক যাগ করিবে। এস্থলে কোন ফলবিশেষের উল্লেখ না থাকিলেও সামান্যতঃ স্বর্গ-ফলের কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই প্রকার আরও যে সকল কর্ম্মে ফল-সম্বন্ধ উক্ত না থাকে, সেই সকল কর্ম্মেরও ফল স্বর্গ লাভ, ইহা বুঝিতে হইবে।

বেদার্থ নির্ণয়ের সহায়তাকল্পে এইজাতীয় বহুতর নিয়মপদ্ধতি কল্পিত হইয়াছে, সেই সমুদয় নিয়ম পদ্ধতিই আলোচ্য মীমাংসা শাস্ত্রের উপজীব্য। জৈমিনি মুনি ঐ সকল নিয়মের অনুসরণ-পূর্ব্বকই বেদার্থ-মীমাংসার প্রণালী স্থির করিয়াছেন।

মীমাংসাদর্শনের মতে ক্রিয়া (যজ্ঞাদি কর্ম্ম) প্রতিপাদনেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। তদ্ভিন্ন অর্থাৎ ক্রিয়া বা ক্রিয়ার সহিত সম্পূর্ণ-রূপে সম্পর্কশূন্য বাক্য সমুদয় নিরর্থক, মানুষের অনুপযোগী। বিহিত যাগাদি ক্রিয়াই যথার্থ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম নিজে আশুবিনাশী হইলেও কর্ম্মানুরূপ ফলোৎপাদনের জন্য অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব (পুণ্য)

রাখিয়া বিনষ্ট হয়। ঐ অদৃষ্টই যথাকালে কর্ম্মকর্ত্তাকে বিভিন্ন প্রকার ভোগভূমিতে বিভিন্ন প্রকার ভোগ সমর্পণ করিয়া থাকে। মীমাংসকমতে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি কর্ম্ম-দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র সাপেক্ষ হইলেও, কর্ম্মই প্রধান, দেবতা তাহার গৌণ অঙ্গমাত্র। কেহ কেহ মনে করেন, গৃহস্থ যেরূপ অতিথির জন্য অন্ন পান প্রদান করে, সেইরূপ লোকে দেবতার প্রীত্যর্থেই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এ কথা মীমাংসকগণ স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন—

"অপি বা শব্দপূর্ব্বত্বাৎ যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং স্যাৎ, গুণত্বে দেবতাশ্রুতিঃ"॥৯।১৯

এ সূত্রে স্পষ্টাক্ষরেই যজ্ঞের প্রাধান্য ও দেবতার অপ্রাধান্য বলা হইয়াছে। ভাষ্যকারও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তস্মাৎ দেবতা ন প্রযোজিকা," বলিয়া উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অন্যান্য সম্প্রদায়ের অভিমত দৈবত মহিমা মীমাংসকমতে অচিন্ত্য মন্ত্রশক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং অনাবশ্যকবোধে ঈশ্বর বা ব্রহ্মও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান বা তদাশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি পরাভিমত উপায় সকলও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। কর্ম্মই জীবের ভোগ-মোক্ষের উপায়। শান্তিকামী জীবগণ সর্ব্বতোভাবে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিবে, এবং তাহাদ্বারাই নিজ নিজ অভীষ্ট ফল—অক্ষয় স্বর্গসুখ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কর্ম্মই জীবের ইহ-পরকালের বন্ধু; কর্ম্মের উপরে আর কেহ নাই। শিহ্লনমিশ্রের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"[illegible] কর্ম্মভ্যো বিধিরপি [illegible]।"

।০। শি[illegible]